সচিত্র

তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী

বা

ভারতবর্ষীয় তীর্থ সমূহের মাহাত্ম্য প্রকাশ

শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত

সহজে লভিতে যদি চাও জ্ঞানধন।
সচিত্র "ভ্রমণ-কাহিনী" কর অধ্যায়ন॥
সকলের প্রিয় ইহা গরীবের মিত্র।
অনায়াসে সংশোধিবে অজ্ঞের চরিত্র॥

দ্বিতীয় ভাগ

Calcutta:

THE BENGAL MEDICAL LIBRARY,

201, CORNWALLIS STREET.

1912

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা

Calcutta:

PUBLISHED BY BEPIN BEHARY DHUR

356, Upper Chitpore Road.

Printed by Fakir Chandra Das

"INDIAN PATRIOT PRESS."

70, BARANOSI GHOSE'S STREET

ILLUSTRATED BY SRIJUT PREO GOPAL DASS.

1912.

এই পুস্তক মূল্যবান্ স্ব
দীর্ঘস্থায়ী ক্লাসিক এন্টিক-
কাগজে ছাপা হইল।

প্রকাশ

বিজ্ঞাপন

যদি ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থসমূহ এবং স্থান-মাহাত্ম্য সকল সহজে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" পাঠ করুন। ইহা ভারত, রামায়ণ, নানাবিধ পুরাণ ও বেদাদি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়া সাধারণের হিতার্থে গ্রন্থাকারে তিন ভাগে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। যে কোন ভাগের পুস্তকখানি পাঠ করিবার সময় যেন যথার্থ তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, এইরূপ মনে হইবে।

ইহার প্রথম ভাগে—কলিকাতার সন্নিকটস্থ পীঠস্থান ৺কালীঘাট ও শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর তত্ত্ব, এবং হাবড়া ষ্টেশন হইতে রেলযোগে পশ্চিম তীর্থ যথা,—বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, প্রয়াগ, অযোধ্যা, হরিদ্বার, কনখল, ইন্দ্রপ্রস্থ, কুরুক্ষেত্র, মথুরা, ব্রজমণ্ডলী ও বৃন্দাবন, আগ্রা, রাজপুত বীর মহারাজ জয়সিংহ প্রতিষ্ঠিত জয়পুর সহর ও জগদ্বিখ্যাত দেবালয়, আরও আজমীরের অন্তর্গত পুষ্কর ও সাবিত্রী তীর্থ। দক্ষিণে—বৈতরণী, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, পুরীতীর্থ, পদ্মক্ষেত্র, আরও গুজরাটের কচ্ছ-সাগরোপকণ্ঠে দ্বারকাপুরী, এতদ্ভিন্ন গৃহস্থের নানাবিধ প্রয়োজনীয় বিষয় সংশ্লিষ্ট হইয়াছে।

তৃতীয় ভাগ যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই পাঠক সমাজে চিত্রসহ প্রকাশিত হইবে—ইহাতে কলিকাতা হইতে বোম্বে, এলিফ্যাণ্টাকেপ, পুণাসহর, দ্বিতীয়বার দ্বারকাপুরী যাত্রা, গোহাটীর অন্তর্গত শ্রীশ্রীকামাখ্যাদেবীর দর্শন যাত্রা, বশিষ্ঠাশ্রম, আরও চট্টগ্রামের অন্তর্গত শ্রীশ্রী৺চন্দ্রনাথ ও ৺আদিনাথ দর্শন যাত্রা, এতদ্ভিন্ন দার্জ্জিলিংএ দুর্জ্জয়লিঙ্গ ও নেপালের অন্তর্গত শ্রীশ্রী৺পশুপতিনাথ দর্শন যাত্রা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার—৩৫৬, অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা, অথবা আমার নিকটে পাওয়া যায়—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট।

ভূমিকা

বাঙ্গালী নানা বিষয়ে অধঃপতিত হইলেও তাঁহাদের হৃদয়ে ধর্ম্মের পবিত্র মধুর ভাব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মের পবিত্র নামে কাতারে কাতারে অসংখ্য হিন্দু নরনারী পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতিকে লইয়া পরম পবিত্র তীর্থ স্থান পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের তীর্থ স্থানগুলি যেন নবপ্রস্ফুটিত গোলাপের সৌরভের ন্যায় কার্য্যবিশিষ্ট, ইহার উচ্চ উচ্চ তোরণসংশ্লিষ্ট সুন্দর মন্দির এবং দেবতাদিগের অতুল ঐশ্বর্য্য সকল দর্শন করিলে আত্মহারা হইতে হয়। ভারতের চারিদিকে চারি ধামে যে চারিটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান বর্ত্তমান আছে, তাহাদের দূরতাহেতু একের সহিত অপরের মিল নাই, অর্থাৎ পশ্চিম তীর্থে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর সুবিধা আছে, দক্ষিণে তাহার ঠিক্ বিপরীত ভাব দৃষ্ট হয়, ফলতঃ যে তীর্থে যে সকল দ্রব্যের একান্ত আবশ্যক, তীর্থসেবকদিগের কর্ত্তব্য—সংক্ষেপে উহা ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইল। তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিলে জ্ঞানের বিকাশ, দৈহিক উন্নতি, তৎসঙ্গে পরকালের কার্য্য এই ত্রিবিধ ফললাভ হয়; কূপমণ্ডূপবৎ কেবল এক স্থানে অবস্থান করিয়া থাকিলে ভগবানের সৃষ্টিলীলার নানাপ্রকার সৌন্দর্য্য দর্শন

না করিলে সে আনন্দ বা সেরূপ জ্ঞানলাভ কখনও হয় না; বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের দেবালয়গুলির আয়তন এত বড় যে, এক-একটী দেবালয় যেন এক-একটী ভিন্ন গ্রাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিন্দু চিরকালই অকপট হৃদয়ে ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকেন, কারণ হিন্দুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তীর্থ স্থানে উপনীত হইয়া দেবদেবী দর্শন করিলে মুক্তিলাভ হয়। এই অনন্ত জ্বালা যন্ত্রণাময় পরীক্ষাভূমি "সংসারের" মায়া বন্ধন শিথিল হয়—তাই পিতা উপযুক্ত প্রাণপ্রিয় পুত্রহারা, পতি জীবন সহচরী পত্নীহারা, পুত্র জনকজননীর স্নেহসিক্ত ক্রোড়হারা হইয়া হৃদয়ের শোক, তাপ, উপশম করিবার জন্যই এই পবিত্র তীর্থ স্থানে ছুটিয়া যান; প্রকৃতির শ্যামল শোভা সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে প্রাণে প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন। কালের কি বিচিত্র গতি—আজ আমাদের সেই পরম পবিত্র তীর্থ সমূহেও নানাপ্রকার প্রতারণা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে নৌকা-যোগে বা পদব্রজে যাঁহারা তীর্থ পর্য্যটন করিতেন, তাঁহারা কত সময়, কত ক্লেশ, কত অর্থ ব্যয়সহকারে পাষণ্ড দস্যুদিগের ভয়ে ভীতচিত্তে কত প্রকার বিড়ম্বনা ভোগ সহ্য করিয়াও এই দুর্লভ পবিত্র স্থানদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, সেই প্রাচীন ইতিহাস অদ্যাপি পাঠ করিলে হৃদ্‌কম্প হয়, কিন্তু এক্ষণে রেলগাড়ীর সাহায্যে এবং ইংরাজরাজের শাসনগুণে যাত্রীদিগের যতদূর সম্ভব সুখসাধ্য হইয়াছে, এই দ্রুতগমন। রেলগাড়ীর সাহায্যে অতি অল্প সময়ে ও সামান্য ব্যয়ে নির্ব্বিঘ্নে গরীব, দুঃখী, আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই তীর্থ স্থানে গমনপূর্ব্বক আপন আপন নয়ন ও জীবন সার্থক করিতেছেন। যে পরম পবিত্র "তীর্থ" সমূহের মাহাত্ম্য অবগত হইয়াও ইহাতে অবিশ্বাস, ভক্তিহ্রাসের ইহাই প্রধান কারণ অনুমান হয়, প্রমাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যাহা সহজলভ্য, তাহার আদরও তত অল্প—আর যাহা দুর্লভ, তাহার যত্নও তত অধিক পরি-



অধীন গ্রন্থকার।

তীর্থসেবকদিগের কর্ত্তব্য

তীর্থ যাত্রা করিবার পূর্ব্বদিবস গৃহে উপবাসপূর্ব্বক যথাশক্তি গণেশ, পিতৃগণ ও বিগ্রহগণের পূজা করতঃ পরমানন্দে হৃষ্টচিত্তে যথা-নিয়মে শুভদিন, শুভলগ্নে ঘটস্থাপনপূর্ব্বক যাত্রা করিতে হয়। তীর্থে উপস্থিত হইয়া পিতৃগণের অর্চ্চনা করিতে হয়, এইরূপ করিলে অভীষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। তীর্থ স্থানে ব্রাহ্মণের পরীক্ষা করিতে নাই। অন্নার্থীকে অন্নদান, ভিক্ষার্থীকে ভিক্ষাদান এবং চরু, শক্তু, গুড় প্রভৃতির দ্বারা পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিতে হয়। তীর্থশ্রাদ্ধে অর্ঘ বা আবাহন নাই। কি প্রশস্ত কি অপ্রশস্ত সকল সময়েই শ্রাদ্ধ করিতে পারা যায়। প্রসঙ্গত তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্নান করিলে স্নান ফল পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তীর্থ যাত্রাজনিত ফললাভের আশা দুরূহ। কথিত আছে, তীর্থ দর্শন দ্বারা পাপী ব্যক্তির পাপ বিমোচন হয়; কিন্তু তাহারা অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারে না, কেন না যাহারা শ্রদ্ধাশীল, তাহারাই তীর্থ ফললাভ করিয়া থাকেন। যিনি পরের জন্য বেতনাদি লইয়া তীর্থে গমন করেন, তিনি ষোড়শাংশের একাংশ ফলপ্রাপ্ত হন। যাহার উদ্দেশে কুশময়ী প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করতঃ তীর্থসলিলে নিমগ্ন করা যায়, তিনি অষ্টমাংশের একাংশমাত্র ফললাভ করেন, পুরাণে এই-রূপ প্রকাশ আছে। তীর্থে উপবাস ও শিরোমুণ্ডণ করা কর্ত্তব্য, কারণ মুণ্ডণের ফলে শিরোগত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ দূরিত হইয়া থাকে। যেদিন তীর্থে উপস্থিত হইবেন, তাহার পর দিবস উপবাস এবং তীর্থ-প্রাপ্তি দিবসে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবার নিয়ম।

মুণ্ডণাদির ব্যবস্থা—কুম্ভকোণমে, সেতুবন্ধে, গোকর্ণে, নৈমিষারণ্যে, অযোধ্যায়, দণ্ডকারণে, বিরূপাক্ষে, বঙ্কটেশ্বরে, শালগ্রামে, প্রয়াগে, কাঞ্চীতে, দ্বারকাপুরে, মথুরায়, শ্রীপদ্মলাভ ও কাশী, এই সকল তীর্থ স্থানের পুণ্যবতী নদ বা নদীতীরে সমুদ্র ও ভাস্কর পর্ব্বত ইত্যাদিতে মুণ্ডণ ও উপবাস করিতে হয়। ভুলক্রমে যিনি উপরোক্ত স্থানে মুণ্ডণ বা উপবাস না করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সমস্ত পাপ তাহার সঙ্গে নিঃসন্দেহে অবস্থান করিতে থাকে।

পুরাবিৎগণ কর্ত্তৃক একটী প্রাচীন উপাখ্যান প্রকাশিত হইল। যে সকল সাধুর হৃদয়ে পরোপকার প্রবৃত্তি জাগরূপ থাকে, তাহাদের বিপদরাশি সমুলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং প্রতিপদে সম্পদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরোপকার দ্বারা যেরূপ শুদ্ধিলাভ হয়, তীর্থ স্থানে তাদৃশী শুদ্ধির আশা নাই। পরোপকার দ্বারা যেরূপ ফল পাওয়া যায়, বহু দান দ্বারা তাদৃশ ফললাভ হয় না; পরোপকার দ্বারা যেরূপ পুণ্য উপার্জ্জিত হয়, কঠোর তপস্যাতেও তাদৃশ পুণ্য প্রদান করিতে সমর্থ হয় না, অর্থাৎ পরোপকার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং পরাপকার অপেক্ষা মহাপাপ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। জীবন নানারূপ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সমস্তই করীকর্ণাগ্রবৎ চপল, স্নুতরাং কেবলমাত্র পরোপকার সা[illegible]ন করাই মনীষী ব্যক্তির সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। যে নারী পতির অ[illegible] না লইয়া স্বেচ্ছাক্রমে কোন তীর্থে গমন করেন, চরমে তাহাকে অধঃপতিত হইয়া শোচনীয় গতিলাভ করিতে হয়, আর যে ব্যক্তি সস্ত্রীক তীর্থ স্থানে গমনপূর্ব্বক শুদ্ধচিত্তে পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করেন, তাহার সৌভাগ্যের সীমা থাকে না, উক্ত পিণ্ড "রামসীতার পিণ্ড" নামে অভিহিত হয়। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র নরাকারে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া তীর্থে সস্ত্রীক পিণ্ডদান করিয়া মানবদিগকে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন।

বলাবাহুল্য, পিণ্ডদানের সময় স্ত্রীকে পিণ্ড উত্তোলন করিয়া স্বামীকে সাহায্য করিতে হয়, সস্ত্রীক পিণ্ডদানে এইরূপ নিয়ম। পিতামাতা ব্যতীত জগতে শ্রেষ্ঠ গুরু আর দ্বিতীয় নাই—এই নিমিত্ত প্রবাদ আছে, গুরুগোবিন্দ একত্র দর্শনে বহু পুণ্য হয়, অর্থাৎ উপযুক্ত পুত্র, পিতা-মাতাকে যত্নের সহিত শ্রদ্ধাসহকারে তীর্থ স্থানে গমন করিয়া দেব দর্শন করিলে বহু পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারেন।

মানস তীর্থের সংখ্যা অনেক। গয়াতীর্থ পিতৃগণের মুক্তিপ্রদ ; তনয়গণ ঐ স্থানে গমন করতঃ ভক্তিসহকারে পিণ্ডদান দ্বারা পূর্ব্ব পিতামহগণের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যে সকল তীর্থে স্নান করিলে পরমাগতি লাভ হয় বলিয়া কথিত হইল, তন্মধ্যে সত্য, ক্ষমা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া, অর্জ্জব, দান, দম, সন্তোষ, প্রিয়বাদিত্ব, জ্ঞান ও তপ এই সমস্তই মানস তীর্থ বলিয়া জানিবেন। চিত্তশুদ্ধি সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনীয়। জলে দেহ প্লাবিত হইলেই তাহাকে প্রকৃত স্নান বলা যায় না, দমগুণ রূপ জলে স্নাত, রাগাদি রহিত ও বিষয় কামনা শূন্য হইলেই প্রকৃত স্নাত বলা যায়। যে ব্যক্তি লোভী, পিশুন, ক্রূর, নাস্তিক ও বিষয়াসক্ত, সে সকল তীর্থে স্নাত হইলেও পাপী ও মলিন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। দেহস্থিত মল দূর হইলেই মানব নির্ম্মল হইতে পারে না, অর্থাৎ মানস মল পরিত্যক্ত হইলেই শুদ্ধচিত্ত হওয়া যায়। অতিরিক্ত বিষয়াশক্তিই মানসমল নামে খ্যাত।

যে চিত্তে দুষ্টতা নিহিত আছে, তীর্থ স্থানে তাহা কিরূপে পরিশুদ্ধি হইবে? চিত্ত নির্ম্মল না হইলে দান, যজ্ঞ, শৌচ, তীর্থসেবা সকলই অতীর্থ স্বরূপ হয়। জিতেন্দ্রিয় হইয়া মানুষ যেখানেই থাকুন না কেন, সেই স্থানই তাহার তীর্থ স্থান। রাগ-দ্বেষরূপ মলবর্জ্জিত হইয়া জ্ঞান-রূপ জলপূর্ণ তীর্থে যে ব্যক্তি স্নান করিতে পারেন, তিনিই নিঃসন্দেহে

পরমাগতি লাভ করিতে সমর্থ হন। যে ব্যক্তি তীর্থে গমনপূর্ব্বক অন্ততঃ ত্রিরাত্রি বাস এবং গো, স্বর্ণ দান না করেন, তাহাকে জন্ম জন্ম দরিদ্র হইয়া থাকিতে হয়। তীর্থ যাত্রাঘটিত যে ফললাভ হয়, ভূরি দক্ষিণ যজ্ঞ দ্বারাও তাদৃশ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে ব্যক্তির প্রতি-গ্রহ বিমুখ ও যিনি যথালব্ধ দ্রব্যেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং অহঙ্কারবর্জ্জিত, তাঁহারাই তীর্থফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পুণ্যশীলের কথা দূরে থাকুক, শ্রদ্ধাবান ধীর ও সমাহিত হইয়া তীর্থে গমন করিলে পাপী ব্যক্তিও বিশুদ্ধিলাভ করিতে পারে। শ্রদ্ধাহীন, নাস্তিক, সন্দিগ্ধচিত্ত ও হেতু-বাদী—এই সকল লোক কদাপি তীর্থ ফলভোগী হইতে পারে না। যাঁহারা সর্ব্বদ্বন্দ্ব সহিষ্ণু, ধীর হইয়া যথাবিধি তীর্থ সমূহ পর্য্যটন করেন, অন্তিমে তাঁহারাই স্বর্গভোগী হইয়া থাকেন। তীর্থ স্থানে কখন পাপ কার্য্যে মতি রাখিতে নাই এবং কাহারও সহিত কলহ করিতে নাই, ভক্তিই মুক্তি—এই সারগর্ভ উপদেশ বাক্য হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি হইবেন।

দানের উপযুক্ত পাত্র—যে ব্রাহ্মণ সদাচারবিশিষ্ট, তপস্যান্বিত, বেদবেদান্তবিৎ, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবোপাসক এবং পুরাণ ব্যাখ্যানে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত দানের উপযুক্ত পাত্র, অর্থাৎ তাঁহাকেই দান করিলে প্রকৃত দানফল পাওয়া যায়।

একদা বশিষ্ঠদেব মহারাজ দিল্লীজকে উত্তরে বলিয়াছিলেন, যত প্রকার দান পাত্র আছে, তন্মধ্যে বেদোক্ত আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণই দানের শ্রেষ্ঠ পাত্র। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন ভোজন করেন নাই, যিনি বেদ অধ্যায়ন করিয়াছেন এবং পৌরাণিক মন্ত্র সমস্ত যাঁহার অভ্যস্ত আছে, যিনি শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবোপাসনা ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর, যিনি দরিদ্র ও বহু কুটুম্বযুক্ত, সেই ব্রাহ্মণকে দানের সৎপাত্র বলিয়া

জানিবেন। ব্রাহ্মণই দানের প্রকৃত পাত্র সন্দেহ নাই, এরূপ পাত্রকে দান করিলেই ধর্ম্মাভিলাষ পূর্ণ হয় এবং চরমে মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পুণ্যস্থলে বিশেষতঃ তীর্থ স্থানে সৎপাত্রজ্ঞানে, সাধারণরূপে দান করিতে নাই, কেন না—পুণ্যক্ষেত্র তীর্থাদিতে সৎপাত্রকে বিশেষরূপে পরীক্ষা না করিয়া দান করিলে দশ জন্ম কৃকলাস (কাঁকলাস) তিন জন্ম গর্দ্দভ, দুই জন্ম ভেক্, এক জন্ম চণ্ডাল তৎপরে শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়, সর্ব্বান্তে নানারোগকীর্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াজন্ম গ্রহণপূর্ব্বক সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তসাধন করিতে হয়। তীর্থ স্থানে যদি একান্ত কাহাকেও সৎপাত্র বিবেচনা না করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই দান বস্তু ভগবান মহেশ্বরের নামে উৎসর্গ করিলে পুণ্য ফললাভ হয়, অতএব তীর্থ স্থানে কখন কেহ যেন অসৎপাত্রে দান না করেন? এইরূপ আবার ভাদ্রপদে কৃষ্ণপক্ষে মহালয়া পার্ব্বনবিধানে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ না করিলে দেহান্তে তদ্দোষে তাঁহাদের কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বেতালত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়।

প্রত্যেক পর্ব্বতিথিতে বা যোগের সময় সকল স্থানে সাগর পুণ্যপ্রদ, অপর সময় সাগরজলে অবগাহন, এমন কি স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে নাই, কিন্তু সেই সাগর স্নান—সেতুবন্ধে, সিন্ধুসাগরসঙ্গমে, গঙ্গাসাগরসঙ্গমে, গোকর্ণে ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে কালাকাল বিচার নিষিদ্ধ, কেন না দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীরামরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে সাগরপারে উদ্ধার করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত সেই সাগরের পরপারে উপস্থিত হইয়াই দেবগণ, পিতৃগণ ও মুনিঋষিগণকে সাক্ষ্য রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি অদ্য এই সেতুবন্ধে যে তীর্থ প্রতিষ্ঠা করিলাম, এইরূপ যে যে পুণ্যসলিলোপরি আমার প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা আছে, যে কেহ যখনই সেই সকল স্থানে ভক্তিসহকারে স্নান

করিবে, আমার অনুকম্পায় তাহাকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না।

এই অপরিচিত তীর্থ স্থানে পীড়িত হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিৎ এবং এরূপ আহারীয় দ্রব্যের ব্যবস্থা করিবেন, যাহা সহজে পরিপাক হয়, যে বস্তু খাইলে অসুখ হইবার সম্ভাবনা, উহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তীর্থ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এরূপ একটী পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করিবেন, যিনি পরিচিত, বিশ্বাসী ও এ বিষয়ে পারদর্শিক, অর্থাৎ যিনি এই ব্যবসা করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, কেন না—এরূপ একটী লোক সঙ্গে থাকিলে যাত্রীরা সকল বিষয়ে তাহার নিকট সাহায্য পাইবেন, সন্দেহ নাই।

তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

ওয়ালটেয়ার

হাবড়া হইতে এইস্থানে যাইতে হইলে, বেঙ্গল নাগপুর রেলযোগে ওয়ালটেয়ার নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। এই ষ্টেশনটী বেঙ্গল নাগপুরের একটী প্রধান জংশন ষ্টেশন। তথা হইতে ব্র্যাঞ্চ লাইনে দুই মাইল পথ অতিক্রম করিলেই, ভিজাগাপট্টম্ নামক ষ্টেশন দেখিতে পাইবেন। ঐ ষ্টেশনে নামিলেই সহরের মধ্যে যাইবার সুবিধা হয়। ষ্টেশনের অনতিদূরে বৃহৎ ধর্ম্মশালা বিরাজমান্। এই ধর্ম্মশালাটী ভিজিয়াগ্রামের মহারাজা, যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য নির্ম্মাণ করাইয়া যে কত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ধর্ম্ম-শালাটী বেশ পরিষ্কার ও প্রশস্ত, ইহার সম্মুখে ফটকের ভিতর কিছু পতিত স্থান আছে, ঐ স্থানে ঠিকা গাড়ীর আড্ডা থাকায় বিদেশী যাত্রী-দিগের অনেকটা সুবিধা হয়। ফটকের বহির্ভাগে একটী জলের কল

আছে। ধর্ম্মশালাটীর চতুর্দ্দিকে সুন্দর বাগান এবং মধ্যস্থলে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ থাকায়, ইহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে, অপরাপর তীর্থ স্থানের ধর্ম্মশালার ন্যায়, এখানে সহজে থাকিবার অধিকার পাওয়া যায় না। এই পান্থশালা নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য এই যে, যদ্যপি কোন বিদেশী যাত্রী পরিবারবর্গ লইয়া সহসা এই স্থানে আসিয়া বাসাবাটী ভাড়া করিতে না পারেন, তাহা হইলে এই ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলে, এখানে যদি কোন কম্পার্টমেণ্ট খালি থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি উক্ত কম্পার্টমেণ্টে তিন দিবস বিনা ভাড়ায় থাকিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ এই সকল আশ্রয় প্রাপ্ত ভদ্র-লোকদিগকে এই তিন দিবসের মধ্যে সহরের ভিতর বাস করিবার জন্য বাসাবাটী ঠিক করিবার অবসর দেওয়া হয়। যদ্যপি ইহাতেও কোন যাত্রী সুবিধা করিতে না পারেন, কিম্বা এই ধর্ম্মশালাতেই থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে প্রথম তিন দিবসের পর, প্রত্যেক যাত্রীকে প্রতি রোজ এক আনা হিসাবে ভাড়া দিতে হয়। বলা বাহুল্য—এই ধর্ম্মশালাটী আয়তনে এত বৃহৎ এবং ইহার মধ্যে এতগুলি কম্পার্টমেণ্ট আছে যে, প্রায়ই কোন আবেদনকারীকে কখনও হতাশ হইতে হয় না। একটী পরিবার লইয়া থাকিবার একখানি শয়ন গৃহ, একখানি জিনিস পত্র রাখিবার গৃহ ও একখানি রসুই ঘর আর একটী পায়খানা লইয়া এক-একটী কম্পার্টমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট আছে। সুখের বিষয় একটীর সহিত অপরটীর কোন সংস্রব নাই।

ষ্টেশন হইতে সহরের মধ্যে যাইবার জন্য ঘোড়ার গাড়ী, ল্যাণ্ডো-গাড়ী, বাগি (ঘোড়ার গাড়ীর ন্যায় আকৃতি কিন্তু গরুতে বহন করে) প্রভৃতি গাড়ী সকল সস্তাদরে ভাড়া পাওয়া যায়। কোন নূতন যাত্রী এই ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে, সহরের মধ্যে বা ধর্ম্মশালায়—যথায়

থাকিবেন, উহা নির্ণয় করিলে, রেল কর্তৃপক্ষের আদেশ ক্রমে একখানি ছাপান ফরম প্রাপ্ত হন, সেই ফরমখানি লইয়া প্রত্যহ নিকটস্থ মিউনিসিপাল হেল্‌থ অফিসে, প্রথম সাতদিন প্রাতে আট ঘটিকার মধ্যে হাজির হইয়া, রোগাক্রান্ত কিনা ডাক্তারের নিকট তাহার পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু ডাক্তারের ফি দিলে স্ত্রীলোককে তথায় যাইতে হয় না, তিনি বাটীতে আসিয়া হেল্‌থ অফিসে রিপোর্ট পাঠাইয়া দেন। পুরুষ কিম্বা স্ত্রী সকলকেই এই নিয়মানুসারে থাকিতে হয়, নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ১০৲ হইতে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানার সম্ভাবনা। প্রথম সাত দিনের পর, সেখানে যত দিনই থাকুন না কেন, আর কোনরূপ পরীক্ষা দিতে হয় না; ইহার কারণ এই যে, যগুপি কোন প্লেগরোগগ্রস্ত বিদেশী ব্যক্তি এখানে গুপ্তভাবে আসেন, তাহা হইলে এই সাত দিনের পরীক্ষার ফলে উহা নিশ্চয়ই প্রকাশ পায়। আরও নিয়ম দেখিলাম যে, যগুপি কোন যাত্রী তথায় থাকিবার জন্য নাম লিখাইয়া থাকেন, আর এই প্রথম সাতদিনের মধ্যে সহর হইতে বাহিরে কোথাও গমন করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও এই অফিসের অনুমতি লইতে হয়।

ভিজাগাপট্টম প্রদেশটী দুইভাগে বিভক্ত হইয়া আপার ও লোয়ার ওয়ালটেয়ার নাম ধারণ করিয়াছে। লোয়ার প্রদেশে মান্দ্রাজবাসী গরীব ও গৃহস্থ লোক সকল বসবাস করিয়া থাকেন। তাহাদের অধিকাংশ আবাসস্থান তালপাতের ছাউনি ও তালপাতের ছিটে-বেড়ার উপর মৃত্তিকা লেপন করা। আপার ওয়ালটেয়ারে ধনী, শিক্ষিত ও ইংরাজগণ প্রায় সমুদ্রতীরেই বাস করিয়া থাকেন। মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ স্ত্রীলোকেরা সচরাচর কাচা দিয়া কাপড় পরিধান করেন, এবং এক বাড়ী হইতে অপর বাড়ী ইচ্ছানুরূপ গমনাগমন করিয়া থাকেন.

কখনও বা দলবদ্ধ হইয়া সঞ্চারিতা বিদ্যুল্লতার ন্যায় সমুদ্রতীরে প্রকাশ্য পথে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন, কখনও বা একাকিনী বহির্গত হইয়া, নগরের নানা স্থান হইতে আপনার আবশ্যকীয় দ্রব্য সস্তায় ক্রয় করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশের ন্যায় অবরোধ প্রথা এখানে নাই, সুতরাং তাহারা ইহাতে কোনরূপ দোষ ভাবেন না। বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীলোকেরা তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়া সুখানুভব করেন, তথাকার স্ত্রীলোকে চুরুট ব্যবহার করিয়া সুখী হন।

এখানে স্থানে স্থানে নানাবিধ দোকান থাকায়, নূতন যাত্রীদিগকে কোনরূপ আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে কষ্ট পাইতে হয় না, কিন্তু তেলেগু ভাষা কিছু জানা না থাকিলে দ্রব্যাদি খরিদ করিবার সময় অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়। কারণ তেলেগু ভাষাই এখানকার প্রচলিত ভাষা। দু'-একদিন তথাকার অধিবাসীদিগের সহিত ভালরূপে মিশিতে পারিলেই অনায়াসে তাহাদের কথাবার্ত্তা এবং দ্রব্যাদির তেলেগু ভাষার নাম সকল শিখিতে পারা যায়। তথায় দোকানীদের নিকট বাঙ্গালা ভাষায় কোন দ্রব্য চাহিলে, তাহারা উহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে না। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত গুটি কতক প্রয়োজনীয় তেলেগু ভাষায় দ্রব্যের নাম প্রকাশিত হইল যথা :—

চাউলকে—বীয়ম্। ময়দাকে—গোধুমপিণ্ডি। শুজীকে—গোধুমনকলু। দালকে—পপ্পু। ছোলাকে—চ্যানাগ। লবণকে—উপ্পু। ঘৃতকে—নেয়ী। তৈলকে—নুনী। দেশলাইকে—আগিপুল্লা। কাষ্ঠকে—কাবরা। জলকে—নিলু। সুপারিকে—চাক-কলু। পানকে—তাম্পাকলু। মৎস্যকে—চাপ্পালু। হাঁড়িকে—কুণ্ডা। বেগুনকে—অঙ্কায়া। শাককে—কোরা। দুধকে—পালু। তেঁতুলকে—চিন্তাপণ্ডু গুড়কে—বেল্লম। ধোপাকে—শাকুলি। নাপিতকে—মঙ্গলবাড়।

ঘোড়ার গাড়ীকে—গোরমবাণ্ডি। গরুর গাড়ীকে—এদ্দুবাণ্ডি। খেঙরাকে—ছিপরু ইত্যাদি।

এখানকার প্রধান ভাষাই তেলেগু, তৎপরে ইংরাজী। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি ধনী, কি মুটে, কি মজুর, কি দোকানী, কি মেছুনী, বিদেশী লোক দেখিলেই তাহারা আদা ইংরাজী আদা তেলেগু ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। আর যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা সুচারুরূপে ইংরাজী ভাষা কহিয়া থাকেন, কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারেন না। এদেশের তরকারীর মধ্যে আলু, বেগুন, উচ্ছে, ঝিঙ্গে, কাঁচাকলা, শাকপ্রভৃতি, আর ফলের মধ্যে ডাব, আতা, পেয়ারা, বাতাবী-লেবু, শশা, পেঁপে, আনারস, রম্ভা, নারিকেল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বৈশাখ মাস হইলে তালশাঁস এখানে এত অধিক জন্মে যে, এক পয়সায় এক গ্লাস সেই তালশাঁসের জল বিক্রয় হইয়া থাকে।

সহরের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে দুই দিবস হাট বসে, সেই সময় সকল দ্রব্য সুবিধা দরে পাওয়া যায়। এখানে নানা স্থানে নানাপ্রকার তরকারী, পসারীর দোকান সকল সজ্জিত থাকায় কাহাকেও কোনরূপ কষ্ট পাইতে হয় না। আতপ চাউল, ডাল, ঘৃত, তৈল সকল দ্রব্যই পাওয়া যায়, তবে বালাম চাউল, সোনামুগ, সরিষার তৈল এখানে দুষ্প্রাপ্য। এ দেশবাসীদের বিশ্বাস, যে তিলের তৈল পুষ্টিকর, এই নিমিত্ত তথাকার জনসাধারণ তিলের তৈল ব্যবহার করিয়া থাকেন। এখানে যে স্থানে তরকারী পাওয়া যায়, সেখানে মৎস্য পাওয়া যায় না। মৎস্য, সমুদ্রতীরে যে বাজার আছে, সেই স্থানেই পাওয়া যায়। এই মেছোবাজার এক অদ্ভুত দৃশ্য! এখানে নানা জাতীয় অদ্ভুত অদ্ভুত মৎস্য সকল দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। কোন মৎস্যের মুখটি নরমুখাকৃতি, কোনটির লেজের দিকে চক্ষুদ্বয়, আবার কোনটির বা মুখের উপর

একটী ছত্রের ন্যায়, তাহার উপর চক্ষুদ্বয় শোভা পাইতেছে। এইরূপ যে কত প্রকার অদ্ভুত মৎস্য আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক-একটী কর্কট, এক-একটী কচ্ছপের ন্যায় বড়, অথচ ডিম্বে ভর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। মৌরলা, মৃগেল, বাটা, চাঁদা ও বড় বড় চিংড়ি মাছ বিস্তর আছে, কিন্তু কই কিম্বা মাগুর মৎস্য এখানে দুষ্প্রাপ্য।

সহরের রাস্তা ঘাট পরিষ্কার ও প্রশস্ত। এখানকার ঝাড়ুদার কিম্বা মেথরদিগের পোষাক দেখিলে সহসা ধনী ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম হয়। যতগুলি দোকান এখানে আছে, তন্মধ্যে ইষ্টকোষ্ট ও করোমেট কোং নামক দোকানই প্রসিদ্ধ। এই দুইটী দোকানে বাঙ্গালী বাবুদিগের দ্বারা কেনা বেচা হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন সকলগুলিই মাদ্রাজির দ্বারা পরিচালিত। এখানে বাঙ্গালী অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। যতগুলি বাজার আছে, তন্মধ্যে "মারকেট" নামক বাজারটীই প্রসিদ্ধ। সাগরের জল লোণা, সুতরাং এই লোণা জলের যে সকল মৎস্য পাওয়া যায়, তাহাদের আস্বাদ ভাল নহে, কিন্তু খাসীর মাংস অতি সুস্বাদু। ভিজাগাপট্টম সহরের সাগর তীরে কুড়ি-পঁচিশ টাকার কম একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না।

এই সাগর তীরে জন সাধারণের স্নান করিবার সুবিধার জন্য বড় বড় প্রস্তর নির্ম্মিত ধাপ প্রস্তুত আছে, স্নানের সময় এ সকল ধাপের উপর স্থির ভাবে বসিয়া থাকিলে সাগরের তরঙ্গমালা ইহাতে প্রতিঘাত হইয়া যে জলপ্রবাহ উথলিয়া উঠে, তাহাতেই স্নানার্থীর স্নান সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। প্রত্যহ বৈকালে সাগর তীরে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিবার জন্য সাহেব, মেম ও দেশীয় নরনারীগণ সচ্ছন্দে একত্রে অবাধে যখন বিচরণ করিতে থাকেন, তখন সেই দৃশ্য অতি মনোমুগ্ধকর। প্রায়ই একে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

সাগরের তীরের উপরিভাগে একটী লাইট হাউস আছে। ইহার সন্নিকটেই পোর্ট অফিস। সমুদ্রগামী বিদেশী জাহাজ সকল এই পোর্টে আসিলে এখান হইতে ডাক ও মাল পত্র সকল উঠাইয়া লইয়া যায়। এই পোর্ট অফিসের উত্তর দিকে একটী পর্ব্বত শৃঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন তিনটী ভজনাগার সংস্থাপিত আছে। একটী মুসলমানদিগের মসজিদ্। এই মসজিদ্ সম্বন্ধে প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, কোন মুসলমান সিদ্ধপুরুষের সমাধির উপর এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে, এই পীর অসাধারণ ক্ষমতাশালী অর্থাৎ যিনি যাহা অভিলাষ করিয়া এই দরগাতে মানসিক করেন, পীরের কৃপায় তাহার তাহাই সফল হয়। এই নিমিত্ত হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি যে কেহ পীরের ক্ষমতার বিষয় শ্রবণ করেন, তিনিই ভক্তিসহকারে এই দরগাকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যাকালে এই দরগার সম্মুখে সোনা, রূপা ও তাম্রের অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়া পীরের সম্মান রক্ষা করা হয়। মসজিদের পশ্চিম দিকের পর্ব্বতশৃঙ্গের উপরিভাগে হিন্দুদিগের একটী পবিত্র মন্দির শোভা পাইতেছে। ভিজাগাপট্টমের হিন্দু ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যহ শাস্ত্রানুসারে যথানিয়মে এখানে দেবতার আরতি ও অর্চ্চনার সময় বেদপাঠ হইয়া থাকে। তৃতীয়টী ক্যাথলিক চার্চ। ইহা পাহাড়ের সর্ব্বপশ্চিমে বিরাজিত। এই গির্জ্জাটীতে স্থানীয় খ্রীষ্টানগণ উপাসনা করিয়া থাকেন।

লাইট-হাউসের পশ্চাদ্ভাগে একটী ময়দান আছে। উক্ত ময়দানের চতুর্দ্দিকের কিনারায়, স্থানে স্থানে ব্যারাক্, মিউনিসিপাল অফিস, মেঃ কেল্‌নার কোম্পানীর হোটেল, পোষ্টাফিস, বিচারালয় প্রভৃতি থাকাতে স্থানটির এক অপূর্ব্ব শ্রী হইয়াছে। ভিজাগাপট্টমের পাঁপর খাইতে অতি

সুস্বাদু। এই স্থান, নস্য ও আইভারি কার্য্যের উপর স্বর্ণশোভিত শাঁখা, বালা, রুলি প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত।

সহরের প্রান্তভাগে, ভ্যালি গার্ডেন নামে একটী সুন্দর উদ্যান বিরাজিত। ঐ মনোমুগ্ধকর বাগানে প্রবেশ করিলে আর ফিরিতে ইচ্ছা হয় না। ইহার প্রান্তভাগে একটী সুন্দর ঝরণা আছে। গ্রীষ্মকালে এখানে বিভিন্ন দেশের নর-নারীগণ ঐ ঝরণায় স্নান করিয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। বাগিচাটি দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বক্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। ইহার মধ্যে যতগুলি বৃক্ষ আছে, তন্মধ্যে নারিকেল বৃক্ষগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, কারণ এই বৃক্ষগুলি দেখিতে ছোট হইলেও ফলভরে এত অবনত যে, বালক বালিকাগণ অবলীলাক্রমে ঐ সকল ফল পাড়িতে পারে। এই-রূপে ভিজাগাপট্টম সহরের শোভা সম্পদ দর্শন করিয়া বাসায় প্রত্যা-গমন করিয়া স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট সন্ধান পাইলাম যে, এই সহর হইতে সাত মাইল দূরে সীমাচল নামে একটী পাহাড় আছে, ঐ পাহাড়ের উপরিভাগে হিন্দুদিগের এক পবিত্র দেবালয় "প্রহ্লাদপুরী" নামে প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। আমরা তীর্থযাত্রী, এই তীর্থের সংবাদ পাইয়া দেব দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইলাম এবং পর দিন প্রত্যূষে যাহাতে তথায় গমন করিতে পারি, তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম।

প্রহ্লাদপুরী

ভিজাগাপট্টম হইতে ওয়ালটেয়ার দুই মাইল। তথা হইতে পাঁচ মাইল দূরে সহরের উত্তর পশ্চিমদিকে সীমাচল নামে এক পাহাড় আছে। ঐ পর্ব্বতের উপরিভাগে প্রহ্লাদপুরী প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণ প্রদেশে সকলেই প্রায় সকল বাক্যের অন্তে অম্ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন

এই নিমিত্ত এদেশবাসীরা এই পাহাড়টিকে সীমাচলম্ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সহর হইতে একদিনে বাণ্ডি চড়িয়া অক্লেশে এই পুণ্য স্থানে যাতায়াত হয়। প্রতি বাণ্ডির যাতায়াতের ভাড়া দুই টাকার মধ্যেই হইয়া যায়। পথিমধ্যে যাত্রাকালীন দেখিবেন, চতুর্দ্দিকস্থ পাহাড় গুলি যেন প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া, যাত্রীদিগকে প্রহ্লাদপুরীর শোভা সম্পদ দর্শন করাইবার জন্য পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। এখানে প্রত্যহ যেরূপ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে, অক্ষয় তৃতীয়ার শুভতিথিতে তাহার সহস্রগুণ ভক্তগণের সমাগম হয়, কারণ ভগবান্ নৃসিংহদেবের জন্মোৎসব এই তিথিতে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ওয়ালটেয়ারের পরবর্ত্তী ষ্টেশনে সীমাচলম্ নামে একটী ষ্টেশন আছে, এই ষ্টেশন হইতে তীর্থ স্থান কেবল তিন মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। কিন্তু এই পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া পদব্রজে গমন করা অত্যন্ত কষ্টকর, কারণ কোনরূপ গাড়ী এখানে ভাড়া পাওয়া যায় না। এই স্থানে লুচি পুরির দোকান নাই, কেবল তৈলপক্ক দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। দোকানীদের যেরূপ কুৎসিত আকৃতি, তাহাতে তাহাদের স্পৃষ্ট দ্রব্য খাইতে রুচি হয় না। সহর হইতে এ পুরীতে যাইবার পূর্ব্বে কিছু আহারীয় খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লওয়াই ভাল। মধ্য সহর হইতে এই স্থানে যাইবার যে পাকা বাঁধা রাস্তা পর্ব্বতশ্রেণীর পার্শ্ব দিয়া আছে, তাহারই সাহায্যে যাইতে হয়। ঐ সকল উচ্চ পর্ব্বতের শিখর দেশে নানাপ্রকার বৃক্ষ আছে, তথায় কত রকম পাহাড়ী জীবজন্তু, ছাগল, গরু প্রভৃতি আহার সংগ্রহে নিরত আছে, তাহা দেখিতে পাইবেন। এক-একটী পাহাড়ী ছাগলের গাত্রে এত লোম আছে যে, দূর হইতে দেখিলে উহাদিগকে যেন ভল্লুক বলিয়া ভ্রম হয়। ভিজাগাপট্টম হইতে একখানি বাণ্ডিতে চড়িয়া এখানে পৌছিতে অন্যূন তিন-চারি ঘণ্টা সময় লাগে।

এখানে যতগুলি পর্ব্বত আছে, তন্মধ্যে সীমাচল পর্ব্বতটিই সর্ব্বোচ্চ, এবং ভগবান্ নৃসিংহদেবের বিহার স্থান, এই নিমিত্ত ইহার অপর নাম সিংহাচলম্ হইয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী অহল্যা বাই যাত্রীদিগের সুবিধার্থে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এই পর্ব্বতে উঠিবার ৯৮৮টী ধাপ নির্ম্মাণ করাইয়া সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। মহিমাময়ী মহারাণী "অহল্যা বাই" ভারতের সর্ব্বস্থানে কূপ, জলাশয়, রাজপথ, দেবায়তন, অতিথিশালা, ধর্ম্মমন্দির ও উচ্চ উচ্চ পুণ্যগিরি গাত্রে সোপানাবলী নির্ম্মাণ করাইয়া সাধারণের যে কত শত হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার ধর্ম্মানুরক্তি ও লোক হিতৈষণা অসাধারণ ছিল। কেবল ধর্ম্মানুরাগের বশবর্ত্তিনী হইয়া, তিনি নিঃস্বার্থভাবে যে কত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত।

এই সিংহচলম্ পর্ব্বত সমতল ভূমি হইতে শিখরদেশ পর্য্যন্ত উচ্চতায় ৮০০ শত ফিট্ নিরূপিত হইয়াছে। এরূপ উচ্চ পাহাড়ে উঠিতে সহজেই ক্লান্ত হইতে হয়, এই নিমিত্ত ১০।১২টী সোপানের পর একটী করিয়া বিশ্রাম চাতাল আছে, ঐ সকল সোপান-শ্রেণীর পার্শ্ব বহিয়া উপর হইতে ঝরণার জল নামিতেছে। সোপানগুলি অতি সুন্দর ও সরল ভাবে ঊর্দ্ধে উঠিয়া শিল্পীর নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। এই পর্ব্বতের উপর হইতে নিম্নভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বড়ই আনন্দ অনুভব হয়। কেননা, এখান হইতে মানুষ, গরু প্রভৃতিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুত্তলিকাবৎ এবং গিরিগাত্রের সোপানগুলি, একটা সর্প চলিয়া যাইলে পথটি যেরূপ দেখায় ঠিক্ সেইরূপ অনুমান হয়। এই সোপানশ্রেণীর মধ্যে যে স্থানটির ধাপগুলি পূর্ব্বাভিমুখে বরাবর ঊর্দ্ধে উঠিয়া উত্তরদিকে বক্রভাব ধারণ করিয়াছে, সেই স্থানে কতকগুলি ফলের গাছ আছে। উহার মধ্যে কদলী বৃক্ষ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়, কারণ এরূপ উচ্চ

পাহাড়ের উপর কদলী বৃক্ষ যে ফল প্রসব করে, তাহা সাধারণের ধারণাতীত। এই উদ্যানপার্শ্বে এক ছাদশূন্য গৃহমধ্যে ঝরণা হইতে হুহু শব্দে বারিধারা নির্গত হইতেছে, এখান হইতে কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠিলেই একটী সুবৃহৎ তোরণ দ্বার দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ তোরণটী হনুমন্ত দ্বার নামে খ্যাত। তৎপরে যে মন্দির আছে, তন্মধ্যে পুরীরক্ষক হনুমানজীকে অর্চ্চনা করিতে হয়।

কটকের পার্শ্বে পিচিকা ও আকাশধারা নামে যে দুইটী ঝরণা আছে, তাহার আশে পাশে প্রকোষ্ঠ মধ্যে কতকগুলি প্রস্তর মূর্ত্তি এবং তথায় নানাপ্রকার মনোমুগ্ধকর ফল ও ফুলের বৃক্ষরাজি দেখিয়া মনে হইবে, যেন একটী বাগান-বাটীতে প্রবেশ করিলাম। এই স্থান হইতে আরও কিছু উর্দ্ধে উঠিলেই, সিংহাচলমের শেষ সীমায় উপস্থিত হওয়া যায়, এই পর্য্যন্ত ৯৮৮টী ধাপের শেষ। এই পর্ব্বতের শিখর দেশকেই "প্রহ্লাদপুরী" বলে। এখানে সমতল ক্ষেত্রের উপর কতক-গুলি যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য ঘর আছে, ঐ সকল ঘরের মধ্যে ২।৪ খানি ব্যতীত সকলগুলিই কুটীর। যে স্থানে এই ঘর গুলি আছে, সেই স্থান সিংহাচলম্ পল্লীনামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যাত্রীগণ ইচ্ছানুসারে এখানে বিশ্রামের জন্য ঘর ভাড়া লইয়া থাকেন। পল্লীর চতুর্দ্দিকেই রাস্তা, সেই রাস্তার উত্তর পশ্চিম কোণে মহাপ্রভু নৃসিংহদেবের দেবালয় বিরাজিত। স্নানপূর্ব্বক শুদ্ধ কলেবরে শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া দেবা-লয়ে প্রবেশ করিবার নিয়ম।

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটী সুন্দর বাগান আছে, ঐ বাগিচার মধ্যপথ দিয়া স্নান করিতে যাইতে হয়, পথিমধ্যে ইহার একস্থানে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত গোমুখের ভিতর হইতে নির্ম্মল বারিধারা নির্গত হইতেছে, জল যেমন নির্ম্মল সেইরূপ সুস্বাদু। ইহা গঙ্গাধারা

নামে প্রসিদ্ধ। স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট অবগত হইলাম যমুনা ও সরস্বতীর ধারা এই গঙ্গা ধারার সহিত সংযোগ আছে, বলা বাহুল্য ঐ পুণ্যতোয়া গঙ্গাধারায় স্নান করিয়া, ঝাপ্তিতে চড়িয়া এতদূর আসিতে ও উচ্চ পর্ব্বতে উঠিতে যেরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম,তাহার উপশম হইল।

গঙ্গাধারার কিম্বদন্তী

যখন ভগবান নৃসিংহদেব প্রিয়া লক্ষ্মীদেবীসহ প্রফুল্ল মনে এই স্থানে গুপ্তভাবে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহাদের স্নানের সুবিধার জন্য গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী সকলে পরামর্শ করিয়া এখানে আবির্ভূতা হন। এই গঙ্গা বা ত্রিধারায় ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে প্রভু নৃসিংহ-দেবের কৃপায় সকল পাপ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। গ্রহণের সময় এদেশবাসী সকলে দলে দলে আসিয়া এই স্থানে মুক্তি কামনা করিয়া স্নান, দান করিয়া থাকেন। কথিত আছে, ঐ সময় এখানে সামান্যমাত্র দান করিলে স্থান মাহাত্ম্য গুণে উহা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং বহু যজ্ঞের ফললাভ হয়। কার্ত্তিক মাসে ভক্তিসহকারে দক্ষিণাসহ এখানে একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে পারিলে লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজনের ফললাভ হয়। মানব জন্ম ধারণ করিয়া, এই পুণ্য স্থানে আসিয়া যে "পূর্ণব্রহ্ম" ভক্ত প্রহ্লাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গোলক ত্যাগ করিয়া আসিয়া-ছিলেন, যিনি প্রহ্লাদের কথামত সেই স্ফটিকস্তম্ভ হইতে বহির্গত হইয়া মদৈশ্বর্য্যে গর্ব্বিত হিরণ্যকশিপুকে নরসিংহ মূর্ত্তিতে বিনাশ করিয়া-ছিলেন, সেই পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

প্রহ্লাদপুরীর এই নির্জ্জন স্থানে কতকগুলি সাধু সন্ন্যাসীর দর্শন করিয়া জীবন সার্থক বোধ করিতে লাগিলাম, তাঁহাদের সহিত বাক্যা-লাপে উপদেশ পাইলাম, এই ত্রিধারার এত মাহাত্ম্য যে, যদি কোন

কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোক ভক্তিসহকারে শুদ্ধচিত্তে তিন প্রহর তিনবার ইহাতে স্নান করেন, তাহা হইলে তিনি নিঃসন্দেহে উক্ত নিকৃষ্ট ব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পান।

এই স্থান হইতে শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া ইহার কতক কতক স্থান ভগ্ন অবস্থায় থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁহারা দুঃখসহকারে কালাপাহাড়ের অত্যাচারকাহিনীর বিষয় প্রকাশ করিলেন। তখন আর বুঝিতে বাকি রহিল না, যে কালাপাহাড় কর্ত্তৃক সে স্থানের এরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছে। কালাচাঁদ! তুমি পণ্ডিত, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যবনত্বপ্রাপ্ত হইয়াছিলে সত্য, কিন্তু তুমি কি জানিতে না যে, যে স্থানে সতত নৃসিংহদেব প্রিয়া লক্ষ্মীসহ বিরাজমান সেই স্থানের মহিমা কত? নৃসিংহ পুরাণে উহা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে, এই সকল অত্যাচারের জন্যই তোমায় অকালে জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছে। তুমি হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি অত্যাচার করিয়া যে কলঙ্ককালিমা রাখিয়া গিয়াছ, ইতিহাসে তাহা চিরদিন জ্বলন্ত অক্ষরে প্রতিফলিত থাকিবে, শত জন্মেও তাহা স্খালন হইবে না।

সিংহাচলম্ পল্লীর চারিদিকে দুগ্ধ, দধি, চিপিটিকা, চাউল, কাষ্ঠ, হাঁড়ি, নানাবিধ আহারীয় সামগ্রী এবং আরও কত প্রকার ফল, মূল যাত্রীদিগের জন্য বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে। ইহার একদিকে পার্ব্বত্য বালিকারা ভগবানের অর্চ্চনার নিমিত্ত নানা জাতীয় পুষ্প ও তুলসী বিক্রয় করিয়া থাকে। প্রভুর পূজার নিমিত্ত এই সকল দ্রব্য এই স্থান হইতে সাধ্যানুসারে সংগ্রহ করিতে হয়। এখানকার পূজার উপকরণ একটী কলা ও একটী নারীকেল আর ফুল তুলসী। এইরূপে মহারাণী অহল্যা বাই নির্ম্মিত সোপানগুলি অতিক্রম করিলে, মহারাজ পুরুরবা নির্ম্মিত প্রাচীন সোপানে উপস্থিত হওয়া যায়, এই সোপানের ৫৫৬টী

ধাপ পার হইলেই নৃসিংহদেবের মূল মন্দির। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় প্রত্যেক ভক্তকে ⁄০ আনার হিসাবে প্রণামী দিতে হয়। মন্দিরটী গ্রেনাইট্ প্রস্তরে প্রস্তুত ও দুইটী প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত, ইহার চারিদিকেই চাতাল আছে। তদভ্যন্তরে বহু স্তম্ভে শোভিত এবং প্রাচীর গাত্রে নানাপ্রকার কারুকার্য্যে সুসজ্জিত, দেখিতে ঠিক্ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের ন্যায়, কিন্তু তত উচ্চ নয়। ইহার চূড়াটী সুবর্ণাবৃত।

এই সুন্দর সুসজ্জিত মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান নৃসিংহদেবের স্বর্ণময় সিংহবদনাকৃতি মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক হইল। আহা! যে পবিত্র মূর্ত্তির দর্শন আশায় কাঙ্গাল হইয়া এই অত্যুচ্চ পর্ব্বতের শিখরদেশে নির্ব্বিঘ্নে উপস্থিত হইলাম, আজ করুণাময়ের কৃপায় সেই আশা পূর্ণ হইল। শ্রীমূর্ত্তিটি উর্দ্ধে প্রায় চারিহস্ত পরিমিত, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে আবৃত। মন্দির মধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, পাছে হঠাৎ কোন ব্যক্তি প্রবেশ করেন, এই আশঙ্কায় দ্বারদেশে দুইজন প্রহরী নিযুক্ত আছে। ভক্তগণ যেরূপ পূজা দিবেন, উহা পাণ্ডার নিকট প্রদান করিলেই, তিনি ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। এখানে পূজারী ঠাকুরের দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়, তৎপরে আরতির সময় দীপালোকের সাহায্যে যখন শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমুখ ও সমস্ত অবয়ব সুচারুরূপে দর্শনলাভ করিবেন, তখন সেই চিরবিমোহন সুন্দর মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে করিতে ভাবিবেন যে, আজ আমার কি শুভ দিন। এইরূপে ভগবান্ নৃসিংহদেবের কৃপায় দেবদর্শন করিয়া মনের আনন্দে মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম।

বৎসরান্তে কেবল একদিন অক্ষয় তৃতীয়ার শুভ দিনে সাধারণে এই দেবের আদি মূর্ত্তি দর্শন করিবার অবসর পাইয়া থাকেন। ঐ

দিনেই ভগবান নৃসিংহদেবের জন্মোৎসব ক্রিয়া, মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইদিন দলে দলে নরনারীগণ নানা দেশ হইতে উপস্থিত হইয়া উৎসব ক্রীড়ায় যোগদান করেন। মূল মন্দিরের পূর্ব্ব দক্ষিণ-কোণে, একটী ক্ষুদ্র মন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউর প্রতিমূর্ত্তি। ইহার পশ্চিম-কোণে ভাষ্যকার শ্রীযুক্ত রামানুজাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি ও অপরাপর কতকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে, তন্মধ্যে ক্যাম্বাদেবীর মূর্ত্তিটী দর্শন করিলে প্রশংসা করিতে হয়, অধিকন্তু ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। আর পশ্চিম-উত্তর কোণে শ্রীশ্রীবামাদেবী ও তারাদেবীর যে প্রতিমূর্ত্তি আছে—সেই মূর্ত্তিদ্বয়কে অর্চ্চনা করিতে হয়। এই দেবালয়ের এইদিকে যে একটা ছোট দ্বার দেখিতে পাইবেন, ঐ দ্বার মধ্য দিয়া দেবের ছত্র বাটীতে যাওয়া যায়। এই স্থানে নরসিংহদেবের বিরাট ভোগের প্রসাদ বিক্রয় হয়। পাণ্ডাকে মূল্য দিলেই প্রসাদ পাইবেন। ভগবান নৃসিংহদেবের আশীর্ব্বাদে এবং স্থান মাহাত্ম্য গুণে এখানকার প্রসাদে জাতিভেদ নাই। যাহারা দেবের অর্চ্চনার সময় পৃথক ভোগের মূল্য দেন, তাঁহারা বাসায় বসিয়া এক পাত্র পোলাও ভোগের প্রসাদ পাইবেন। এই পোলাও দেখিলে খাইতে ইচ্ছা হয়—কারণ ইহা ঘৃত, ডাল, কিস্‌মিস্, বাদাম প্রভৃতি সংমিশ্রণে এক উপাদেয় খাদ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ দেশবাসীরা এত লঙ্কা ব্যবহার করেন যে, ঐ নয়নানন্দদায়ক উপাদেয় পোলাও প্রসাদ সামান্যমাত্র আস্বাদ করিলে আমাদের এ দেশবাসীদিগের অনেকেই উদরস্থ করিতে পারেন না। এখানে দেবতাকে ভোগ দিবার কোন নিরূপিত মূল্য ধার্য্য নাই, যাহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপ ভোগ দিতে পারেন। অতি কম চারি আনা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত ভোগ দিবার প্রথা আছে।

নৃসিংহদেবের নিত্য পূজার নিমিত্ত আটজন ব্রাহ্মণ, আটজন বেদ

গায়ক, ষোল জন মসাল বাহক নিযুক্ত আছেন। প্রত্যহ তিন মণ চাউলের অন্নভোগ হইয়া থাকে এবং অর্দ্ধ মণ চাউলের পোলাও ভোগ বরাদ্দ আছে। এক্ষণে এই দেবালয়টি ভিজিয়ানা গ্রামের মহারাজার অধীন, সুতরাং এই দেবালায় সম্বন্ধে যাবতীয় খরচ ঐ রাজবাটী হইতেই প্রদত্ত হয় এবং যাহাতে দেবতার পূজার কোনরূপ ত্রুটি না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে তদারক হয়।

মন্দিরের বাহিরে ঝরণায় যাইবার পথে, যথায় সোপানশ্রেণী উর্দ্ধে উঠিয়াছে, সেই স্থানে বিজয়নগরের মহারাজার একটী সুন্দর উদ্যান আছে—উদ্যানটী পরিশ্রম-ক্লান্ত যাত্রীদিগকে শান্তিদানের জন্য যেন আহ্বান করিতেছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি ফোয়ারা আছে। সেই বেগবতী ঝরণা হইতে লোহার পাইপের সাহায্যে ঐ সকল ফোয়ারায় জল সঞ্চয় করা হয়। অপরাহ্ন কালে যখন উৎসের চাবি খোলা হয়, তখন প্রবলবেগে জল বহির্গত হইতে থাকে, ঐ দৃশ্য অতি মনোহর। এইরূপে সীমাচলম্ পর্ব্বতের সমতল ভূমি হইতে শ্রীমন্দিরের শিখরদেশ পর্য্যন্ত উঠিতে সর্ব্বসমেত মোট ১২০০ শত সোপান অতি কষ্টে অতিক্রম করিতে হয়। মন্দিরের শিখরদেশ হইতে সাগর সলিলের ফেন তরঙ্গ-মালা নয়নগোচর হইলে, তরঙ্গ পশ্চাতে তরঙ্গের মোহন নৃত্য দেখিলে অতিশয় আনন্দ হইতে থাকে, আরও এই নিভৃত স্থানে উপস্থিত হইলে চিত্তে স্বতঃই শান্তিভাব ফুটিয়া উঠে, মন ভগবদুপাসনায় লালায়িত হইয়া থাকে, ঋষিজনাভ্যস্ত তপস্যায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিতে ইচ্ছা হয়।

নৃসিংহদেব নরলোকে প্রকাশ

সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এইরূপ;—

নারায়ণ, ভক্ত প্রহ্লাদের সম্মান রক্ষাকল্পে গোলক হইতে ত্বরায়

তাহার কথিত স্তম্ভের মধ্য হইতে নরসিংহ মূর্ত্তিতে বহির্গত হইয়া, দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুকে সংহারপূর্ব্বক তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে স্থান দান করিয়া, বৈষ্ণব চূড়ামণি পরম ভক্ত প্রহ্লাদকে ঐ শূন্য সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। অনন্তর প্রিয়া লক্ষ্মীদেবীসহ এই সীমাচল পর্ব্বতে আসিয়া তাঁহারা পরম সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রহ্লাদও নারায়ণের শ্রীপদে মতি রাখিয়া, তাঁহার উপদেশমত পিতৃরাজ্য শাসন করিতে করিতে একদা তাঁহার আরাধ্যদেব শ্রীহরির শ্রীচরণ স্মরণ করিবার কালে ভগবানের দর্শন আশা বলবতী হইল, তখন মহারাজ প্রহ্লাদ ব্যাকুল অন্তরে আপন পুত্র হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তপস্যার্থে বহির্গত হইলেন। হায়! কালের কি বিচিত্রগতি, যে প্রহ্লাদ একবারমাত্র ডাকিলে তিনি অস্থির হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, যে প্রহ্লাদের বাক্য মিথ্যা হইবার জন্য যাঁহাকে স্ফটিক স্তম্ভ হইতে বাহির হইতে হইয়াছিল, আজ কিনা সেই প্রহ্লাদকে সংসার মায়ায় বদ্ধ হইবার জন্য পুনরায় তাঁহার দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া তপস্যার্থে গমন করিতে হইল। ধন্য মায়া! ধন্য তোমার মোহিনী শক্তি! এই মায়াই আবার ভগবান কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া সংসারের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। যাহা হউক, প্রহ্লাদ সংসার-মায়া ত্যাগ করিয়া ক্রমান্বয়ে তপস্যার উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে এই সীমাচল পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন এবং ইহাই তপস্যার উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে এই নির্জ্জন উচ্চ পর্ব্বতোপরি তাঁহার উপাস্য দেবতা শ্রীহরিকে নরসিংহ মূর্ত্তিতে দর্শন লাভ করিয়া আনন্দে অধীর হইলেন এবং তাঁহাদের অবস্থিতির বিষয় অবগত হইয়া ভক্তিসহকারে এখানে দেব মন্দির, নৈমিত্তিক পূজার বন্দোবস্ত ও পুরীমধ্যে পূজারী ব্রাহ্মণদিগের মনোমত বাসস্থান নির্ম্মাণ

করাইয়া, দেবাজ্ঞায় স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিকালের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এইভাবেই চলিয়া আসিতেছিল। শেষ বহু দিবসব্যাপী অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে ব্রাহ্মণগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন, এইরূপে দেবতার সেবা বন্ধ হইল। কাল-ক্রমে পর্ব্বতোপরিস্থ স্থানসমূহ অরণ্যে পরিণত হইল। এই পুণ্যস্থান সিংহ শ্বাপদসঙ্কুল হইয়া উঠিল। মন্দিরগাত্রে বল্মীকের স্তূপ হইতে লাগিল, ইহার ফলে ভগবান্ নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি আবৃত হইয়া রহিলেন।

চন্দ্রবংশীয় ধর্ম্মাত্মা পুরুরবা ব্রহ্মাকে স্তবে তুষ্ট করিয়া যখন ভারতের একছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে সন্তুষ্টচিত্তে "কাম-গমন" নামক একখানি আকাশগামী বিমান দান করেন। পুরুরবা সেই বিমানে আরোহণ করিয়া প্রত্যহ কৈলাসে গমনপূর্ব্বক হরগৌরীর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া আসিতেন। একদা রাজা কৈলাসপুরী হইতে প্রত্যাগমনকালে অপ্সরা সুন্দরী উর্ব্বশীর অপরূপ রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কামান্ধ হইলেন এবং তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, এদিকে উর্ব্বশীও আনন্দলিপ্সায় সেই সুন্দর যুবরাজকে দর্শন করিবামাত্র মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিল। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে এক মন-প্রাণে ঐ কামগমনে আরূঢ় হইয়া দক্ষিণাভিমুখে বিহার করিবার মানসে গমন করিতে করিতে, এই সীমাচল পর্ব্বতটীকে উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়া তথায় অবতরণ করিলেন। পুরুরবা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিবার সময় স্নেহসহকারে মধুর বচনে উর্ব্বশীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি! এই স্থানটী অতি মনোহর ও সুখপ্রদ, ইচ্ছা হয়, তোমায় লইয়া যাবজ্জীবন এই স্থানে বাস করি।"

উর্ব্বশী সেই প্রেমপূর্ণ সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিতমনে উত্তর করিলেন, "মহারাজ! ক্ষমা করুন, এই স্থানটী অতি পুণ্যস্থান, ভগবান্

শ্রীহরি সতত প্রফুল্লচিত্তে লক্ষ্মীসহ এই নিভৃত স্থানে বাস করিতেছেন। ধর্ম্মচূড়ামণি রাজাধিরাজ প্রহ্লাদ প্রতিষ্ঠিত এই পুণ্যস্থান-নৃসিংহক্ষেত্র নামে খ্যাত হইয়াছে। অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষবশতঃ এই পরম স্বর্গীয় স্থান এক্ষণে এইরূপ জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে।"

ধর্ম্মাত্মা পুরুরবা, উর্ব্বশী সুন্দরীর নিকট ভগবান্ শ্রীহরির তত্ত্ব অবগত হইয়া উভয়ে মিলিয়া ভগবান্‌কে অন্বেষণ করিতে করিতে পশ্চিমবাহিনী গঙ্গা দর্শনে ভক্তিসহকারে সেই তাপহারিণীর পবিত্র স্নিগ্ধ-সলিলে অবগাহন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন। অনন্তর বহু অনুসন্ধান করিয়াও যখন ভগবানের কোন সন্ধান পাইলেন না, তখন রাজা হতাশপ্রাণে, অনশনে, শুদ্ধচিত্তে কুশোপরে উপবিষ্ট হইয়া কেবলই শ্রীহরির চিন্তা করিতে লাগিলেন, এইরূপে দিবসত্রয় অতিবাহিত হইবার পর চতুর্থ দিবসে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যেন ভগবান্ বিষ্ণু সদয় হইয়া বলিতেছেন, "হে রাজন! আমি তোমার সম্মুখে বল্মীকাবৃত মৃণ্ময় স্তূপ-মধ্যে বিরাজ করিতেছি, তুমি সহজে আমার দর্শন পাইবে না। আমার উপদেশ মত এই স্তূপ খনন করিতে আরম্ভ করিলে আমি তোমার নয়নপথে প্রকাশিত হইব। তখন তুমি আমাকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া বস্ত্রে সজ্জিত করিবে, তৎপরে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া চন্দন অনুলেপন দ্বারা আমার সর্ব্বাঙ্গ সুরভিত করিবে—আর যাহাতে সাধারণে আমাকে দর্শন করিতে না পায়, তাহারও ব্যবস্থা করিবে। অদ্য অক্ষয়-তৃতীয়া। প্রতি বৎসর এই দিবসে চন্দন অনুলেপন দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া যে আমার আদি মূর্ত্তি দর্শন করিবে, সে আমার কৃপায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভ করিবে। কিন্তু স্মরণ রাখিও, আমার উপদেশ মত কার্য্য না করিলে তাহার বংশ নাশ হইবে।"

ভগবান্ নৃসিংহদেব স্বপ্নে এই উপদেশ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

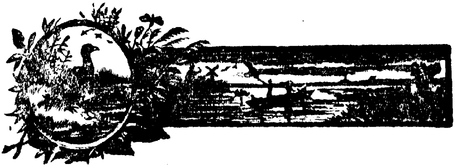
অকস্মাৎ রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি সম্মুখে উর্ব্বশীকে দেখিয়া স্বপ্নবিষয় আদ্যোপান্ত প্রকাশ করিতে করিতে দুঃখিত হইলেন, কারণ এই জঙ্গলাকীর্ণ নির্জ্জন স্থানে কিরূপে পঞ্চামৃত সংগ্রহ হইবে, ইহাই রাজার দুঃখের প্রধান কারণ।

উর্ব্বশী রাজার নিকট সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া আনন্দিতচিত্তে পুরুরবাকে বলিলেন, "রাজন! ভগবান্ আপনার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সামান্য অভাবের জন্য আপনি কি নিমিত্ত নিরুৎসাহ হইতেছেন? আমার বিশ্বাস, আপনি আপনার নিজের মহিমা একবার স্মরণ করিলেই এই শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সফলকাম হইবেন।

উর্ব্বশীর ঐ আশ্বাসময়ী বাণী—রাজাকে প্রবুদ্ধ করিল। তখন পুরুরবা আপন মহিমা স্মরণ করিবামাত্র, দেবতারা ঐ নির্জ্জন স্থানে সহস্র ঘট দুগ্ধ ও পঞ্চামৃতসহ উপনীত হইলেন। এইরূপে সকলে মিলিত হইয়া স্বপ্নাদৃষ্ট বল্মীক স্তূপ খননপূর্ব্বক তদুপরি সেই দেবদত্ত সহস্র ঘট দুগ্ধ ঢালিতে ঢালিতে বল্মীকরাশি গলিত হইয়া পদদ্বয় ব্যতীত নৃসিংহদেবের প্রকৃত মূর্ত্তি বাহির হইল, সেই সময় রাজা ভগবানের শ্রীচরণদ্বয় দর্শন না পাইয়া কাতর হইয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দৈববাণী হইল, "রাজন! তুমি কামান্ধ হইয়া পাপ মনে এই স্থানে আসিয়াছ, অতএব মুনিগণারাধ্য শ্রীচরণ দর্শন করিতে প্রয়াস পাইও না। অদ্য অক্ষয়-তৃতীয়া, তুমি হৃষ্টচিত্তে আমার অভিষেক কর, সর্ব্বাঙ্গ গঙ্গাবারিতে ধৌতপূর্ব্বক আমায় স্নান করাও, তৎপরে অর্চ্চনা করিয়া সত্বর চন্দন অনুলেপনসহকারে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত কর। আমার উপদেশ মত পুনরায় প্রতি অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে এইরূপে আমার অর্চ্চনা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক দর্শন করিবে, ইহার ফলে অন্তিমে তোমার বৈকুণ্ঠে স্থানলাভ হইবে।"

আকাশবাণী অনুসারে রাজা ভগবানকে ভক্তিসহকারে গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া দেবগণসহ ষোড়শোপাচারে পূজা করিলেন। তৎপরে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া, ভগবৎ আদেশ পালন করিলেন। অনন্তর নিত্য সেবার জন্য পূজারী ব্রাহ্মণগণ নিযুক্ত ও যথেষ্ট উপকরণ সকল স্থিত করিয়া চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন এবং তৎস্থানে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যাবৎ আমার রাজত্ব থাকিবে, তাবৎ আমার বংশানুক্রমে এই দেবের পূজার কোনরূপ ত্রুটি হইবে না। মহারাজ পুরুরবার রাজত্বকাল হইতে যথানিয়মে ভগবান্ নৃসিংহদেবের পূজা হইয়া আসিতেছে, অদ্যাপিও তাঁহার বংশধরেরা স্বর্গীয় রাজার আদেশপালন করিয়া প্রতি অক্ষয় তৃতীয়ার দিন যথানিয়মে নৃসিংহদেবকে স্নান করাইয়া, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনলেপনপূর্ব্বক মহাসমারোহে পূজা করিয়া থাকেন। এই উৎসবকে নৃসিংহদেবের জন্মোৎসব কহে। এই নিমিত্ত অদ্যাবধি প্রতি অক্ষয়-তৃতীয়ায় ভগবানের আদিমূর্ত্তি দর্শনের আশায় উৎফুল্ল হইয়া বহু দূরদেশ হইতে ভক্তগণ সমাগত হইয়া থাকেন। অপর সময় তথায় গমন করিলে কেবল প্রভুর আদি মূর্ত্তির উপর মহারাজ পুরুরবা কর্ত্তৃক সুবর্ণ নির্ম্মিত সিংহাকৃতি মুখখানি দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবালয়ের সোপান শ্রেণীর দুই পার্শ্বে অন্ধ, খঞ্জ ও বৃদ্ধ নানাপ্রকার ভিক্ষুকগণ ভিক্ষাপ্রাপ্তির আশায় বসিয়া থাকে। একটী পাই পয়সা পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট হয়। বলাবাহুল্য, এই অত্যুচ্চ দেবালয়ে উঠিবার সময় যত কষ্ট ভোগ করিতে হয়, নামিবার সময় তাহার চতুর্থাংশের একাংশও ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। এইরূপে সীমাচল পর্ব্বত, প্রহ্লাদপুরী ও দেবদর্শন করিয়া ভিজাগাপট্টমের বাসা বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং পর দিবস পুণ্যবতী গোদাবরী নদীতে স্নান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।



গোদাবরী

ওয়ালটেয়ার হইতে গোদাবরীতে স্নান করিতে যাইবার জন্য টাইম-টেবিলের সাহায্যে এমন একটী সময় নির্দ্ধারিত হইল, যদ্দ্বারা এই অপরিচিত স্থানে রাত্রিকালে না উপস্থিত হইতে হয়। ওয়ালটেয়ার হইতে গোদাবরী যাইতে হইলে গোদাবরী নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। ষ্টেশনটী পুণ্যসলিলা গোদাবরী নদীর উপরিভাগে অবস্থিত।

ধর্ম্মাত্মা ভগীরথ যেরূপ ভাগীরথী দেবীকে স্তবে তুষ্ট করিয়া হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে ভারতের সমতলক্ষেত্রে আনিয়াছিলেন, এক সময়ে গৌতম ঋষিও সেইরূপ মহেশ্বরকে তুষ্ট করিয়া, গঙ্গাদেবীকে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত গোদাবরীর অপর নাম গৌতমী। এই পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনীর জলে ভক্তিসহকারে অর্চ্চনাপূর্ব্বক স্নান করিলে ভাগীরথীর কৃপায় অন্তে পরম গতিলাভ হয় বলিয়া ইনি গোদাবরী নাম ধারণ করিয়াছেন। নদীটি পশ্চিমঘাট নামক পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্বমুখে সপ্তধারায় বিভক্ত হইয়া যে সপ্তমুখী হইয়াছে, যথাক্রমে সেই সপ্তধারার নাম প্রকাশিত হইল;—১। তুল্যা, ২। আত্রেয়ী, ৩। ভারদ্বাজী, ৪। গৌতমী, ৫। বৃদ্ধগৌতমী, ৬। কৌশিকী, ৭। বশিষ্ঠা।

গোদাবরী জেলার প্রধান নগরের নাম রাজমাহেন্দ্রী। এই স্থানে আদালত গৃহ, কাছারী, স্কুলবাটী সমস্তই আছে। নগরটী রাজধানী হইলেও জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় কোকনদায় বাস করিয়া থাকেন; কিন্তু ডিষ্ট্রীক্ট জজ এই স্থানে থাকেন। নগরটী "কোটীলিঙ্গ" মহাদেবের অবস্থিতির নিমিত্ত প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যাত্রীগণ এই স্থানে ভগবান্ কোটীলিঙ্গেশ্বর ও ভূগর্ভস্থ যে পাহাড় গোদাবরী নদীর ভিতর পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্যই গমন করিয়া থাকেন। পুণ্য-সলিলা গোদাবরী ধবলেশ্বর নামক স্থান হইতে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিতা হইয়াছে, এই সঙ্গম স্থানের উত্তরদিকস্থ স্রোতের নাম গৌতমী, আর দক্ষিণ ভাগের স্রোতের নাম বশিষ্ঠা। এই গৌতমী হইতে আবার ইহার তিনটী শাখা প্রবাহিতা হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, যথা—তুল্যা, আত্রেয়ী ও ভারদ্বাজী আর বশিষ্ঠা হইতে যে দুইটী শাখা বহির্গত হইয়াছে, তাহাদের নাম গৌতমী ও কৌশিকী, কিন্তু গোদাবরীর সমস্ত স্রোত যথায় একত্র মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গম স্থান সপ্ত গোদাবরী নামে খ্যাত। এই সঙ্গম স্থানের দৃশ্য অতি মনোহর। বঙ্গদেশে হিন্দুগণ গঙ্গাসাগর সঙ্গমকে যেরূপ পুণ্যতীর্থ বিবেচনা করেন, দাক্ষিণাত্যে সপ্ত গোদাবরীর সঙ্গম স্থানও তদনুরূপ পুণ্য প্রথিত।

পুণ্যসলিলা গোদাবরীর পবিত্র তটে উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত প্রধান প্রধান তীর্থগুলির সেবা করা কর্ত্তব্য।

১। পাদগয়া—এই স্থানে যাইতে হইলে পিঠাপুর নামে যে ষ্টেশন আছে, তথায় নামিতে হয়। চতুরানন ব্রহ্মার যজ্ঞকালে বৈষ্ণব চূড়ামণি গয়াসুর যখন দেহ ত্যাগ করেন, তখন গয়াতে মস্তক, বৈতরণীতে নাভি, আর এই পিঠাপুরে তাঁহার পাদদ্বয় অবস্থিত হইয়াছিল,

এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম "পাদগয়া" হইয়াছে। গয়াসুরের পদস্পর্শে এই স্থানটী পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে, প্রথম খণ্ডে গয়াতীর্থে ইহার সমস্ত বিবরণ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। এই স্থানে উপস্থিত হইয়া পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধারকামনায় শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিলে অন্তে পরম গতি লাভ হয়, এবং গয়া শীর্ষ স্থানের স্বরূপ পিণ্ডদানের ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব এই স্থানে পিণ্ডদানের পর দক্ষিণাসহ একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন। পিঠাপুরে যে স্থানে একটী বিষ্ণুমন্দির ও ক্ষুদ্র একটী জলাশয় দেখিতে পাইবেন, ঐ স্থানই পাদগয়া নামে বিখ্যাত; ঐ ক্ষুদ্র জলাশয়টীতেই পিতৃপুরুষদিগের পিণ্ডদান করিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান। সুখের বিষয় পাদগয়াতে পাণ্ডাদিগের, যাত্রীর প্রতি গয়াধামের গয়ালী-দিগের ন্যায় কোনরূপ জুলম দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানকার পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে তুষ্ট করিয়া যাহা প্রাপ্ত হন, তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন।

২। শ্যামলকোট—পিঠাপুরের পাদগয়া তীর্থের খালের পরপারে যে ষ্টেশন আছে, উহারই নাম শ্যামল-কোট। ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে "কুমার আরাম" নামক এক মহাদেব আছেন। ভগবান্ মহেশ্বর তথায় লিঙ্গরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই স্থানে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে কুমার আরামনাথ দেবকে পূজা করিতে হয়। মন্দিরটী দেখিতে উচ্চ, তাহার চতুর্দ্দিকে নানা জাতীয় ফল ও বৃহৎ বৃহৎ নারি-কেল বৃক্ষ সকল দণ্ডায়মান থাকিয়া ভক্তগণকে ভগবানরূপী লিঙ্গকে অর্চ্চনা করিবার উপদেশ দিবার জন্য যেন আহ্বান করিতেছে, আবার ইহার স্থানে স্থানে নানা জাতীয় সুদৃশ্য বৃক্ষ সকল ও পুষ্পোদ্যানগুলি সজ্জিত থাকায় ইহার শোভা শত গুণে বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছে। মূল-মন্দিরের সন্নিকটে পূর্ব্বদিকে একটা সুন্দর বাঁধান পুষ্করিণী আছে, ঐ

পুষ্করিণীতে প্রথমে স্নান করিয়া শুদ্ধকলেবরে শুদ্ধচিত্তে দেবালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ "কুমার আরামদেবের" প্রকাণ্ড লিঙ্গ দর্শনে নয়ন ও জীবন চরিতার্থ করিবেন। এই লিঙ্গরাজ দ্বিতল গৃহ ভেদপূর্ব্বক যেন ভক্তগণকে দর্শনদানে মুক্তিপ্রদান করিবার জন্যই দুই হস্ত প্রমাণ উর্দ্ধে উঠিয়া জাগিয়া আছেন। পূজারীগণ সেই দ্বিতলের উপর, যে স্থানে মহেশ্বরের অভিষেক হয়, তথায় সচ্ছন্দে বসিয়া সরিৎসার বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় ভাব উদ্রিক্ত করিয়া থাকেন। এরূপ উচ্চ ও বৃহৎ লিঙ্গ ভারতবর্ষের মধ্যে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। ভক্তগণ দূর হইতে এই দেবকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিয়া থাকেন। অভিষেকের সুবিধার নিমিত্তই পূজা স্থানটী দ্বিতলরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, কারণ সমতলভূমি হইতে এরূপ উচ্চ লিঙ্গের অভিষেক কিরূপে হইতে পারে ?

৩। কোকনদা—এই স্থানে যাইতে হইলে শ্যামলকোট ষ্টেশন হইতে কোকনদা পোর্ট নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। এই কোকনদা একটী সামুদ্রিক বন্দর। গোদাবরী নদীর উত্তর মুখের নিকট ইহা স্থাপিত। ষ্টেশনের অনতিদূরে ধর্ম্মশালা বিরাজমান। এই ধর্ম্মশালায় বিশ্রামপূর্ব্বক তীর্থতীরে পৌছানই শ্রেয়, কারণ তথায় সকল স্থানে সকল সময় বাসা ভাড়া পাওয়া যায় না। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় এই স্থানেই বাস করিয়া থাকেন, আর এই স্থানটীই গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান বলিয়া খ্যাত। পশ্চিমঘাট নামক পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে ইহা যে সপ্ত ধারায় বিভক্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে, কথিত আছে, এই সপ্তম স্থানেই ইহার এক শাখা কোকনদায় মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে ভাগ্যমান শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহল গমনকালীন "কমলেকামিনী" দেখিয়া জীবন সার্থক

করিয়াছিলেন, সেই অবধি এই সঙ্গম স্থানটী কমলেকামিনী "তীর্থ" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার তীরে উপস্থিত হইয়া নৌকাযোগে ঐ সঙ্গম স্থানে স্নান করিতে হয়, যে স্থানটী তীর্থ স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সঙ্গম স্থানের জল অতি নির্ম্মল, কিন্তু অপর স্থানের জল ঘোলা। এখান হইতে সাগরের গভীর গর্জ্জন স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়।

গোদাবরী নদী উৎপত্তির

কিম্বদন্তী এইরূপ ;—

একদা পার্ব্বতী দুঃখিত মনে দেবাদিদেব মহেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন, "প্রভো! আপনি আমায় আপনার অঙ্কোপাস্তে স্থান দেন, কিন্তু সপত্নী গঙ্গাদেবীকে সতত প্রফুল্লচিত্তে আপনার শিরঃস্থিত জটার মধ্যে স্থান দিয়া তাহার মান বাড়াইতেছেন ;—ইহা আমার অসহ্য, অতএব শ্রীচরণে এই প্রার্থনা, আপনি গঙ্গাদেবীকে সত্বর জটা হইতে নামাইয়া দিন। মহেশ্বর পার্ব্বতীর প্রার্থনায় কোনরূপ উত্তর করিলেন না, ইহাতে অভিমানিনী শঙ্করী গণেশের নিকট গমন করিয়া তাঁহার প্রতি শঙ্করের এই অবজ্ঞা, সবিশেষ প্রকাশপূর্ব্বক ইহার প্রতীকারের জন্য অনুরোধ করিলেন। সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত গণেশ ক্ষণেকের জন্য চিন্তা করিলেন, যে মাতা ইচ্ছা করিলে এক নিমিষে জগতের দুঃখ মোচন করিতে পারেন, যিনি জগজ্জননী নামে খ্যাত, আজ ভাগ্যক্রমে সেই গর্ভধারিণী মা আমার, কোন ছলে এ অধীনকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার দুঃখ মোচন করিতে অনুরোধ করিতেছেন? যাহা হউক, এ সুযোগ আমি কখন ত্যাগ করিব না, ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? গণেশ মনে মনে এইরূপ যুক্তিতর্ক করিয়া

তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক জননীর অভীষ্টপূরণের কামনায় শুভ যাত্রা করিলেন।

অতঃপর কার্ত্তিকের নিকট উপস্থিত হইয়া কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে সহজে কার্য্য সিদ্ধ হয়, দুই ভ্রাতায় ইহাই পরামর্শ করিতে করিতে সহসা মহর্ষি গৌতমের অসাধারণ ক্ষমতার বিষয় তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন সহোদরদ্বয় মাতৃদুঃখ মোচন করিবার মানসে গৌতম-আশ্রম ব্রহ্মগিরিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, স্বহস্তে স্বয়ং গৌতম ব্যস্তসহকারে আপনক্ষেত্রে বীজবপন করিতেছেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাঁহারা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। এবং ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। গণেশ কিছুকাল পরে ধ্যানযোগে সমস্ত অবগত হইয়া কার্ত্তিককে বলিলেন, "ভাই! আর চিন্তার প্রয়োজন নাই, আমি সমস্ত বুঝিতে পারিয়াছি, গত দ্বাদশ বর্ষ অনাবৃষ্টি হওয়াতে সর্ব্বত্রই অন্নাভাব হয়, ঐ সময় এই সকল ব্রাহ্মণ গৌতমের আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলে ঋষি শ্রেষ্ঠ গৌতম সমাগত ব্রাহ্মণদিগের সেবার নিমিত্ত প্রত্যহ তপস্যায় রত হইবার পূর্ব্বে এই ক্ষেত্রে বীজবপন করেন, তাঁহার তপঃপ্রভাবে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঐ সকল বীজ হইতে শস্য উৎপন্ন করিয়া অতিথি সেবা নির্ব্বাহ করেন, অদ্যাপিও তিনি সেই নিমিত্ত পূর্ব্ব প্রথানুসারে স্বহস্তে বীজবপন করিতেছেন। তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, এই সকল ব্রাহ্মণ থাকিতে আমাদের কার্য্যোদ্ধারে বিঘ্ন হইতে পারে, অতএব সর্ব্বপ্রথমেই ইহাদিগকে এ স্থান হইতে বিদায় করিতে হইবে, এইরূপ যুক্তিপূর্ব্বক তাঁহারা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে আশ্রমস্থিত ঐ সকল ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে ব্রাহ্মণগণ! এখন আর অনাবৃষ্টি নাই, ধরণী সর্ব্বত্রই সুজলা শস্যশালিনী, তবে আর কেন বৃথা পরের গলগ্রহ

হইয়া এ স্থানে অবস্থান করিতেছেন। আপনারা স্ব স্ব আশ্রমে সত্বর প্রস্থান করুন।"

অকস্মাৎ তাঁহারা বৃদ্ধের নিকট এইরূপ সম্ভাষিত হইয়া সকলেই আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া গৌতমের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন, কারণ তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ ঋষির আদেশেই আমাদিগকে এইরূপ বাক্য বলিতেছেন। গৌতম সহসা এই সকল ব্রাহ্মণদিগের যুগপৎ বিদায় প্রার্থনার কারণ কিছু স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বিপ্রগণ! আমি আপৎকালে আপনাদিগকে অন্ন দিয়াছি, এক্ষণে বসুন্ধরা শস্য-শালিনী বলিয়া আমাকে কি ত্যাগ করা আপনাদের উচিত হইতেছে?"

তৎশ্রবণে তাঁহারা লজ্জিত ও কুণ্ঠিত হইলেন, এবং আপন আপন অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন, তৎপরে ব্রাহ্মণবেশী বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "হে প্রবীণ! এই ঋষি অসময়ে আমাদের অন্নদান করিয়াছেন, অতএব তাঁহার অমতে আমরা কখনই অন্যত্র গমন করিতে পারিব না।" ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে এইরূপ উত্তর পাইয়া গণেশ কার্ত্তিককে বলিলেন, "ভাই! মাতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া যখন তাঁহারই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তখন নিশ্চয়ই আমরা জয়লাভ করিব সন্দেহ নাই, কিন্তু গঙ্গাদেবীকে ভগীরথের ন্যায় মর্ত্ত্যে আনিতে না পারিলে কোনরূপেই সফলকাম হইব না। আমার বিশ্বাস এই মহামুনি গৌতমই তপঃপ্রভাবে তাঁহাকে মর্ত্ত্যে আনিতে সমর্থ হইবেন, কিন্তু একটী কারণ নির্দ্দেশ না করাইতে পারিলে তিনি কি সম্মত হইবেন? যাহা হউক, এ বিষয় দ্বিতীয়বার আমায় চেষ্টা করিতে হইবে, আমার পরামর্শানুযায়ী যখন গৌতম প্রাতে আপন ক্ষেত্রে বীজবপন করিবেন, সেই সময় তুমি গাভীরূপ ধারণ করিয়া আমাদের কার্য্য-

সিদ্ধির জন্য ঐ স্থানের বীজগুলি নষ্ট করিতে আরম্ভ করিবে, ইহাতে তিনি নিশ্চয়ই বিরক্ত হইয়া তোমায় তাড়না করিবেন, তুমিও ঠিক্ সেই সময় মৃতবৎ হইয়া ভূমে পতিত হইবে, ইহার ফলে আমি উপযুক্ত সময় পাইয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে পারিব।

এইরূপ যুক্তি করিয়া কার্ত্তিক, গণেশের ইচ্ছানুসারে গাভীরূপ ধারণ করিয়া তথা কথিত সময়ে ক্ষেত্রের বীজ সকল নষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন, ঋষি ঐ গাভীর আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে তাড়না করিবামাত্র গাভীরূপী কার্ত্তিক মৃতবৎ নিশ্চেষ্টভাবে ভূমে পতিত হইলেন। ইত্যবসারে গণেশ এক বৃদ্ধবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া "গৌতম গোহত্যা করিয়াছে, গৌতম গোহত্যা করিয়াছে, সকলে এই পাপ স্থান পরিত্যাগ কর বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।"

তৎশ্রবণে অপরাপর ব্রাহ্মণগণ একত্রে আসিয়া দেখিলেন যে, গৌতম যথার্থই গো-হত্যা করিয়াছেন, অতএব এই পাপ স্থান পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া গমনোদ্যত হইলেন, তখন ছদ্মবেশধারী গণেশ সুযোগ বুঝিয়া গৌতমকে বিনীতভাবে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "ঋষিবর! আপনি তপঃপ্রভাবে যেরূপ নিত্য শস্য উৎপাদন করিয়া ব্রত পালনার্থে অতিথি ব্রাহ্মণদিগের জীবনদান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ এই মৃত গাভীকে গঙ্গাবারি স্পর্শে প্রাণদান করুন, তাহা হইলে আর কেহই এই স্থান পরিত্যাগ করিবে না।"

ঋষিশ্রেষ্ঠ গৌতম এই বৃদ্ধের বাক্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ধ্যানযোগ অবলম্বনে গণেশের সমস্ত চাতুরী বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তিনি নিকটস্থ ব্রাহ্মণদিগকে কিয়ৎকাল তথায় অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া ত্র্যম্বক পাহাড়ে গমন করতঃ ত্র্যম্বকেশ্বর মহাদেবের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

যে গঙ্গা হিমালয়ের ঔরসে সুমেরু কন্যা মনোরমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, দেবগণ যে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা কন্যার অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন, যাঁহারা হিমালয়ের অনুমতিক্রমে সন্তুষ্ট-চিত্তে সেই গঙ্গাকে লইয়া সুরলোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন, পরম বৈষ্ণব ভগীরথ, যে গঙ্গাদেবীর মহিমা অবগত হইয়া পৃথিবীতলে আনিবার জন্য সঙ্কল্পরূঢ় হইয়া সুরতরঙ্গিণীর বেগ ধারণার্থ ভক্তিসহকারে মহে-শ্বরের কঠোর তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য এবং ভস্মীভূত সগরগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ভক্তচূড়ামণি ভগীরথকে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইতে উপদেশ প্রদান করেন। ভস্মীভূত দিলীপরাজের পুত্র, যে ভগ-বানের উপদেশ মত ব্রহ্মলোকে গমন করতঃ চতুরাননকে স্তবে তুষ্ট করিলে পর তাঁহার আদেশ মত গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যধামে আসিতে হইয়া-ছিল, যে দেবী মর্ত্ত্যে আসিবার কালে বিষ্ণুপদে উপনীত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া বিষ্ণুপদী নামে খ্যাত হন, যে দেবী-সুরালয়ে অবস্থানকালে পূজ্যমানা হইয়া সুরধনী নাম অর্জ্জন করেন, যে গঙ্গা সুরালয় হইতে মর্ত্ত্যধামে হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশের কৈলাস-পর্ব্বতে পতিত হইবার সময় ভগবান শূলপাণী যাঁহাকে স্বেচ্ছায় সন্তুষ্ট-চিত্তে আপনি মস্তকোপরি জটামধ্যে স্থানদান করিয়া তাঁহার গতিরোধ করিয়াছিলেন, যে দেবী এইরূপে শত বৎসর নির্ব্বিঘ্নে অবস্থানপূর্ব্বক পরম সুখে কালযাপন করিতেছিলেন, আজ বিধির বিপাকে পতিত হইয়া মহাতপা গৌতম সেই পরম পূজনীয়া গঙ্গাদেবীকে জটাচ্যুতা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ভগবান একাম্রনাথের তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন।

দেবাদিদেব যখন গৌতমের স্তবে তুষ্ট হইয়া অভিলাষিত বর প্রার্থনা

করিতে আদেশ করিলেন, তখন গৌতম ভগবান্ মহেশ্বরকে সম্মুখে পাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিধিমতে স্তব করিতে করিতে প্রার্থনা করিলেন, "ভগবান্! যদি সদয় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সন্তুষ্টচিত্তে আপনার জটাস্থিত গঙ্গাদেবীকে আমায় প্রদান করুন।"

অন্তর্যামী ভগবান্ পূর্ব্ব হইতেই ঋষির অন্তরের ভাব অবগত হইয়া "তথাস্তু" বলিয়া দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিতে আজ্ঞা করিলেন। এবার গৌতম শঙ্করীর দুঃখ দূর করিবার উপযুক্ত অবসর পাইয়া কহিলেন, "সদাশিব! দাসের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক এই অনুমতি প্রদান করুন, যেন গঙ্গাদেবী আপনার আদেশক্রমে আমার অভিলাষ মত ত্রিধারা হইয়া মর্ত্ত্যে গমন করেন, কিন্তু যে যে দিক দিয়া তিনি গমন করিবেন, আপনার কৃপায় আমার দ্বিতীয় বরপ্রভাবে তাহার উভয় তীরভূমি সকল যেন পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়া আমারই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। আরও ঐ সকল তীর্থে স্বয়ং আপনাকে লিঙ্গরূপে বিদ্যমান থাকিয়া আমার বাসনা পূরণ করিতে হইবে। ভগবান্ মহেশ্বর ভক্ত গৌতমের ইচ্ছানুসারে তাঁহার সকল বাসনাই পূর্ণ করিয়া ভাগীরথীকে গৌতমের নির্দ্দেশ মত স্থান দিয়া মর্ত্ত্যে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। তখন শিবপ্রিয়া "গঙ্গাদেবী" শিবাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া গৌতমের অভিলাষ অনুসারে এই স্থান হইতে প্রথমে ব্রহ্মগিরির উপর দিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিতা হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন। এবার ঋষিবর পুনরায় এই স্থান হইতে দুই ধারা প্রসারিত করিবার অভিলাষ করিলেন। দেবী ও ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত এই স্থান হইতে ঐ দুই ধারার মধ্যে এক ধারা গৌতমের আশ্রম ভেদপূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ করিলেন, অপর ধারাটী আকাশপথে 'বিয়ৎগঙ্গা' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন, কিন্তু এক্ষণে কলি-কলুষের উত্তেজনায় কলির পাপে উক্ত ধারাটী মানব চক্ষুর অন্ত-

স্রালে প্রবাহিত। যাঁহারা পবিত্র ধাম বদরিকাশ্রম দর্শন করিতে যাই-বেন, তথায় তাঁহারা আকাশগামী বিয়ৎগঙ্গার দর্শন পাইবেন। গৌতম ঋষির কৌশলে ভাগীরথীকে এইরূপে ত্রিমার্গগামিনী হইয়া বিচরণ করিতে হইয়াছে। তাই গঙ্গার আর একটী বিশেষণ—"ত্রিপথ-গামিনী"।

এদিকে স্রোতশালিনী গঙ্গার সহিত ঋষিবর আপন আশ্রমে উপ-স্থিত হইয়া ছদ্মবেশধারী গণেশকে বন্দনা করিবার সময় অপরাপর ব্রাহ্মণগণ দেখিলেন যে ঐ পবিত্র গঙ্গাম্বারি স্পর্শে গাভী পুনর্জ্জীবিত হইয়া বিচরণ করিতেছে, তদ্দর্শনে সকলেই গৌতমের অসীম ক্ষমতার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে করিতে ঐ স্রোতে ভক্তি-সহকারে স্নান করিয়া আপন আপন জীবন সার্থক বোধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে গঙ্গাদেবী গৌতম ঋষির তপঃপ্রভাবে মহেশ্বের আদেশে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যে গৌতমী নামে খ্যাত হইয়াছেন। কলিকালে মানবগণ শুদ্ধচিত্তে ভক্তিসহকারে এই গৌতমীর জলে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে অন্তে পরম গতিলাভ করিতে সক্ষম হন।

এদিকে গণেশ গৌতমের দ্বারা আপন কার্য্য উদ্ধারপূর্ব্বক মাতৃ-চরণে প্রণত হইয়া এই শুভ সংবাদ প্রদান করেন, তখন পার্ব্বতীদেবী সপত্নীর অধোগমনে প্রফুল্লমনে স্নেহসহকারে গণেশের মুখচুম্বন করিলেন।

গৌতম আশ্রম ব্রহ্মগিরির যে স্থানে এই অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, উহা "কচুর" নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রাজমহেন্দ্রবরমের সম্মুখে অদ্যাপি বিরাজমান থাকিয়া ঋষিবরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। যাত্রীগণ তথায় গমন করিলে ভাটার সময় ঐ স্থানে চড়া পড়িলে গাভী-রূপী কার্ত্তিকের ক্ষুর চিহ্ন অদ্যাপি দেখিতে পাইবেন। যে সকল যাত্রী

যাঁহারা কষ্ট স্বীকার করিয়া কোকনদার সঙ্গম স্থানে যাইতে অক্ষম,তাঁহারা গোদাবরীর ঐ সঙ্গম স্থানের উদ্দেশে গোদাবরীতে স্নান, দান, করিলেও সেই ফল প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাঁহারা কোকনদার "কমলেকামিনীর" স্থান মাহাত্ম্যহেতু তথায় গমন করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্নান করিতে অভিলাষ করিবেন, তাঁহাদিগকে তীর হইতে বোটে চড়িয়া স্নান করিতে হইবে। গোদাবরী জেলার তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া এখান হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর দেবকে দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

সেতুবন্ধ তীর্থ দর্শন করিতে যাইতে হইলে বেঙ্গল নাগপুর রেলযোগেই প্রথমে মান্দ্রাজ, তৎপরে এগমোর, তথা হইতে মাণ্ডাপম্ নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া রেলওয়ে যাত্রী ষ্টীমারের সাহায্যে পক্ প্রণালী নামক সাগরের উপর দিয়া প্রায় দেড় মাইল পথ ভাসিতে ভাসিতে অতিক্রম করিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে রামেশ্বর নামক দ্বীপে উপস্থিত হইতে হইবে।

দক্ষিণ তীর্থযাত্রার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি যত্নসহকারে সংগ্রহ করিবেন।

১। দেবার্চ্চনার নিমিত্ত ;—

সিদ্ধি, গাঁজা, কৃষ্ণতিল, স্বর্ণখণ্ড ৬ খানি, কর্পূর অন্যূন /৮০ পোয়া, কারণ সকল দেবালয়েই কর্পূরারতি হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক দেবালয়ে আরতির নিমিত্ত সামান্য সামান্য কর্পূর দান করিবার নিয়ম আছে। দেবালয়ে দান করিবার নিমিত্ত মসলার যায় ;—শুপারি, হরিদ্রা, বড়এলাচ, ছোটএলাচ, মৌড়ি, যোয়ান, দারুচিনি প্রভৃতি— রক্তচন্দন ১২ খানি, শ্বেতচন্দন ৩ খানি, চিনের সিন্দুর ১০ টিপ—এক বাণ্ডিল, মোমের বাতি ছোট সাইজের ১০টা, হরিতকী ফল সঙ্কল্প

করিবার নিমিত্ত ২০টী, বিল্বপত্র ১০ দফা, তুলসীপত্র ৩ দফা, সাধ্যানুসারে/ স্বর্ণ বা রৌপ্যের প্রস্তুত করাইয়া লইবেন, যজ্ঞোপবীত ২ কুড়ি, আল্‌তা ২ কুড়ি, সিন্দুর চুবরী মায় সাজ ৫ দফা, পঞ্চরত্ন ১০ দফা, কোক-নদার সঙ্গমস্থলে, কাঞ্চীপুরে মক্ষদায়ক তীর্থে, লক্ষ্মণ তীর্থে, কোটী তীর্থে, গঙ্গা তীর্থে, গোদাবরীতে ও সাগরে পঞ্চরত্ন দিতেই হইবে। গোদাবরী, মিনাক্ষ দেবী, সুন্দরা দেবী ও রামেশ্বরী দেবী এই চারি দেবীর চারিখানা লালপাড় সাড়ি, চারি দফা সিন্দুর, সসাজ সিন্দুর চুবড়ী, আল্‌তা, রুলি ৪ দফা, লোহা ৪ দফা আর থালা, গেলাস চারি দফা। এতদ্ভিন্ন যাঁহার দর্শনের নিমিত্ত এই দূরদেশে যাত্রা করিতেছেন, সেই রামেশ্বরী দেবীর একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত নথ সংগ্রহ করিবেন। উল্লিখিত দ্রব্য সামগ্রী ব্যতীত সমস্তই কিছু কিছু অধিক হারে সংগ্রহ করিবেন, কারণ এই ফর্দ্দ অসমর্থপক্ষে লিখিত হইল।

যাত্রীদিগের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যের তালিকা ;—

বাতি ৬ বাণ্ডিল বা হ্যারিকেন লাম্প ১টী, বিছানা ১ দফা, ঘৃত ১ টীন, ডাল, ময়দা সাধ্যমত সংগ্রহ করিবেন। কেরোসিন ষ্টোভ ১টী, চাটু ১ দফা, লুচি ভাজিবার ছোট করাই ১ খানা, খুন্তি ১ দফা, কারণ দাক্ষিণাত্যে সকল স্থানে লুচিপুরির দোকান না থাকায় সময়ে সময়ে খাদ্যদ্রব্যের নিমিত্ত অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়। যাঁহাদের তামাকু সেবনের অভ্যাস আছে, তাঁহারা এখান হইতে ভাল তামাক সংগ্রহ করিতে ভুলিবেন না, তথায় সকল স্থানে তামাক বা টিকা পাওয়া দুর্ঘট, যোয়ানের আরক ১ বোতল, ক্লোরোডাইন ১ শিশি, কিছু অম্ল-আচার, পরিধেয় বস্ত্র থানকয়েক বেশী পরিমাণে সঙ্গে রাখিবেন, কারণ পশ্চিম তীর্থের ন্যায় রজকের সুবিধা এখানে নাই। সকল সময়েই এই

তীর্থে যাওয়া যায়, কিন্তু আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে কিম্বা কার্ত্তিক মাসের প্রথম ভাগে এই তীর্থে যাইবার প্রশস্ত সময় নিরূপিত আছে। গ্রীষ্ম ঋতুতে এ প্রদেশের পথগুলি এত কষ্টদায়ক হয় যে, ভূমে পা পাতিতে পারা যায় না, বর্ষা ঋতুতে বৃষ্টির নিমিত্ত দেবদর্শনে ব্যাঘাত ঘটায়, আর শীত ঋতুতে বরফের প্রকোপে সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া যায়, ইহার প্রধান কারণ এই যে, দক্ষিণ প্রদেশটী কেবল পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত।

মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সি

ভারত প্রায়দ্বীপের দক্ষিণাংশ ও বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম তীরবর্ত্তী দীর্ঘ ভূমিখণ্ড মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত। ইহার তিনদিকেই সমুদ্র আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছে। এই প্রেসিডেন্সির ক্ষেত্রপরিমাণ ৭১০০০ বর্গ ক্রোশ। দক্ষিণ-পশ্চিম কূলবর্ত্তী অনেক স্থানের ভূমি কঠিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত।

দাক্ষিণাত্যের সমভূমি ঘাট পর্ব্বত ও সমুদ্র এবং মধ্যবর্ত্তী জেলা যে সকল আছে, উহা সমস্তই মান্দ্রাজের অন্তর্গত। ইহার দক্ষিণ ভাগ ব্যতীত পূর্ব্ব উপকূলের অধিকাংশ স্থান সমতল। পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট-পর্ব্বত এ দেশের প্রধান পর্ব্বতমালা নীলগিরির সহিত দক্ষিণদিকে সংযুক্ত। গোদাবরী, কৃষ্ণা এবং কাবেরী—এই তিনটী এ দেশের প্রধান নদী। এই তিন নদীই সহর পরিবেষ্টন করিয়া বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিতা হইয়াছে। এ দেশের জলবায়ু বিশেষতঃ পূর্ব্ব উপকূলে অত্যন্ত গরম। উত্তর ভারতবর্ষে যেরূপ, কখন অত্যন্ত শীত ও কখন অত্যন্ত গ্রীষ্ম অনুভব হয়, মান্দ্রাজে সেরূপ নাই। দাক্ষিণাত্যের

সমতল ভূমিতে বৃষ্টিপাত অতি কম বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টি যথেষ্ট হয়।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির লোক সংখ্যা অন্যূন তিন কোটী আশী লক্ষ। ইহার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে তৈলঙ্গী, দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রদেশে কর্ণাটিকা, আর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশে মালবারী ভাষা প্রচলিত। এই সকল ভাষাই দ্রাবিড়ীর অথবা দাক্ষিণাত্য ভাষা পরিবারভুক্ত। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই হিন্দু, ছয়জনের মধ্যে একজনমাত্র মুসলমান আছে। এ দেশে খ্রীষ্টিয়ানের সংখ্যা এত অধিক যে, সমস্ত ভারত মধ্যে অপর কোন অংশ ইহার সহিত তুলনায় আসে না।

মান্দ্রাজ নগর

এই প্রেসিডেন্সির রাজধানী, "মান্দ্রাজ নগর" গর্ব্বভরে আপন শোভা বিস্তার করিয়া সমুদ্রকূলে বিরাজিত। দক্ষিণ ভারতবর্ষে এত বড় নগর আর দ্বিতীয় নাই। স্থানীয় অধিবাসীরা ইহাকে চীনাপত্তনম্ বলে অর্থাৎ চীনাপার নগর, কারণ কথিত আছে এই নগর পত্তনকালে যে রাজা ছিলেন, চীনাপা তাঁহার সহোদর, সেই মহাত্মার উদ্যোগ এবং অমিত পরিশ্রমে এই নগরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রামেশ্বর যাইবার কালে প্রথমে মান্দ্রাজে নামিতে হয়, অতএব এই স্থানে উপস্থিত হইয়া এখানকার দ্রষ্টব্য স্থান ও সহরের শোভা দেখিতে অবহেলা করা উচিত নয়। মান্দ্রাজ সহরটী সমুদ্র তীরের উপর মনোমুগ্ধকারী অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত এবং তুলনায় কলিকাতা সদৃশ একটী সমৃদ্ধিময়ী সহর।

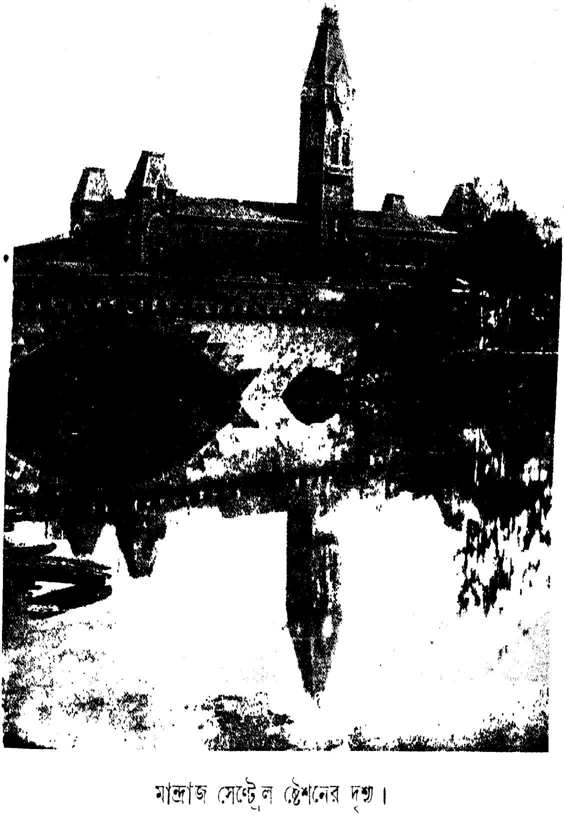
এই সহরটী শ্বেত ও কৃষ্ণ নামে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। কৃষ্ণ নামে যে নগর আছে, তথায় কেবল দেশীয়েরা বাস করিয়া থাকেন, আর সহরের শ্বেত বিভাগে কেবল সাহেবগণ এবং দেশীয়ের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিরা বাস করিয়া থাকেন, এক্ষণে যে স্থানে মান্দ্রাজ নগর স্থিত, ১৬৩৯ খৃঃ মিঃ দে নামে একজন ইংরাজ বীর-পুরুষ চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে ঐ স্থানটী প্রাপ্ত হন। পরে ইংরাজেরা সামান্য রকম গড়বন্দি করিয়া উক্ত স্থানে এক কুঠী নির্ম্মাণ করাতে দেশীয় লোকেরা ঐ কুঠীর চারিদিকে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে এখানে বিস্তর বসতি হয়, তদ্দর্শনে ইংরাজেরা সেই সময় হইতে এই স্থানের নাম ব্ল্যাকটাউন বা কৃষ্ণনগর প্রচার করেন। কথিত আছে, ১৬৯০ খৃঃ এই কৃষ্ণনগরের চতুর্দ্দিকে মাটীর প্রাচীর দিয়া ইংরাজেরা প্রথমে মহারাষ্ট্রীয়দের আক্রমণ হইতে রক্ষা পান, পরে ১৭৪৬ খৃঃ উপযুক্ত সময় পাইয়া এই স্থান আরও প্রশস্ত-পূর্ব্বক একটী সুদৃঢ় কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে গড়বন্দি করেন। এক্ষণে সেই দুর্গ যাহা আমরা দেখিতে পাই, ১৭৮৭ খৃঃ তাহার অধিকাংশই নির্ম্মিত হইয়া তখনকার ইংলণ্ডের রাজা জর্জ্জের নামানুসারে উহা সেণ্ট জর্জ্জ নামে খ্যাত হইয়াছে।

সমুদ্রতীর হইতে যে একটী দুর্গ নয়নপথে পতিত হয়, উহাই সেই প্রাচীন দুর্গ। এই স্থান হইতে সহরটী দেখিলে সওদাগরদিগের কয়েকটী কার্য্যালয় এবং কতকগুলি বাটী প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানটী এত নিম্ন যে, এই কার্য্যালয়গুলি সম্মুখে থাকাতে নগরের অবশিষ্ট অংশ প্রায় দেখা যায় না। আর এই স্থানে সাবেক নগরের ঘেরা প্রাচীরের মধ্যে কৃষ্ণনগর শোভা পাইতেছে। এখানে অত্যন্ত ঘন বসতি। নগরের এই অংশ কারবারের স্থল। এই স্থানেই পোতাশ্রয় ও বাঁধ, ব্ল্যাক টাউনের সমুদ্র কূল দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এখানে কেবল

একটী বাঁক ছিল, জাহাজ সকল নগর হইতে অনেক দূরে নঙ্গর ফেলিয়া থাকিত, আরোহীরা নৌকা করিয়া তথা হইতে তীরে উঠিত। এই নৌকাগুলি বড় বড়, তক্তার ন্যায় দড়ি দিয়া বাঁধা, সুতরাং ঢেউ লাগিলে ভাঙ্গিয়া যায় না। মান্দ্রাজের জেলেরা এইরূপ নৌকায় উঠিয়া সমুদ্রে মৎস্য ধরিয়া থাকে। ব্ল্যাক টাউনের দক্ষিণে একটী মাঠ আছে, এই মাঠের সম্মুখে প্রায় এক ক্রোশ পরিমাণ সমুদ্র। এই মাঠেই দুর্গ, লাট সাহেবের বাটী এবং আরও কতকগুলি সুন্দর প্রাসাদ আছে। নগরটী ১০ বর্গ ক্রোশ ভূমি ব্যাপীয়া স্থাপিত, ইহাতে ২৩টী গ্রাম আছে, এ স্থলের অনেকে কৃষিকার্য্যপূর্ব্বক শস্য উৎপন্ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এই নগরের প্রধান রাস্তার নাম "মাউণ্ট রোড।" ইহার মধ্য দিয়া কুম নদী গিয়াছে, কিন্তু বার মাস এই স্থানে নৌকা চলে না। এখানে গ্রীষ্ম অধিক পরিমাণে অনুভব হয়, কিন্তু সমুদ্রের বাতাস স্নিগ্ধকর। যদিও মান্দ্রাজে হিন্দুদিগের কোনরূপ প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান নাই, তথাপি এই প্রাচীন নগরের শোভা সৌন্দর্য্য উপভোগের বিস্তর জিনিষ আছে।

রেলওয়ে কোম্পানীর মান্দ্রাজ নামে কোন নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশন দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে ওয়াসার ম্যানপেট নামক ষ্টেশনের পর একটী বৃহৎ "সেণ্ট্রেল জংশন" নামে ষ্টেশন আছে, উহাই মান্দ্রাজ সেণ্ট্রেল ষ্টেশন নামে প্রসিদ্ধ। মান্দ্রাজ মেল ট্রেণ এই স্থানেই উপস্থিত হয়। ষ্টেশনটী সমুদ্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাগরের উপর হইতে ইহার দৃশ্য অতি মনোহর। এখানে বুক ষ্টল, নানাবিধ মনিহারী দোকান এবং নানাপ্রকার আহারীয় খাদ্যদ্রব্য আরও বহুবিধ ফলমূল সস্তা দামে পাওয়া যায়। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত মান্দ্রাজ সেণ্ট্রেল ষ্টেশনের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য প্রদত্ত হইল।



মান্দ্রাজ সেণ্ট্রেল ষ্টেশনের দৃশ্য।

[৩৮ পৃষ্ঠা।]

ওয়াসার ম্যানপেট, রামপুরাম, বীচ্ ও এগমোর এই চারিটী নগরকে লইয়া মান্দ্রাজ নাম গঠিত হইয়াছে, এবং ঐ সকল নগরের নামানুসারে প্রত্যেক নগরে এক-একটী ষ্টেশন শোভা পাইতেছে, অর্থাৎ এই চারি নগরের অধিবাসীগণই মান্দ্রাজবাসী নামে খ্যাত আছেন। এখানকার মান্দ্রাজ নগরের লোকসংখ্যা অনূ্যন ৫,১০,০০০ হাজার। যে সকল যাত্রী সেতুবন্ধতীর্থে যাইবার জন্য এখানে উপস্থিত হইবেন, তাঁহারা প্রথমে এই সেণ্ট্রেল ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া মান্দ্রাজ নগরের শোভা দর্শন করিবেন, তাহার পর এই ষ্টেশন হইতে এগমোর নামে যে জংশন ষ্টেশন পাইবেন, ভগবান রামেশ্বর দেবজীউকে দর্শন করিবার জন্য তথায় নামিবেন।

মান্দ্রাজ সহরে পকেট মারার এত প্রাদুর্ভাব যে, সহর কলিকাতাকেও ইহার নিকট হার মানিতে হয়, অতএব বিদেশবাসিগণ! এই ভয়ানক স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বিশেষরূপে সতর্ক হইবেন, এবং পকেটে বা স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্রাঞ্চলের খোঁটে কোনরূপ টাকাকড়ি রাখিতে বাধা প্রদান করিবেন। সে যাহা হউক, ষ্টেশন হইতে নগরের মধ্যে যাইবার সময় দেখিবেন, কলিকাতার ন্যায় এখানেও সহরের চতুর্দ্দিকে ইলেক্ট্রিক ট্রাম গাড়ী যাতায়াত করিতেছে। অশ্বযানেরও অভাব নাই।

মান্দ্রাজে পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিয়া বাসা ভাড়া বা বাটী ঠিক্ না করিলে পৃথক একটী বাটী মেলা দুর্লভ। এই নিমিত্ত কোন নূতন যাত্রী এখানে উপস্থিত হইলে কোনরূপে বাটী ভাড়া না পাইয়া বাধ্য হইয়া ছত্র বাটীতে বাস করিয়া থাকেন, আমরাও এখানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে বাসার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া যখন হতাশ হইলাম, তখন স্থানীয় একটী লোকের নিকট উপদেশ পাইলাম যে এই ষ্টেশনের অনতিদূরে ধর্ম্মাত্মা

রামস্বামী মুদালিয়ারার একটী ধর্ম্মশালা আছে, তথায় অনায়াসে বিদেশী লোক বাস করিতে পারেন, কারণ স্বামীজী এই উদ্দেশেই অকাতরে বহু অর্থ ব্যয়সহকারে এই পান্থশালাটী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এইরূপ উপদেশ পাইয়া তথায় গমন করিবামাত্র দেখিলাম যে, ঐ ধর্ম্মশালায় তিলার্দ্ধ স্থান নাই, আমাদের যাইবার পূর্ব্বেই কেবল অপরিচিত রেলযাত্রীতেই উহা পরিপূর্ণ হইয়াছে। এইরূপ জনতাপূর্ণ স্থানে পরিবারবর্গ লইয়া কিরূপে রাত্রিযাপন করিব, তাহার উপর আবার পকেটমারার উৎপাত, এই সকল চিন্তা করিতেছি, এমন সময় উক্ত ধর্ম্মশালার একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী দূর হইতে আমাদের অবস্থা দেখিয়া আমাদের উপর কৃপাপরবশ হইলেন, তিনিই নিকটস্থ অপর একটী "মাড়োয়ারী ছত্র" নামে যে বাটী আছে, উহাতে আমাদের সকলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া থাকিবার জন্য দুইখানি ঘর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন, তাঁহার এই উদারতার বিষয় চিরকাল স্মরণ রাখিব। তখন মনে ভাবিতে লাগিলাম, যদি এই সদাশয় ব্যক্তি অনুগ্রহ করিয়া বিশ্রাম স্থান চেষ্টা করিয়া না দিতেন, তাহা হইলে এই অপরিচিত স্থানে স্ত্রীপুত্র লইয়া সে রাত্রি পথেই যাপন করিতে হইত। যাহা হউক, ভগবানের নিকট সেই ভদ্রলোকটীর দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিয়া সেদিনের মত ঐ ছত্র বাটীতেই রাত্রি যাপন করিলাম।

যে মান্দ্রাজ এত বড় সহর, যেখানে ৫,১০,০০০ সহস্র ধনী ও দরিদ্র অধিবাসীগণ সকলেই বাস করেন, আশ্চর্য্যের বিষয় তথায় এক মাইল পথের মধ্যে কোথাও একখানি লুচিপুরির দোকান দেখিতে পাইলাম না। রাস্তার দুই পার্শ্বে যে সকল খাবারের দোকান আছে, তথায় কেবল ক্ষীরের প্রস্তুত জঘন্য মিষ্টান্ন, ফুলুরি ও তেলে ভাজা জিলিপি, কত লুব্ধরসনার প্রতীক্ষা করিতেছে। আমাদের ঐরূপ নিকৃষ্ট খাদ্য

ভোজনে প্রবৃত্তি হইল না। সন্দেশ বা ছানার দ্রব্যের গন্ধ নাই, অনু-সন্ধানে অবগত হইলাম যে, এদেশের লোকদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস, দুগ্ধ হইতে ছানা প্রস্তুত করিলে দুগ্ধের জাতিনাশ হয়, সুতরাং দুগ্ধ হইতে ক্ষীর করিয়া তাহাতে অধিকমাত্রায় চিনি সংমিশ্রণে লাড়ু প্রস্তুত করিয়া তাহাই বিক্রীত হয়। এখানকার সকলই বিপরীত, রাস্তার ধারে কলিকাতার ন্যায় পানের দোকান আছে সত্য, কিন্তু ঐ সকল খিলিপানে মসলা দেওয়া থাকে না বা পানের বোঁটা বাদ দেওয়া হয় না। এইরূপে নানাস্থানে আহারীয় খাদ্য সামগ্রীর সন্ধান করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইলাম না, তখন অগত্যা কিছু ক্ষীরের প্রস্তুত মিষ্টান্ন খরিদ করিলাম এবং ছত্র বাটীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক আমাদের নিকট যে কেরোসিন ষ্টোভ ছিল, উহার সাহায্যে কিছু লুচি ভাজাইয়া ক্ষুৎপিপাসার করাল-গ্রাস হইতে পরিত্রাণ পাইলাম। তৎপরে ভগবানের নাম স্মরণপূর্ব্বক সেদিনকার মত বিশ্রাম করিলাম।

পরদিন প্রাতে বাসায় দেখিলাম যে, রামেশ্বর তীর্থের পাণ্ডা নিযুক্ত গোমস্তা সকল, যাত্রী পৌঁছান সংবাদ পাইয়া আমাদিগকে আয়ত্ত করিবার জন্য এই ছত্র বাটীতে আসিয়া আমাদিগের অনুসন্ধান করিতেছেন। তৎপরে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার মিষ্ট বাক্যে আলাপ করিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা যে তেলেগু ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিলেন, উহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তাহার পর যে একটী বৃদ্ধ গোমস্তা উপস্থিত হইলেন, তিনি আধা ইংরাজী, আধা হিন্দী মিশ্রিত ভাষায় কথা কহিয়া আলাপ করিলেন, এবং রামেশ্বর তীর্থ দর্শনের সময় তাহারই পাণ্ডাকে তীর্থগুরু পদে মান্য করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। লোকটী বেশ মিষ্টভাষী, তাহার সহিত অনেকক্ষণ বাক্যালাপে বুঝিলাম যে, তাহার উদ্দেশ্য মহৎ

এবং লোকটী অতিশয় ধার্ম্মিক, এই বিশ্বাসে তাহার আশ্রয় লইলাম, কারণ এই অপরিচিত স্থানে স্থানীয় একটী লোক থাকা বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা করিলাম, যাহা হউক, তাহারই পাণ্ডাকে তীর্থগুরু পদে মান্য করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিলাম, ইহার প্রধান কারণ এই যে, এখান হইতে গঙ্গাধর পীতাম্বর পাণ্ডার সুনাম শুনিয়াছিলাম। এই গোমস্তাটী তাঁহারই একজন পুরাতন কর্ম্মচারী। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া এখানকার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির শোভা দর্শন করিবার মানসে তাহারই উপদেশ মত পথ দিয়া অশ্বযানের সাহায্যে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম।

এইরূপে সহরের এক স্থানে গাড়ীওয়ালাকে বিদায় করিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করতঃ সহরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এখানে সকল পথেই ট্রাম বা ঘোড়ার গাড়ীর অভাব নাই, ভ্রমণকালে সৌভাগ্যক্রমে আবার একটী স্থানীয় ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল, তিনি ডকে কর্ম্ম করেন এবং বেশ ইংরাজী ভাষায় কথা কহিতে পারেন, কিন্তু হিন্দী বা বাঙ্গালা ভাষা কিছুই বুঝিতে পারেন না। আমরা কলিকাতার লোক অবগত হইয়া কলিকাতার বিষয় শুনিবার জন্যই তিনি আমাদের নিকট আসিয়াছিলেন, সে যাহা হউক, সেই লোকটী সঙ্গে থাকায় কোন জুয়াচোর বা পকেট মারা আমাদের নিকট আসিতে পারে নাই। কথায় কথায় তাহার নিকট গত কল্য বাসা ভাড়া না পাইয়া যে কিরূপ কষ্ট পাইয়াছিলাম, উহা ব্যক্ত করাতে তিনি উত্তর করিলেন,"বাবু! আপনারা কলিকাতায় থাকেন, কলিকাতাবাসীদের টাকা হইলেই তাহারা ২।৪ খানি বাটী নির্ম্মাণ করিয়া উক্ত বাড়ীগুলি ভাড়া দিয়া দু' দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন, কিন্তু এখানকার লোকদিগের ঐরূপ ইচ্ছা নয়, ইহাদের বিশ্বাস, টাকা

হইলেই ছত্র বাটী, অতিথিশালা, অতিথি সেবা এই সকল পুণ্য কর্ম্ম করিতে পারিলেই মানব অক্ষয় হয়, এই হেতু এখানে নিকটে নিকটে ২।১ মাইল অন্তর এত ছত্রবাটী আছে যে, বাসা ভাড়া করিবার আবশ্যক হয় না। এমন কি, যদি কোন যাত্রী এখান হইতে হাটা পথে প্রত্যহ একটী করিয়া ছত্রে বাস করিয়া, বরাবর সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ পর্য্যন্ত গমন করেন, এবং প্রত্যাগমনকালে একটী করিয়া ছত্রে বাস করিয়া ফেরেন, তাহা হইলে খুব কম এক বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। এ দেশের ধনী ব্যক্তিরা তাহাদের অধিকাংশ ধন এইরূপে সদ্ব্যবহার করেন, কারণ তাঁহাদের বিশ্বাস কোন বিদেশবাসী এখানে কোথাও বাস করিবার স্থান না পাইয়া যাহার ছত্রে তিনি রাত্রিযাপন করিবেন, তাহার অত্যন্ত পুণ্য সঞ্চয় হইবে, কিন্তু উক্ত যাত্রী যদি ব্রাহ্মণ সন্তান হন, তাহা হইলে ছত্র বাটীর নিয়ম অনুসারে তাঁহার সেবার একটী সিধাও প্রাপ্ত হইবেন। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, একটী বেকার ব্রাহ্মণের ছেলে এইরূপ প্রকারে বারম্বার যাতায়াত করিলে তাহার জীবনের সমস্ত সময় বিনা খরচায় কাটাইতে পারেন। এখানে নিকটে নিকটে ধর্ম্মশালাগুলির সুব্যবস্থা করিয়া কেহ বাটী ভাড়া দিয়া কলিকাতাবাসীর ন্যায় উপার্জ্জনের আশাও করেন না। এইরূপ প্রথা বোধ হয় আপনাদের বাঙ্গালা দেশে নাই।"

মান্দ্রাজ সহরের সকল রাস্তাই প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন, কিন্তু আবার স্থানে স্থানে ড্রেন না থাকায় ঐ স্থানগুলি অত্যন্ত কদর্য্য দেখায়। সহরের মধ্যে যে সকল বড় রাস্তা আছে, ঐগুলি এরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়াছে যে, বর্ষাকালে কলিকাতার রাস্তার ন্যায় জল জমিতে ও কাদা হইতে পায় না। সহরের নানা স্থান দেখিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, সহরটী কলিকাতার ন্যায় সমৃদ্ধিশালী না হইলেও সমুদ্রের

তীরে অবস্থিত, এই কারণে স্থানটী অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর, সুতরাং বাঙ্গালা দেশের বহু পীড়াগ্রস্ত লোকদিগকে তথায় বায়ু পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বাস করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সহরে এক সমুদ্র পথ ও কুম নদী ব্যতীত অন্য কোন নদ বা নদী না থাকায় বাণিজ্যের সুবিধার্থে সমুদ্র তীর হইতে এক-একটী খাল কাটা আছে, ঐ সকল খালের সাহায্যে প্রত্যেক পল্লী হইতে বোটে করিয়া মালগুলি আনীত হইয়া জাহাজে আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। আরও এই উদ্দেশে দুইটী রেলওয়ে লাইনও প্রস্তুত আছে, সেই লাইন দুইটীর সাহায্যে রেলগাড়ী নগরের উপর দিয়া সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া জাহাজ সমূহে মাল সরবরাহ হইয়া থাকে।

মান্দ্রাজ উপকূলে যখন-তখন প্রবল ঝড় উঠিয়া থাকে, তাহাতে অনেক সময় নৌকাদি জলমগ্ন হয়, এই নিমিত্ত এখানকার পুরাতন হাইকোর্টের সম্মুখে সমুদ্রবেষ্টনপূর্ব্বক এক অদ্ভুত বন্দর প্রস্তুত হইয়াছে, আর ইহার উপরে একটী উচ্চ গৃহমধ্য হইতে লাইট হাউসের কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই লাইট হাউসের কার্য্য প্রণালী দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় এবং নানাপ্রকারে শিক্ষা পাওয়া যায়।

মান্দ্রাজ ডক্ স্থাপত্যবিদ্যার এক অদ্ভুত কীর্ত্তি। এখানে জাহাজ সকল নিরাপদে অবস্থান করে। বাহির সমুদ্রে ভয়ঙ্কর ঝড়, তুফান প্রায়ই বিদ্যমান, কিন্তু এই ডকের ভিতরের জল সর্ব্বদাই স্থির, তাই নির্ব্বিঘ্নে দ্রব্যাদি উত্তোলিত হয়। ডকের এক পার্শ্বে একটী জেটী আছে, ঐ জেটীর উপর হইতে নির্ব্বিঘ্নে মাল সকল জাহাজে উত্তোলিত হইয়া থাকে। জেটীর যে ধারে মাল আছে, সেইদিকে সহজে কোন অপরিচিত লোক প্রবেশ করিতে পান না, ইহার অপর ধারে কত লোক হাত সুতায় মৎস্য ধরিয়া কত আনন্দ অনুভব করিতেছেন। এই ডকের



মান্দ্রাজ ডকের দৃশ্য।

[৪৪ পৃষ্ঠা।]

একদিকে একটী অদ্ভুত প্রকাণ্ড প্রাচীর দেখিতে পাইবেন, উহা সমুদ্র-গর্ভে অনেক দূর পর্য্যন্ত প্রথিত হইয়া গিয়াছে, সাগরের তরঙ্গরাশি অনবরত এই প্রাচীরে আঘাত করিতে থাকে, উহাতে যে ঢেউ উত্থিত হয়, সেই মনোহর ফেণপুঞ্জের দৃশ্য অবলোকন করিলে কত আহ্লাদিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

মান্দ্রাজ ডকের সমতুল্য বন্দর ভারতমধ্যে অপর কোন স্থানে আছে কিনা এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় না। এই ডক্ প্রস্তুত করিতে যে কত অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জাহাজ বা নৌকাগুলি সর্ব্বদা এই ডকের মধ্যে নিরাপদে থাকে সত্য, কিন্তু দুর্য্যোগের সময় সামাল সামাল রব উঠিতে থাকে, ঐ সময় কেহই সাহস করিয়া এই ডকের মধ্যে সাগরে প্রবেশ করেন না, কেবল দেশীয় কুলী ও জেলেরা তক্তায় নারিকেল রশি জড়াইয়া এক প্রকার নৌকার মত প্রস্তুত করে, এবং ঐ দুর্য্যোগে তাহার উপর মাল বোঝাই করিয়া কি সুন্দর কৌশলে নির্ভয়ে সেই সকল মাল জাহাজে উঠায়, আবার যখন স্থির ভাব হয়, তখন কেবল বোটের সাহায্যে জাহাজগুলিতে মাল আমদানী বা রপ্তানী করিয়া থাকে, কিন্তু এই ঝড় যখন প্রবল হইতে প্রলয় ভাব ধারণ করে, তখন কেবল দেশীয় কুলীরা ভিন্ন অপর কোন জাতি সাহস করিয়া তীর হইতে জাহাজে যাইতে ইচ্ছা সত্ত্বেও গমন করিতে সাহস করে না।

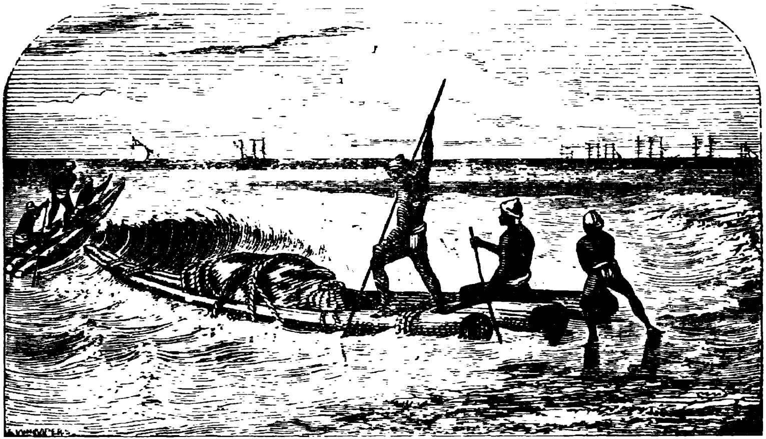
সেই ভীষণ দুর্যোগের সময় অসভ্য দেশীয় কুলীদিগের অসীম সাহস দেখিলে কাহার না প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়, আবার পরক্ষণে যখন গগণনীলিমা মেঘাচ্ছন্ন হইবার পর, মেঘের গভীর গর্জ্জন ও প্রবল ঝড়ের গোঁ গোঁ শব্দ এককালে শ্রুত হইতে থাকিবে, তখন যে কেহ তীরে থাকিবেন, তিনি কিরূপে সুস্থ শরীরে বাটী প্রত্যাগমন করিবেন,

ইহাই ভাবিতে থাকেন। পাঠকবর্গের প্রীতির জন্য মান্দ্রাজি জেলেদের নৌকা ও মাল বোঝাই নৌকার দৃশ্য প্রদত্ত হইল।

এখান হইতে এগমোর যাইবার কালান সাগরের উপরিভাগে এই ডকের একপার্শ্বদেশ দিয়া ট্রেণ খানি গমনাগমন করে। যাত্রীগণ ট্রেণের উপর হইতে ঝড়ের সময় সমুদ্রের এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিতে পাইবেন।

মান্দ্রাজের ব্ল্যাক টাউনে পোকাম্ নামক পল্লীর প্রশস্ত রাস্তার উপর বিস্তর দোকান সুসজ্জিত আছে, আবশ্যক মত এদেশের চিহ্ন স্বরূপ কিছু খরিদ করিবেন। এসপ্লানেড নামক রাস্তায় লাইট হাউস এবং প্রাচীন দুর্গটী প্রতিষ্ঠিত। এই দুইটীর শিল্প চাতুর্য্য দেখিতে ইচ্ছা করিলে সমুদ্রের পূর্ব্বদিকে যে প্রশস্ত রাস্তা পাইবেন, সেই রাস্তার উপর দিয়া যাইতে হইবে। এই ফোর্ট হইতে অর্দ্ধ মাইল গমন করিলেই লাট প্রাসাদ নয়নগোচর হইবে। এই বৃহৎ সুন্দর লাট প্রাসাদের প্রবেশ দ্বারে আরকটের নবাব আজিমজা ও তাঁহার দুই পুত্রের পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে যে সুপ্রশস্ত প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান পাইবেন, তাহারই সাহায্যে উপরে উঠিতে হয়। এখানে নবাব ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের প্রতিমূর্ত্তি ভিন্ন অনেক বড় বড় যশঃভাগ্যবান গুণসম্পন্ন ইংরাজ বীরপুরুষদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। লাট ভবনে অন্যান্য প্রকোষ্ঠে অপূর্ব্ব বহুমূল্য দ্রব্যাবলী ও নানাবিধ মনোমুগ্ধকর চিত্রে সজ্জীকৃত দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। প্রাসাদের বাহিরে, পশ্চিমদিকটী দেখিতে গোলাকার, তাহার চারিদিকেই খাল, ঐ খালের উপর সুন্দর ভাবে টানা সেতু নির্ম্মিত আছে।

স্থানীয় ভদ্রলোক এবং পাণ্ডার গোমস্তা মহাশয়ের সাহায্যে দুদিনের



মান্দ্রাজি জেলেদের ও মাল বোঝাই নৌকার চিত্র।

[৪৬ পৃষ্ঠা।

ধ্যে যাহা কিছু দর্শন করিয়াছি, তন্মধ্যে চিপাক-রাজভবন, মিউজিয়ম, বোটানিকেল গার্ডেন, পিপলস পার্ক ও সেণ্ট্রেল ষ্টেশনের দৃশ্য, এই চয়টী নয়নগোচর করিয়াই সন্তুষ্ট হইলাম। পিপলস পার্কটীতে প্রবেশ করিলে কলিকাতার ইডেন-গার্ডেন বলিয়া ভ্রম হয়, আর সেণ্ট্রেল ষ্টেশনেটীর দৃশ্য পাঠকবর্গকে দেখাইবার জন্য পূর্ব্বে একটী চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

উপরোক্ত দ্রষ্টব্য স্থান ব্যতীত এখানে গুটীকত সুন্দর দেবমন্দিরও দেখিতে পাইবেন। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুযাত্রীরা এই স্থানে উপস্থিত হইলে, ঐ সকল মন্দির দর্শন করিতে অবহেলা করিবেন না।

১। **পার্থ সারথী স্বামীর সুবৃহৎ মন্দির**—এই মন্দিরের সম্মুখে সুগভীর চতুষ্কোণ একটী বাঁধান পুষ্করিণী দেখিতে পাইবেন, যাহার জল অতি নির্ম্মল। দেব মন্দিরটী গ্রেনাইট প্রস্তর দ্বারা সজ্জীকৃত। মন্দির অভ্যন্তরে ভগবানের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি শনিবারে এখানে মহা সমারোহে ভগবানের পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

২। **ঈশ্বর স্বামীর মন্দির**—এই সুন্দর দেবালয়ের সম্মুখেও একটী প্রস্তর বাঁধান পুষ্করিণী দেখিতে পাইবেন। প্রতি আষাঢ় মাসে এখানে এই দেবের মহাসমারোহে রথোৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, ঐ সময় বহু দূরদেশ হইতে এখানে ভক্তগণ একত্রিত হইয়া, এক মহা মেলায় পরিণত করেন, তখন এখানে নানাপ্রকার দোকান সকল অস্থায়ী ভাবে নির্ম্মিত হইয়া কেনা বেচা হইতে থাকে। এতদ্ভিন্ন আরও পথিমধ্যে দুইটী মন্দির দেখিতে পাইবেন।

যে সকল যাত্রী মহাবলীপুরের পবিত্র স্থান দর্শন করিতে অভিলাষ করিবেন, তাঁহাদিগকে এই মান্দ্রাজ সেণ্ট্রল জংশন ষ্টেশন হইতে চঙ্গলপুত নামে যে ষ্টেশন আছে, তথায় অবতরণ করিয়া, শকটযোগে

জীউর পুরীকে যেরূপ মোক্ষদায়ক তীর্থ মনে ভাবি, দাক্ষিণাত্যে এ কাঞ্চীপুর নগরকে স্থানীয় লোকেরা সেইরূপ একটী বিখ্যাত তীর্থস্থা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। আর "নগরেষু কাঞ্চী" ইহা বোধ হ সকলেই শ্রুত আছেন।

সহরটী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে যথা শিব কাঞ্চী ও বিষ্ণু কাঞ্চী। শিব কাঞ্চীতে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠি আছে, তথায় কেবল শৈবসম্প্রদায়গণেরই প্রাধান্য, আর বিষ্ণু কাঞ্চীত বিষ্ণু মন্দির বিরাজিত। এই নিমিত্ত, তথায় কেবল বৈষ্ণবদিগের আধিপত্য। শিব কাঞ্চীতে যে প্রধান দেবতা আছেন, তিনি একা নাথ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, আর বিষ্ণু কাঞ্চীতে যে দেবতা আছে তিনি শ্রীশ্রীবরদানাথ স্বামী নামে খ্যাত হইয়াছেন। বারাণস ভুবনেশ্বর, শ্রীক্ষেত্র, সাগর সঙ্গম, কোকনদার সঙ্গম স্থল ও রামেশ তীর্থ যেরূপ হিন্দুদিগের পবিত্র স্থান, এই কাঞ্চীপুরও সেই সপ্ত স্থানে ন্যায় হিন্দুদিগের একটী পবিত্র পুণ্য ভূমি বলিয়া কথিত আছে। কে যাত্রী এই ষ্টেশন হইতে সহরে যাইবার জন্য পদার্পণ করিলে, কমলদা অলিকুলের সমাগমের ন্যায়, এখানকার পাণ্ডাগণ তীর্থযাত্রী দেখিতে আগমন করেন। কাঞ্চীপুরম্ ষ্টেশন হইতে প্ [illegible] স্থান শিবকাঞ্চী প্র এক মাইল পথ, আবার শিবকাঞ্চী হইতে বিষ্ণু কাঞ্চী দুই ক্রোশ দূ অবস্থিত। এই দুই স্থানের পাণ্ডা স্বতন্ত্র।

কাঞ্চীপুর একটী বিখ্যাত সহর। এখানে দোকান, পসারী, বাজা হাট, স্কুল, কোর্ট সমস্তই আছে, কিন্তু ষ্টেশন হইতে সহরের মধ্যে যা বার সময় গো-যান ব্যতীত অশ্ব-যান দেখিলাম না। এখানকার মি নিসিপালিটীর সুব্যবস্থার গুণে পথগুলি সদাসর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে এ কলিকাতার ন্যায় সর্ব্বস্থানে কলের জল সরবরাহ হয়। পথিমে

রাস্তার দুই পার্শ্বে নারিকেল ও তালবৃক্ষগুলি মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক যেন শিবকাঞ্চীর জাগ্রত দেবতা ভগবান্ একাম্বরনাথকে দর্শন করাইবার জন্য পথ প্রদর্শন করাইতেছে। সহরের মধ্যে যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, সেইদিকেই ঘর, বাড়ী, উদ্যান ও শিবমন্দির সকল দেখিতে পাইবেন, অর্থাৎ সহরটী বসতিপূর্ণ। যতগুলি লোক এখানে বাস করেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ও তন্তুবায়। দেবদর্শন করিবার পূর্ব্বে স্নান করিতে হয়। কলেই হউক, আর পুষ্করিণীতেই হউক, স্নান করিলেই হইল, ইহার নিমিত্ত কোন বাঁধা নিয়ম নাই, তৎপরে সাধ্যমতে পূজার সামগ্রী সংগ্রহের জন্য পাণ্ডার নিকট মূল্য প্রদান করিলে, তিনি আবশ্যক মত সমস্ত দ্রব্য খরিদ করিয়া থাকেন, এবং সঙ্গে করিয়া দেবস্থানে লইয়া যান।

শিবকাঞ্চীর প্রধান লিঙ্গের নাম একাম্রনাথ। লিঙ্গটী মৃত্তিকায় নির্ম্মিত, কারণ ইনি পঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অন্যতম এক মূর্ত্তি। ভগবান এখানে ক্ষিতি মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। একাম্বরনাথের পূজা পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ "তৈর্থাভিষেক।" দেবতার গাত্রে জল দেওয়া নিষেধ, কারণ তাহা হইলে মৃত্তিকা গলিয়া যাইবে। এখানে যথানিয়মে প্রত্যহ বেদ ও স্তোত্র পাঠ হয়, কিন্তু দেবীর মন্দিরে প্রতি শুক্রবারে জলাভিষেক হইয়া থাকে। এই একাম্বরনাথের একটী ভোগ মূর্ত্তি আছে। উৎসবকালে ঐ ভোগ মূর্ত্তিটীকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করাইয়া ফাল্গুণ মাসে মহাসমারোহে পঞ্চ দিবস ব্যাপী উৎসব সম্পন্ন হয়। দশম দিবসে চিরপ্রথানুসারে কামাক্ষী দেবীর ভোগ মূর্ত্তিটী এই একাম্বরনাথের ভোগমূর্ত্তির নিকট স্থাপন করিয়া উৎসবের অবসান হয়। দেবতার পূজার নিমিত্ত স্থানীয় কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে বিস্তর টাকা বরাদ্দ আছে, ঐ টাকা হইতে ভগবানের নির্ব্বিঘ্নে

পূজাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন আরও দেবোত্তর জমী হইতে নানাবিধ আয় আছে। একাম্রনাথের সন্নিকটেই জগজ্জননী দেবী কামাক্ষীর মন্দির বিরাজমান। কামাক্ষী দেবীর দেবালয়টী আয়তনে অন্যূন অর্দ্ধ মাইল, একটী চতুষ্কোণ স্থানের উপর নির্ম্মিত হইয়া প্রকাণ্ড প্রস্তরময় প্রাচীরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রাচীরের চারিধারে চারিটী ফটক শোভা পাইতেছে। ফটক অর্থে আমাদের এদেশে সচরাচর যেরূপ ফটক দেখিতে পাওয়া যায়, সে প্রকার নয়, ইহা ক্রমসূক্ষ্ম সমতলভূমি হইতে অতি উচ্চ চতুষ্কোণাকৃতি নহবত-খানার ন্যায় অট্টালিকা বিশেষ। এইরূপ ফটককে দক্ষিণদেশে গোপুর বলে, বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক তল নীচের তল অপেক্ষা পরিসরে ছোট হইয়া সূক্ষ্মভাব ধারণ করিয়াছে। রাত্রিকালে ঐ গোপুরের উপর এরূপ উজ্জ্বল আলোক প্রদত্ত হয়, যাহাতে সহজে সকলে নির্ব্বিঘ্নে পুরীমধ্যে গমনাগমন করিতে পারেন।

এইরূপে প্রথম গোপুর পার হইলেই ধ্বজস্তম্ভ নামে একটী মণ্ডপে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহার পর সেই সুবৃহৎ প্রাচীর নয়নগোচর হইবে। এই প্রাচীর মধ্যেই কামাক্ষী দেবীর দর্শনপূর্ব্বক জীবন ও নয়ন সার্থক হইবে। ইহাতেই অনুমান করুন, যে প্রাচীরে এত বড় একটী দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে প্রাচীরটী দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে কিরূপ প্রশস্ত স্থানের উপর প্রস্তুত? কামাক্ষী দেবীর মন্দিরের পরই একটী প্রাঙ্গণ, এই প্রাঙ্গণে কতকগুলি সুন্দর কারুকার্য্যে সুশোভিত স্তম্ভোপরি ছাদযুক্ত একটী মণ্ডপ দেখিবেন, তাহার পর আবার যে একটী প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবেন, যথায় একটী সমাধি গৃহ বিরাজিত, যাহার উপরিভাগে গৈরিক বর্ণের একটী পতাকা বায়ুভরে পৎপৎ শব্দে উড্ডীয়মান হইতেছে, সেই গৃহটীতে পরম পুরুষ মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি দর্শন করিবেন।

শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য ২৬৩৬ শকে শুভ শুক্ল পঞ্চমী তিথিতে চিদম্বর গ্রামে পুণ্যবতী বিশিষ্ঠা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশিষ্ঠা দেবী শঙ্করের নিকট শঙ্করসম একটী পুত্র কামনা করিলে ভগবান তাঁহার কামনা পূর্ণ করিয়াছিলেন বলিয়া পুত্রের নাম শঙ্কর হয়। কথিত আছে—ভারতে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, বেদপন্থার বিরোধী বৌদ্ধগণ যখন সমাজে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত করিয়াছিলেন, সামান্য দীন প্রজা হইতে মহামান্য রাজ্যেশ্বর পর্য্যন্ত যখন বৌদ্ধগণের নিকট দীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের উপদেশ মত বিলাসে মগ্ন হইয়াছিলেন; বৌদ্ধগণের কুহকে পতিত হইয়া বার-নারীগণ ব্রাহ্মণদিগের পরিগৃহীতা হইয়া জনসমাজে শ্রদ্ধার পাত্রী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ জাতিভেদ গ্রাহ্য করিতেন না। ব্রাহ্মণ-গণ যে শূদ্রদিগকে শাস্ত্রপাঠে অনধিকারী জ্ঞান করিতেন, বৌদ্ধদিগের মতে সেই শূদ্রগণ বিনা বাধায় অবলীলাক্রমে ঐ পবিত্র ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সমাজে জাতি ও মান রক্ষার্থে মহা হুলস্থুল উপস্থিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের দেহ, ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সনাতন মূর্ত্তি, ধর্ম্মের জন্য উৎপন্ন ব্রাহ্মণ, মোক্ষলাভের উপযুক্ত পাত্র। ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়েন, যেহেতু ধর্ম্ম সকলের রক্ষার জন্যই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। এই শঙ্কটময় সন্ধিক্ষেত্রে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ বদ্ধপরিকর হইয়া প্রাণপণে বিধর্ম্মী বৌদ্ধমত খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু হায়! যেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের গগণ-স্পর্শী বিজয়নিশান সগর্ব্বে উড্ডিয়মান ছিল, তাঁহাদের প্রবল প্রতাপের নিকট এই সকল ব্রাহ্মণগণের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। তখন তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া জাতিকুল রক্ষার্থে হতাশপ্রাণে পতিতপাবন

ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান শঙ্কর এই সকল ব্রাহ্মণদিগের কাতর প্রার্থনায় তাঁহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া, কিছু কালের জন্য আপন কায়া হইতে এই মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্যকে ধর্ম্ম রক্ষার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মহাপুরুষদিগের বাল্যলীলা প্রায়ই অলৌকিক ঘটনাময়ী হইয়া থাকে, সুতরাং যে শঙ্করের দেব অংশে জন্ম, তখন তাঁহারই বা না হইবে কেন? এই শঙ্কর শৈশবকালেই অলোক সামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। এক বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তাঁহার বর্ণপরিচয় বোধ হয়, দ্বিতীয় বৎসরে মাতার নিকট উপ-দেশ পাইয়া বেদপাঠ করিতে অভিলাষ করেন, তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিয়াই তিনি পিতার নিকট শাস্ত্রপাঠ আরম্ভ করিয়া জনসমাজে অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করেন। যে সময় এই শিশুর জন্ম হয়, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে তাঁহার পিতা জ্ঞাতিদিগের সহিত গৃহবিচ্ছেদের জন্য বাধ্য হইয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। এদিকে দেব অংশে পুত্র শঙ্করের জন্ম সংবাদ স্বপ্নে অবগত হইয়া তিনি হৃষ্টচিত্তে আপন আলয়ে উপস্থিত হইলেন এবং এই সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া আহ্লাদিত হইলেন; কিন্তু তাঁহাকে এই পুত্রের নিমিত্ত জ্ঞাতি কুটুম্ব-দিগের নিকট নানাপ্রকার তিরস্কার ও কুকথা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি এই নবশিশুর চাঁদ মুখ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সকল অপবাদই অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছিলেন। কালের গতি কে রোধ করিতে পারে, এই তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালেই শিশু শঙ্করকে পিতৃহীন হইতে হয়। তখন শঙ্করের জ্ঞাতি কুটুম্বগণ সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া এবং তাঁহার বিদ্যা স্থানে ব্যাঘাত ঘটাইবার নিমিত্ত সকলে পরামর্শ করিয়া প্রচার করি-লেন যে, এই পুত্র জারজাতক। এই মহা ষড়যন্ত্রের সাহায্যে কেহই

জ্ঞাতি ভয়ে শঙ্করের উপনয়ন করিতে সাহস করিলেন না, কেন না উপনয়ন ব্যতীত কেহ শাস্ত্র অধ্যয়নে অধিকারী হইতে পারে না। এই-রূপে উপনয়ন অভাবে তাঁহার বেদাধ্যয়ন হইতেছে না দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইলেন ; শঙ্করের ম্লান মুখ দেখিয়া তাঁহার মাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মায়াময়ের মায়া নরে কিরূপে ভেদ করিবে। একদা এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পথিক এই অলোকসামান্য শিশুর শ্রীমুখ হইতে সহসা জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া চমৎকৃতচিত্তে তাঁহার বিষয় সমস্ত অবগত হইলেন, তথাপি তিনি স্বেচ্ছায় আপন মান-সম্ভ্রম জলাঞ্জলি দিয়া শঙ্করের শুভ উপনয়ন-কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া তাঁহার বেদাধ্যয়নের পথ পরিষ্কার করিলেন। এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যে গুরুর কৃপায় শঙ্কর বেদ ও শাস্ত্রের রহস্য ভেদ করিয়া ব্রহ্মদ্বৈত মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন এবং সন্ন্যাস ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিলেন, তখন মাতৃপদরেণু গ্রহণ করতঃ মায়াবলে তাঁহাকে স্বীকৃত করাইয়া এবং শিক্ষা গুরুর অনুমতি লইয়া সর্ব্বপ্রথমেই তিনি কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

একদা শঙ্কর এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে এক বীভৎস ঘৃণিত ছদ্মবেশধারী চণ্ডাল মূর্ত্তি, স্বয়ং শঙ্করের নিকট বেদ নির্ণীত তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষালাভ করিয়া, ভাবমুগ্ধ হৃদয়ে আপনার পূর্ব্ব উপার্জ্জিত বিদ্যাভিমান, জ্ঞান-গরিমা, ধর্ম্মাহঙ্কার সমস্তই জলাঞ্জলি দিলেন ; কারণ ঐ চণ্ডালবেশধারী লোক পাবনী "শঙ্কর" যখন আপন স্বরূপ মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক এই বালক শঙ্করকে আলিঙ্গন করেন, তখন ঐ পবিত্র দেহ স্পর্শে তিনি বেদ ও শাস্ত্রের সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া সেই দেশব্যাপী বৌদ্ধগণের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে শঙ্করের অদ্ভুত পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া

কি রাজা কি প্রজা সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভগবান শঙ্করের আশীর্ব্বাদে সেই বালক শঙ্করের অসাধারণ ক্ষমতার নিকট সকলকেই তর্ক যুদ্ধে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। এইরূপে তিনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া শঙ্করাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ হন। শঙ্করাচার্য্য আপন প্রতিভাবলে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ মূর্ত্তিকে যোগমগ্ন শিব মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্যকে কেহ আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিলে, তিনি উপদেশ দিতেন, "আমি ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল প্রান্তরে পাক করিয়া জীবন রক্ষা করি, রাত্রিকালে জগৎপাতার সৃষ্টি মধ্যে বৃক্ষমূলে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাই, ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট, যদি কোন বিপন্ন তোমাদের দ্বারস্থ হয়, তাহাকে তোমরা আস্তা দিও"। কি স্বার্থত্যাগী নির্ম্মল উদারচরিত্র! শঙ্করাচার্য্য ভারতের চারি ধামে চারিটী মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপন কীর্ত্তিস্তম্ভ রক্ষিত করিয়াছিলেন। তিনি যৌবন বয়সে পদার্পণ করিয়া একবার চিন্তা করিলেন, "আমি যে কার্য্যের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি, উহা এক্ষণে সম্পূর্ণ হইয়াছে।" তখন সেই মাহাত্ম্য তনুত্যাগ করিবার পূর্ব্বে এই স্থানে ভগবান একাম্বরনাথের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহারই শ্রীচরণে বিলীন হইলেন। সেই সর্ব্বসুলক্ষণ, সর্ব্বগুণের আধার আচার্য্য দেবের পবিত্র দেহ এবং তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিকলাপ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য স্থানীয় পাণ্ডারা সকলে যুক্তি করিয়া কামাক্ষ্যাদেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে তাঁহার সমাধি প্রদান করেন এবং ঐ সমাধি স্থানের উপর একটী গৃহ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে শঙ্করাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

মূর্ত্তিটী ঠিক যেন জীবিতাবস্থায় সন্ন্যাসীবেশে ছয়টী শিষ্য সমভিব্যাহারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এই মূর্ত্তি দর্শন করিলে হৃদয়ে এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইয়া থাকে। এইবার মূল

মন্দির মধ্যে ভগবান একাম্বরনাথের অর্চ্চনা করিয়া জীবন সার্থক করিবেন।

এই মূল একাম্বরনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটী প্রাচীন অদ্ভূত আম্রবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট অবগত হইলাম যে, এই বৃক্ষের চারিধারে যে চারিটী শাখা আছে, তাহার এক একটী শাখায় এক এক প্রকার আস্বাদের আম্র হইয়া থাকে; অর্থাৎ বৃক্ষটী কটু, তিক্ত, অম্ল ও মিষ্ট, এই চারি প্রকার আস্বাদের ফল প্রদান করে। এইরূপ আশ্চর্য্য বৃক্ষ ভারতবর্ষের মধ্যে অপর কোন স্থানে আছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে প্রত্যহ এই বৃক্ষ হইতে একটী করিয়া আম্র পাকিত এবং ঐ আম্রে দেবতার ভোগ হইত। এই নিমিত্ত এই দেবতার অপর একটী নাম "একাম্রনাথ" হইয়াছে। কাল প্রভাবে এখন আর প্রত্যহ আম্র হয় না, কিন্তু আম্রের আস্বাদ চারি প্রকার বর্ত্তমান থাকিয়া দেব মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

কাঞ্চীপুর সহরে এক শিব কাঞ্চীর মূল মন্দির ব্যতীত কৈলাসনাথ, বৈকুণ্ঠ নাথ ও পেরুমল বিষ্ণুমন্দির বিরাজমান আছে। এই সকল মন্দির মধ্যে দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবেন এবং শেষ, এখান হইতে বিষ্ণু কাঞ্চীতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে এখানকার উৎকৃষ্ট সুন্দর রেশমী কাপড়ের উপর জরির কাজ করা রুমাল, চিহ্ন স্বরূপ কিছু সংগ্রহ করিবেন। এখান হইতে দুই ক্রোশ দূরে গো-শকটে যাত্রা করিয়া যে সহর পাইবেন তাহারই নাম বিষ্ণুকাঞ্চী।

বিষ্ণুকাঞ্চীর দেবতা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। মন্দিরটী শিবকাঞ্চীর মন্দির অপেক্ষা সর্ব্বদিকে এবং সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। এই মন্দিরের তোরণ দ্বার পার হইলেই প্রাঙ্গণের বামদিকে শত স্তম্ভযুক্ত একটী সুশোভিত মণ্ডপ দেখিতে পাইবেন, সেই মণ্ডপের পূর্ব্ব ধারে "কোটি তীর্থ"

নামে একটী দীঘি আছে। সর্ব্বপ্রথমে ঐ দীঘিতে স্নান করিয়া শুদ্ধ কলেবরে মূল মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের প্রথম মহল পার হইয়া দ্বিতীয় মহলে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবন সফল করিবেন। এই ভগবান নৃসিংহদেবের মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে শ্রীশ্রীবরদারাজ স্বামীর ভোগ মূর্ত্তি ও অপরাপর কতকগুলি দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন পাইবেন, তৎপরে স্বীয় পাণ্ডার উপদেশ মত কতকগুলি সোপান অতিক্রম করিয়া দ্বিতলের হলে উপস্থিত হইয়া, সেই হলের সম্মুখেই মূলমন্দির মধ্যে ভগবান বিষ্ণু কাঞ্চীপুরাধীশ্বর শ্রীশ্রীবরদারাজ স্বামীর শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিলাম। মানব জীবন ধারণ পূর্ব্বক যিনি এই মুনিজন-মনোলোভা দিব্য বিগ্রহ মূর্ত্তি দর্শন না করিয়াছেন, তাঁহার জীবনই বৃথা। এই শ্রীমূর্ত্তিটী দর্শন করিলে নয়ন আর ফিরাইতে ইচ্ছা হইবে না, স্থান ত্যাগ করিতে বাসনা হইবে না, কেবলই মনে হইবে যত পারি, প্রাণ ভরিয়া ভগবানের শ্রীচরণ দর্শন করি। আহা! কি সুন্দর মূর্ত্তি! কি পবিত্র ভাব! যাহা দর্শন করিয়াছি, ইহজন্মে তাহা কখন ভুলিবার নয়। পূর্ণ কলেবর শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ, শ্রীশ্রীবরদারাজ স্বামীকে সহসা দর্শন করিলে মনে হয়, তাঁহার চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দিব্যমণিময় কিরীট ধারণ এবং কণ্ঠদেশ হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত নানাবিধ বহু মূল্য অলঙ্কারে ভূষিত শ্রীমূর্ত্তি, প্রফুল্ল-মনে বৈকুণ্ঠ হইতে এই স্থানে রাজবেশে হাস্য করিতে করিতে যেন ভক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিবার জন্যই অবতীর্ণ হইলেন, প্রথম দর্শনে এইরূপই মনে হইবে। এতাবৎকাল এই অপরিচিত স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া যে সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলাম, আজ সৌভাগ্যক্রমে পিতা-মাতা ও গুরুজনবর্গের আশীর্ব্বাদে এই অপূর্ব্ব পবিত্র শ্রীমূর্ত্তির শ্রীচরণ দর্শনলাভ করিয়া পূর্ব্বাস্রিত যাবতীয় ক্লেশভোগের অবসান করি-

। এই দেবের আরতির সময় যখন ব্রাহ্মণগণ সমস্বরে সুর ধরিয়া দমন্ত্র পাঠ করিয়া ভগবানের মাহাত্ম্য প্রচার করেন, তখন সর্ব্বশরীর মাঞ্চিত হইয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইতে থাকে। পূর্ব্বে কাশীধামে শ্রীবিশ্বেশ্বরের আরতির সময় যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণের স্বরিৎসার দমন্ত্র পাঠ শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়াছিলাম, ইহা তদপেক্ষাও মধুর। পূর্ব্বে যখন আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে দক্ষিণ দেশের র্থদর্শন করিবার জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম, তখন একার স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এদেশে এরূপ নয়নানন্দদায়ক পবিত্র প্রেমপূর্ণ শ্রীমূর্ত্তির দর্শনলাভ করিব। যাহা হউক, মনের সাধে প্রাণ ভরিয়া দেবমূর্ত্তি দর্শনপূর্ব্বক যখন শ্রীমন্দিরটী প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম, তখন স্বামীজীর শ্রীপদপ্রান্তে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করিলাম যে,"ভগবান্! আপনার দর্শনলাভে অদ্য যেরূপ সন্তুষ্ট হইলাম, অন্তিম সময়ে এইরূপ হাস্যপূর্ণ রাজবেশে একবার অধীনকে দর্শনদানে জীবনের সকল সাধ, সকল বাসনা পূর্ণ করিয়া চরিতার্থ করিবেন, প্রভু!" এইরূপ মানতসহকারে এখান হইতে দেবী দর্শন করিবার মানসে ইহার নিম্নতলস্থ মহলে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর শ্রীচরণ বন্দনা করিতে গমন করিলাম।

প্রতি শুক্রবারে এই স্থানে ভগবান শ্রীশ্রীবরদারাজ স্বামীর অভিষেক হইয়া থাকে। ঐ দিবস বহু দূরদেশ হইতে ভক্ত হিন্দুগণ একত্রিত হইয়া অভিষেক উৎসব দর্শন করিয়া জীবন সার্থক বোধ করেন। স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, যিনি ভক্তিপূর্ব্বক শুক্রবারে এই ভগবানের অভিষেক দর্শন করেন, অন্তিমকালে স্বামীজীর কৃপায় তাহার পরমগতি লাভ হয়। এই উৎসবের সময় প্রথমে দেবতার আভরণ খুলিয়া তাঁহাকে তৈল মর্দ্দন করান হয়, তৎপরে তীর্থ বারিতে স্নান, তাহার পর বস্ত্র পরিধানসহকারে পুষ্পমাল্য দ্বারা সজ্জিত করাইয়া

বহু মূল্য অলঙ্কারগুলিতে ভূষিতপূর্ব্বক ভগবানের কর্পূরারতি হয়। ে ষোড়শোপাচারে পূজা হয়, পূজান্তে বেদমন্ত্র পাঠ করিতে করি ভগবানের মহিমা প্রচার করাকে অভিষেক বলে। অবগত হইল স্বামীজীউর শ্রীঅঙ্গে যে সমস্ত বহু মূল্য অলঙ্কার আছে, সর্ব্বশুদ্ধ সকল অলঙ্কারের মূল্য ১০৭০০০৲ টাকা নিরূপিত হইয়াছে। মাননী লর্ড ক্লাইভ ভারতবর্ষ জয়পূর্ব্বক যখন এই দেবালয়ের সৌন্দর্য্য দর্শ করিতে আসেন, তখন হিন্দুদিগের এই জাগ্রত দেবতার ক্ষমতার বিষ অবগত হইয়া তিনি স্বেচ্ছায় ৩৬০০৲ টাকা মূল্যের কণ্ঠাভরণখানি উপ হারস্বরূপ প্রদানপূর্ব্বক হিন্দুমাত্রেরই চিত্ত আকর্ষণ করেন। মহামা লর্ড ক্লাইভ বাহাদুরের সহৃদয়তা প্রকাশ করিবার জন্য অদ্যাপিও উহ ভগবানের কণ্ঠদেশে শোভা পাইতেছে, আর স্থানীয় জনৈক ব্রাহ্ম ২৫০০০৲ টাকা ব্যয়সহকারে তাঁহার মনের মত হীরা, মুক্তা, চুনি ও পান্না স্বর্ণের উপর সুসজ্জিত করিয়া একখানি কিরীট প্রস্তুত করান এবং তাঁহার ঐ বহু মূল্য কিরীটটী ভগবানের শ্রীচরণে উৎসর্গপূর্ব্বক দান করিয়া জীবনের সকল সাধ পূরণ করিয়াছেন।

প্রতি বৈশাখ মাসে শ্রীশ্রীবরদারাজ স্বামীর দশ দিন ব্যাপী মহা সমারোহে প্রধান উৎসব সম্পন্ন হয়, উৎসবকালীন প্রতি রোজ স্বামীজীকে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন বাহনে আরোহণ করাইয়া শিবকাঞ্চী সন্নিধানে শোভা যাত্রা করান হয়, ঐ শোভা যাত্রার সময় স্থানীয় অপরাপর দেবগণও তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলে সমস্ত পথটী এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে। এই দেবের পূজার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট হইতে বাৎসরিক ১০০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত আছে, এতদ্ভিন্ন যে আয়কর দেবোত্তর জমা আছে, তাহা হইতেও অনেক টাকা সংগ্রহ হয়, এইরূপ প্রকারে নির্ব্বিঘ্নে দেবতার পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সহরের মধ্যে ছোট বড় সাতটী বারের নামে এখানে সাতটী তীর্থ বিরাজ করিতেছে। যে বারের নামে যে তীর্থ, সেই বারে তাহাতে স্নান করিলে যে ফললাভ হয়, সংক্ষেপে উহা প্রকাশিত হইল ;—

১। রবিতীর্থ—এই তীর্থে রবিবারে স্নান করিলে সূর্য্যদেবের কৃপায় দেহকাঞ্চন বর্ণ হয়।

২। সোমতীর্থ—এই তীর্থে সোমবারে স্নান করিলে চন্দ্রদেবের কৃপায় ইন্দ্রত্বলাভ হয়, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারে সুখভোগ করিতে পারা যায়।

৩। মঙ্গলতীর্থ—এই তীর্থে মঙ্গলবারে স্নান করিলে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

৪। বুধতীর্থ—এই তীর্থে বুধবারে স্নান করিলে মনোবেদনা দূর হয়।

৫। বৃহস্পতিতীর্থ—গুরুবারে ইহাতে স্নান করিলে গুরুর কৃপায় মোক্ষ লাভ হয়।

৬। শুক্রতীর্থ—শুক্রবারে এই তীর্থে শ্রদ্ধাসহকারে স্নান করিলে শুক্রদেবের কৃপায় সৎজ্ঞানোদয় হয়।

৭। শনিতীর্থ—শনিবারে শুদ্ধচিত্তে এই তীর্থে স্নান করিলে শনিদেবের কৃপায় কলির সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

এইরূপে এখানকার তীর্থাদি দর্শন ও সেবা করিয়া বালাজী দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

বালাজী

মান্দ্রাজ হইতে যে ব্রাঞ্চ লাইনটী বরাবর দক্ষিণে টিউটিকোরি পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে, উহার পরিমাণ ই, আই রেলের লাইন অপেক্ষা অনেক ছোট। লাইনটী "সাউথ্ ইণ্ডিয়ান রেল" নামে প্রসিদ্ধ আছে। এখান হইতে ষ্টীমারযোগে সিংহল যাওয়া যায়। সিংহল সহরটী দেখিতে অতিশয় সুন্দর। উত্তর সিংহলে লঙ্কেশ্বর রাজা দশাননের পুরী ছিল, এই নিমিত্ত এই স্থানের অপর একটী নাম স্বর্ণময়ী লঙ্কাপুরী। এই সাউথ ইণ্ডিয়ান রেল লাইনের গাড়ীর কামরাগুলির এক পার্শ্বে বারাণ্ডা আছে, একটীর বাম পার্শ্বে অপরটীর দক্ষিণ পার্শ্বে, এই বারাণ্ডা দিয়া গাড়ীখানির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনায়াসে গমনাগমন করা যায়। ট্রেণেই হোটেল, তাহাতেই সাহেবদিগের জন্য মাংসাদি রন্ধন হয়; হিন্দু যাত্রীদিগের ব্যবহারোপযোগী মিষ্টান্ন প্রভৃতিও এই ট্রেণে পাইবার বন্দোবস্ত দেখিলাম। যাঁহারা বালাজী দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা কাঞ্চীপুর হইতে তিরুপতি ওয়েষ্ট নামে যে ষ্টেশন আছে, তথায় অবতরণ করিবেন। এই ষ্টেশন হইতে দেবালয়টী অন্যূন এক মাইল দূরে অবস্থিত। তাঁহার পর আর এক মাইল পথ পদব্রজে উচ্চ পর্ব্বতে উঠিতে হয়। এইরূপে ছয়টী পর্ব্বতশৃঙ্গ পার হইবার পর শেষ শ্রীবঙ্কট-রমণাচলম্ নামে যে সপ্তম শৃঙ্গ দেখিতে পাইবেন, তথায় মূলমন্দিরটী বিরাজ করিতেছে।

এই উচ্চ পর্ব্বতে উঠিবার চারিটী প্রবেশ পথ আছে, সেই এক একটী পথ এক-একটী পৃথক্ নাম ধারণ করিয়াছে, যথা ;—নিম্ন তিরুপতি, চন্দ্রগিরি, নাগাপট্টম ও বালপট্ট। এই চারিটী পথের মধ্যে নি তিরুপতি নামে যে পথ আছে, সেই দিক্ দিয়া উপরে উঠিবার সুবিধ

সুতরাং এই পথেই যাত্রীদিগের অধিক জনতা হইয়া থাকে। পাহাড়ের উপরিভাগে যে সাতটী শৃঙ্গ আছে, সেই এক-একটী শৃঙ্গকে এক-একটী পুণ্য তীর্থস্থান বলিয়া জানিবেন। এই পর্ব্বতের উপরিভাগে যে সাতটী শৃঙ্গ দর্শন পাইবেন, যথানুক্রমে সে সকল নাম প্রকাশিত হইল ;—

১। স্বামীতীর্থ, ২। আকাশগঙ্গা, ৩। পাপ-নাশিনী, ৪। পাণ্ডবতীর্থ, ৫। তুম্বীরকোণা, ৬। কুমারবারিকা, ৭। গোগর্ভতীর্থ।

বালাজীর মন্দির দক্ষিণ ভারতমধ্যে একটী বিখ্যাত ধনশালী দেবালয় এবং বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান পবিত্র তীর্থ, আমরা যে সময় কার্ত্তিক মাসে গিয়াছিলাম, সে সময় এরূপ বিখ্যাত তীর্থে কোন বাঙ্গালী জাতি ভাইকে না দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম।

বালাজীউকে বহু পুরাকাল হইতে হিন্দুরা ভক্তি করিয়া আসিতেছেন, এমন কি ত্রেতাযুগে যখন পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র বন গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি সীতাদেবী ও অনুজ লক্ষ্মণসহ এই স্থানে কপিলা নামক পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া বালাজীর পবিত্র মূর্ত্তি পূজা করিয়া মানবগণকে সস্ত্রীক পূজা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁহারা স্নান করিয়া পর্ব্বতের যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, অদ্যাপিও সেই স্থানটী স্বামী তীর্থ নামে খ্যাত রহিয়াছে। দ্বাপরযুগে পাণ্ডবগণও বনবাসকালে এই পর্ব্বতোপরি এক বৎসরকাল বাস করিয়া মনের সাধে ভগবান বালাজীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন। মোহন্তর নিকট উপদেশ পাইলাম, পাণ্ডবগণ পর্ব্বতের যে শৃঙ্গে বাস করিয়াছিলেন, সেই অংশটী পাণ্ডব-শৃঙ্গ নামে খ্যাত হইয়াছে। এই প্রাচীন ঐশ্বর্য্যশালী দেবালয়ের একমাত্র "হর্ত্তা-কর্ত্তা" এই মোহন্ত, তাঁহার ইচ্ছায় এই দেবালয়ের যাবতীয় কর্ম্মই

পরিচালনা হয়। বলাবাহুল্য—তাঁহার করুণা ভিন্ন এখানে কেহ সুখে বাস করিতে পারেন না। ইক্ষাকু হইতে সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের নাম দৃষ্টে রামায়ণ পাঠে জানিতে পারা যায় যে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র এই ইক্ষাকুর অধস্তন তেষট্টি পুরুষ। প্রতি শত বর্ষাকাল চারি পুরুষের রাজ্যভোগ ধরিলে ইক্ষাকু হইতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম সময় পর্য্যন্ত ১৫৭৫ বৎসর গত হয়। সেই রামচন্দ্রের অধস্তন একত্রিশ পুরুষ মহারাজ "বৃহদ্বল" কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অভিমন্যু কর্ত্তৃক হত হন। এই একত্রিশ পুরুষের জীবনকাল ৭৭৫ বৎসরব্যাপী ধরিলে জানিতে পারা যায় যে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ৭৭৫ বৎসর পরে কুরুকুলরাজ দুর্য্যোধনের অত্যাচারের জন্যই পাণ্ডবগণকে বনবাস করিতে হইয়াছিল। অতএব এক্ষণে অনুমান করুন,এই বালাজীউর পবিত্র মূর্ত্তি কত প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভক্তগণ এই অত্যুচ্চ পর্ব্বতের উপর উঠিবার পূর্ব্বে চিরপ্রথানুসারে সাধ্যমতে স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্ম্মিত বঙ্কটেশ নামক এক প্রকার কাঁটা কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়া পর্ব্বতে উঠিতে থাকেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বামীতীর্থে স্নান করিবার সময় দেবমহিমা প্রকাশের জন্য সেই কাঁটা আপনা-আপনি খসিয়া পড়ে, ইহাই এখানকার মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই উচ্চ পর্ব্বতের অলিপিলি নামক স্থান পর্য্যন্ত সকলে অবাধে গমনাগমন করিতে পান, তৎপরে মোহন্তের হুকুম অনুসারে এক হিন্দু ব্যতীত অপর কোন জাতি আর অগ্রসর হইতে পান না। সেই হুকুম তামিল করিবার জন্য পাহারার সুব্যবস্থা আছে। অলিপিলি নামক স্থান হইতেই উচ্চ পর্ব্বতে উঠিবার সোপান আরম্ভ হইয়াছে। যাত্রীদিগের মধ্যে অধিকাংশই পদব্রজে প্রবেশ করেন, কিন্তু যাঁহারা অত্যন্ত অক্ষম বা উপরে উঠিবার ক্ষমতাহীন, তাঁহাদিগকে

মোহন্তের নিকট ছাড়পত্র লইয়া ডুলিতে চাপিয়া দেবদর্শন করিতে হয়। এই ছাড়পত্র লইবার জন্য মোহন্তের গদিতে কিছু দক্ষিণাও জমা দিতে হয়। সমতলভূমি হইতে বালাজীর মূলমন্দিরের প্রবেশ পথ পর্য্যন্ত সহস্র ফিট উচ্চ নিরূপিত আছে। এই অত্যুচ্চ দেবালয়ে উঠিবার সোপানশ্রেণীর আশেপাশে বিশ্রাম মণ্ডপ আছে। এই দেবের এমনি মাহাত্ম্য যে, গালিগোপুর নামে যে তোরণদ্বার আছে, ঐ গোপুরের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র স্থান মাহাত্ম্যগুণে কোথা হইতে আনন্দ উপস্থিত হইয়া ভগবচ্চরণে মতি রাখিতে বাসনা জাগাইয়া তুলে। গালিগোপুরের পশ্চাদ্ভাগে বৈকুণ্ঠ নামক একটী পুণ্যতীর্থ স্থান আছে, তথায় শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি দর্শন পাইবেন, যাত্রীগণ উপরে উঠিতে যতই ক্লান্ত হউক না কেন, এই রামকৃষ্ণের আশ্রমে যখন আশ্রয় লইবেন, তখন সকল দুঃখের অবসান হইবে।

ভগবান ভক্তের দুঃখ দূর করিবার জন্যই এই মধ্যপথে অবস্থান করিতেছেন, এই কারণ এই স্থানে একটী নির্দ্দিষ্ট বিশ্রামাগারও আছে। এই যাত্রীক্লেশ বিনাশকারী মূর্ত্তিদ্বয়ের সন্নিকটে বৈকুণ্ঠ গুহা নামে আবার একটী গুহা দেখিতে পাইবেন, ইহা নামে গুহা, কিন্তু তিরুমলগিরিস্থ একটী পল্লী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কথিত আছে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণদেবসহ বনবাসকালে এই স্থানে স্নান করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম স্বামীতীর্থ হইয়াছে। স্বামীতীর্থে যাত্রীদিগের বাস করিবার অনেকগুলি উপযুক্ত ঘর আছে, ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তথায় বিশ্রাম করিতে পারেন, মূলমন্দিরের সম্মুখে যে রাস্তা আছে, তথায় নানাবিধ পিত্তলের ও আহারীয় দ্রব্যের দোকান দেখিতে পাইবেন, আর এই স্থানেই বঙ্কটেশ স্বামীর মূর্ত্তি খরিদ করিতে পাওয়া যায়। তিরুমল পর্ব্বতের উপরিভাগে ভগবান

গোবিন্দ স্বামী (বঙ্কটেশ স্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদর, ইনি বিষ্ণু মূর্ত্তিতে অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় বিরাজ করিতেছেন) ও রাম স্বামীর উচ্চ মন্দিরের শিল্প নৈপুণ্য দর্শন করিলে আনন্দে অধীর হইয়া শিল্পকারীর প্রশংসা করিতে হয়। এইরূপে এখানকার দেবদেবী ও পর্ব্বতমালার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মনের সুখে আপন বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। পর দিবস ভুবন বিখ্যাত জলকান্তীশ্বর মহাদেবের দর্শনের আশায় "ভেলোর" যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম।



জলকান্তীশ্বর

তিরুপতি ষ্টেশন হইতে "জলকান্তীশ্বর" মহাদেবকে দর্শন করিতে হইলে এই লাইনের উপর দিয়া ভেলোর নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। ভেলোর একটী সমৃদ্ধিশালী সহর। এখানে বহু লোকের বসতি আছে, সহরের মধ্যে যে একটী দুর্গ আছে, সেই দুর্গের মধ্যে ভগবান জলকান্তীশ্বরের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের শিল্প-চাতুর্য্য এবং তাহার প্রসাধন কৌশল দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহার চতুর্দ্দিকে দুর্গের নিয়মানুসারে গড়খাই আছে, সেই গড়খাই পানার নামক প্রধান নদীর সহিত যোগ থাকায় প্রায়ই জোয়ারের পূর্ণ অবস্থায় মন্দির প্রাঙ্গণে জল প্রবেশ করে। ভেলোরের জলবায়ু ভাল, সুতরাং স্থানটী স্বাস্থ্যকর। এইরূপ সংবাদ পাইয়া দুইদিন বিশ্রামের জন্য ও অদ্ভুত কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দিরের শোভা দর্শনের নিমিত্ত এখানে যাত্রা করিয়াছিলাম। কেননা পূর্ব্ব হইতেই সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, এ মন্দিরে এক্ষণে কোন দেবতার দর্শন পাইব না। এই অত্যাশ্চর্য্য সুন্দর মন্দিরটী বোম্মিবেড্ডী নামক একজন স্থানীয় গোয়ালা ভগবানের আদেশে সন্ন্যাসী ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবান মহেশ্বরেরই অনুকম্পায় নির্ম্মিত করিয়াছিলেন।

মন্দির সম্বন্ধে কিম্বদন্তী এইরূপ ;—

বোম্মিবেড্ডী একজন দক্ষিণদেশবাসী, জনসমাজে তিনি গোয়াল নামে পরিচিত ছিলেন। তাহার যতগুলি গাভী ছিল, তন্মধ্যে একটী গাভীর পাঁচটী বাঁট ছিল। এই গাভীটী প্রত্যহ প্রাতে একই সময়ে স্থানীয় এক দ্বীপোপরি একটী বালির ঢিপির উপর গমন করিয়া প্রসন্ন মনে একটী পঞ্চমুখ বিশিষ্ট সর্পকে দুগ্ধ পান করাইত, এদিকে গাভীটী বাটী প্রত্যাগমন করিয়া আর সামান্যমাত্র দুগ্ধ দিত না। এরূপ হৃষ্ট-পুষ্ট নিরোগী গাভীর দুগ্ধ না হইবার কারণ কি, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ঘোষজা স্বয়ং ইহার তত্ত্ব সংগ্রহে মনস্থ করিলেন। পর দিবস প্রত্যুষে গাভীটী যখন গোয়াল ঘর হইতে বহির্গত হইল, বোম্মিবেড্ডীও তাহার পশ্চাদ্গামী হইলেন, এইরূপে তিনি স্বচক্ষে এই অদ্ভুত ঘটনা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, তখন আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল এই বিষয়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অনশনে, হতাশপ্রাণে, জীবনের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া সেই জনশূন্য বালির স্তূপোপরি শয়ন করিয়া রহিলেন। অনন্তর সেই রাত্রিতে অন্তর্যামী ভগবান তাহার সরলা ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া বোম্মিবেড্ডীকে দর্শনদানে আদেশ করিলেন, "হে ভক্ত বোম্মি! তোমার পবিত্র ভক্তিডোরে আমি বাঁধা পড়িয়াছি, তুমি নিকটস্থ পাহাড়ের উপর অপর একটী বালির স্তূপ দেখিতে পাইবে, তথায় আমার একটী জ্যোতিঃ লিঙ্গ আছে, আমার উপদেশমত তুমি একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে সেই লিঙ্গটী প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক দেবতার নাম জলকান্তীশ্বর প্রচার করাও, কারণ বহু দিবস হইতে এই স্তূপের মধ্যে সলিলোপরি আমি অবস্থান করিতেছি। তখন ঘোষজা

ভগবানের এইরূপ আদেশপ্রাপ্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আপন অবস্থার বিষয় চিন্তা করিয়া নিবেদন করিলেন, "দয়াময়! আপনি অন্তর্য্যামী! আমি দিন আনি, দিন খাই, একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া এই ভগবানরূপী জ্যোতিঃ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করি, এরূপ সম্পত্তি আমার কিছুই যে নাই, প্রভো! অতএব যেরূপ প্রকারে অধীন আপনার আদেশপালন করিতে পারে, তাহার উপায় বলিয়া চরিতার্থ করুন, করুণাময়!"

মহেশ্বর ভক্তের কাতর প্রার্থনায় কৃপাপূর্ব্বক এই আদেশ করিলেন যে, "বোম্মিবেড্ডী! তোমার অবস্থা অবগত হইয়াও যখন আমি তোমায় এরূপ আদেশ করিয়াছি, তখন তোমার চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই, আমার উপদেশমত তুমি যে স্থানে জ্যোতিঃ লিঙ্গ দেখিবে, তাহার নিম্নভাগ খনন করিলে প্রচুর গুপ্তধন প্রাপ্ত হইবে, ঐ ধনের সাহায্যে তুমি অক্লেশে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া লিঙ্গটী প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবে।" এইরূপ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক তিনি অন্তর্হিত হইলেন। তখন বোম্মিবেড্ডী প্রসন্নমনে পর্ব্বতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেবমায়া প্রভাবে এক স্থানে এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ দর্শনপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইবামাত্র একটী লিঙ্গ দর্শন পাইলেন, এবং আনন্দে অধীর হইলেন। তখন পূর্ব্ব উপদেশ মত যে স্থানে লিঙ্গটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার নিম্নদেশ খনন করিতে আরম্ভ করিলেন, এইরূপে মহেশ্বরের কৃপায় তিনি প্রচুর গুপ্তধন প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সম্পত্তির সাহায্যে নানা দেশ হইতে সুদক্ষ কারীকরগণকে আনাইয়া, ক্রমান্বয়ে নয় বৎসরকাল প্রাণপণ পরিশ্রমসহকারে, একটী সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দির নির্ম্মাণ করান এবং উক্ত লিঙ্গটী তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেব আজ্ঞা পালন করেন। তদবধি তিনি সংসারত্যাগপূর্ব্বক জীবনের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত দেবসেবায় রত থাকিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করেন। কালক্রমে

হিন্দু ও মুসলমানদিগের জয়পরাজয়ে দেবতার সেবা বন্ধ হইল, এবং অত্যাচারের জন্য এই সুন্দর মন্দিরটী সংস্কার অভাবে ধ্বংশ হইতে লাগিল। শেষ ১৭৯০ খৃঃ মহীশূর যুদ্ধে ইহা ইংরাজদিগের দখলে আসে, কিন্তু মুসলমানদিগের বারম্বার ভয়ানক অত্যাচারের জন্য ভগবানরূপী জলকান্তীশ্বরের লিঙ্গটী অন্তর্হিত হইল। সেই অবধি দেবালয়টী দেবশূন্য হইয়াছে। যাহা হউক, এই শূন্য মন্দিরের শোভা দর্শন করিয়া পঞ্চ দিবস বিশ্রাম করিয়া অরুণাচলে ভগবান মহেশ্বরের পঞ্চভৌতিকের অন্যতম তেজমূর্ত্তি দর্শন আশে যাত্রা করিলাম।

অরুণাচলম্

ভেলোর হইতে অরুণাচলে যাইতে হইলে তিরুবন্নমলয় নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। ইহা এস, আই, রেল লাইনের মধ্যে একটী প্রধান ষ্টেশন, এখানে নানাপ্রকার ষ্টেশনারী, বই, মনোহারী দ্রব্যাদি এবং কাফি, সোডাওয়াটার, লিমনেড, কমলালেবু ও অপরাপর নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য প্রভৃতি সদাসর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

এখানকার অধিবাসীরা আমাদের দেশীয় বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে পারেন না, কেহ কেহ ইংরাজি বুঝিতে পারেন, কিন্তু সকলেই তেলেগু ভাষা জানেন, সুতরাং এখানকার অধিবাসীদিগের সহিত আমাদের ন্যায় অপরিচিত বাঙ্গালীদিগের কথাবার্ত্তা, নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গিসহকারে বুঝাইতে হয়। ট্রেণখানি এখানে অর্দ্ধঘণ্টা যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য অপেক্ষা করে, সুবিধা বোধ করিলে এই ষ্টেশনে মুখ প্রক্ষালনাদি ও স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। এখানে ব্রাহ্মণ পরিচালিত খাবারের দোকান আছে এবং ফেরিওয়ালারাও নানাপ্রকার ফল, মূল

সংগ্রহপূর্ব্বক সুবিধা দরে বিক্রয় করিয়া থাকে। এই ষ্টেশনের অনতি-দূরে অরুণাচলম্ নামক পাহাড়ের পূর্ব্বদিকে সহরটী অবস্থিত। সহরের মধ্যে হিন্দুদিগের বিশ্রামের জন্য অনেকগুলি ছত্রবাটী আছে, এই নিমিত্ত অপরিচিত বিদেশী হিন্দু যাত্রীকে বাসার জন্য কোনরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় না। এই স্থানে অনেক ইংরাজের বসবাস আছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শিকারপ্রিয়। তিরুবল্লমলয় ষ্টেশনের দক্ষিণ-দিকের মাঠে বিস্তর সজারু দেখিতে পাওয়া যায়, শিকারীগণ তাঁহাদের অধিকাংশ সময়ই এই মাঠে শিকার করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। যাঁহারা এই জন্তুগুলিকে শিকার করেন, তাঁহারা যেরূপ সুখী হন, আর যাঁহারা এই শিকার কৌতুক দর্শন করেন, তাঁহাদিগকেও ততদূর আহ্লাদিত হইতে হয়। প্রত্যহ দলে দলে এই মাঠে কত লোক উপস্থিত হইয়া এই শিকার কৌতুক দেখিয়া থাকেন। বলা-বাহুল্য, আমরা যে দুই একদিন এই স্থানে ছিলাম, সেই সময়ের মধ্যে এই কৌতুক দেখিতে বাদ পড়ি নাই।

"তিরুবল্লমলয়েশ্বর" মহাদেবের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া ভক্তগণ এই স্থানে আসিয়া থাকেন, এই শিবলিঙ্গই এখানকার প্রধান দেবতা। মহাদেবের মূলমন্দিরের নিকটেই মহাদেবী "অপীত কুচাম্বনের" দেবা-লয় প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দেব ও দেবী উভয়েরই ভোগ মূর্ত্তি আছে, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন এবং মনের সাধে অর্চ্চনা করিয়া সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই। মন্দিরটী বহু প্রাচীনকালে কৃষ্ণবর্ণ কষ্টি প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বহু স্তম্ভ দ্বারা সজ্জীকৃত আছে। ইহার চতুর্দ্দিকেই উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। দেবালয়টী সপ্ত প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, সর্ব্বপ্রথমেই উৎসব-মণ্ডপ দেখিতে পাইবেন, তাহার পর অপেক্ষাকৃত সারি সারি ছয়টী

অন্ধকার প্রকোষ্ঠ দেখিবেন। বলাবাহুল্য, এই অন্ধকারের নিমিত্ত দিবাভাগেও দীপালোকের ব্যবস্থা আছে। মূল স্থানে বেদীর উপর সেই অন্ধকার গৃহমধ্যে লিঙ্গরাজের তেজমূর্ত্তি বিরাজিত, ফলতঃ দীপের সাহায্য ব্যতীত দেবদর্শন হয় না। এখানকার নিয়ম এই যে, পূজক ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহ, তিনি ব্রাহ্মণ হইলেও দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ করিতে পান না। যাত্রীদিগের সমাগম হইলে পূজক মহাশয় কিছু প্রণামী আদায়ের জন্য আলোকহস্তে সর্ব্বসমক্ষে দেবালয়ের ভিতর প্রবেশ করেন, তখন ভক্তগণ সাধ্যমত প্রণামী প্রদানপূর্ব্বক জগমোহন হইতে ভগবানের তেজমূর্ত্তি দর্শন করিতে থাকেন। পূজারী ঠাকুর. কোন ভক্তের নিকট কিছু অধিক হারে প্রণামী প্রাপ্ত হইলে তাঁহার মনস্তুষ্টির নিমিত্ত নাম গোত্র উচ্চারণপূর্ব্বক মঙ্গলকামনা প্রার্থনা করিয়া ভগবানের অর্চ্চনা করেন, তৎপরে দেবের ভোগ প্রদানপূর্ব্বক কর্পূরারতি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই মন্দিরাভ্যন্তরে বিস্তর কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ আছে, তন্মধ্যে গণেশজীউর প্রকোষ্ঠটী দেখিবার যোগ্য। দেবালয়ের প্রাঙ্গণ মধ্যে একটী সোণার তালগাছ দেখিতে পাইবেন। পূজারী মহাশয়ের নিকট গল্পছলে উপদেশ পাইলাম যে, এখানে বৎসরের মধ্যে দুইবার উৎসব হয়। কার্ত্তিক মাসে যে উৎসবটী হয়, উহাই অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়, উহা "দীপম উৎসব" নামে প্রসিদ্ধ। কার্ত্তিক মাসে এই উৎসবের সময় এখানে প্রায় তিন লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়, সুতরাং পুলিসের উচ্চতম কর্ম্মচারীগণ উপস্থিত থাকিয়া শান্তিরক্ষা করিয়া থাকেন। আমরা কার্ত্তিক মাসে তথায় ছিলাম, এই নিমিত্ত এই মহা মেলাটী আমাদের ভাগ্যে দর্শন হইয়াছিল।

দীপম উৎসবের সময় প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ভোগমূর্ত্তিটীকে আনিতে

হইলে মূলমন্দিরের প্রবেশ দ্বার হইতে সঙ্কেতসূচক একটী হাউই-বাজীতে অগ্নিসংযোগ করা হয়, তখন বেদপাঠ করিতে করিতে পূজক-গণ একটী পাত্রে কর্পূররাশি প্রজ্জলিত করিয়া দেন, ঐ আলোকমালার সাহায্যে দেবতার যে ভোগমূর্ত্তিটী তথায় থাকেন, তাঁহার আবরণ খোলা হয়। মন্দিরের সমতলভূমির প্রবেশ পথ হইতে হাউইটী উপরে উঠিবামাত্র পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে যে একটী কুণ্ডে ঘৃত ও কর্পূর পূর্ব্ব হইতে পরিপূর্ণ থাকে, তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা হয়, এইরূপে ঘৃত ও কর্পূররাশি প্রজ্জলিত হইলে যে অগ্নিশিখা উঠে, ভক্তগণ বহুদূর হইতে ঐ শিখা দর্শনের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা চির-প্রথানুসারে এই দীপম উৎসবের দিন ভগবানের নামে ব্রত করিয়া সমস্ত দিন উপবাসী থাকেন। এই গিরি শৃঙ্গস্থিত আলকোজ্জ্বল শিখা দর্শন করিলেই ভক্তগণ বুঝিতে পারেন যে দেবতার পূজা হইয়াছে, এই নিমিত্ত ঐ আলোক দর্শন করিয়া তাঁহারা আপন আপন ব্রত উদ্যাপন করেন, আর এই কারণেই এই উৎসবের নাম "দীপম্" উৎসব।

মহর্ষি গৌতম এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানীয় অধি-বাসীরা এই স্থানকে মহাতীর্থ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। যে গৌতম ঋষির অসীম তপঃপ্রভাবে সকলেই মুগ্ধ, এমন কি দেবতারাও মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেই গৌতম ঋষিকে মানবগণ শ্রদ্ধা করিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে যত তীর্থ বা যত দেবালয় আছে, তাহাতে অধিকাংশই শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় শিবলিঙ্গ বা শিবলীলা দর্শন পাইবেন, ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে যত অসুর, যত রাক্ষস, যত দৈত্য ও যত দানবদিগের বিষয় প্রকাশ আছে, তাহা-দের আবাস স্থান এই দক্ষিণপ্রদেশেই ছিল; ফলতঃ তাহাদের আরাধ্য-দেব এবং একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা এই মহেশ্বরকেই জানিতেন। মহেশ্বর

মূর্ত্তি ভিন্ন অপর কোন দেবতার তাহারা পূজা করিতেন না। রামায়ণে বেদবিবরিত প্রসঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিন্দুগণ আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভাগে বানর, রাক্ষস ও দানবগণ ব্যতীত অপর কাহারও বসতি ছিল না। রামায়ণে আরও অবগত হওয়া যায় যে, ক্ষত্রিয়গণের দ্বারাই আর্য্যাবর্ত্তের সীমাভ্যন্তরে অঙ্গ, অযোধ্যা, মিথিলা, মগধ প্রভৃতি দেশ-সমূহ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া এক-একটী সুসভ্য রাজ্যতে পরিণত হইয়াছিল এবং বৈশ্যদিগের দ্বারাই বাণিজ্যের বহুল উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। আর সেই সময়ে বেদবিভক্তা বেদব্যাস, চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকময়ী ভারতসংহিতা রচনা করেন; তাহার অধিকাংশ উপাখ্যানই বেদমূলক, এবং সেই সমস্ত উপাখ্যানগুলি জাতীয় লোকেরা কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে ঐ সকল পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাতেই দেবদেবীর বিবরণাদি সন্নিবেশিত আছে। রামায়ণ পাঠে ইহাও জানিতে পারা যায় যে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নররূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইবার পর হইতেই ব্রাহ্মণ পৌরহিত্য করিয়া আসিতেছেন, অর্থাৎ বিবাহাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়াতে তাঁহারা সহায়তা করিতেছেন। সে যাহা হউক, দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে যে দুই-একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন পাওয়া যায়, উহা কেবল মহাত্মা রামানুচার্য্যের প্রতিভাবলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যে সকল অধিবাসীদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের আকৃতি এবং আচার ব্যবহার ও পাকপ্রণালী দেখিলে দৈত্য বা রাক্ষসদিগের বংশধর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, বিশেষতঃ তাহারা যে সকল বাক্য উচ্চারণ করেন, উহার মধ্যে কেবল আশুমাণ্ডু মিশ্রিত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়।

এখানকার গিরিশ্রেণীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া বৈদ্যেশ্বর দর্শন মানসে ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

বৈদ্যেশ্বর

তিরুবল্লমলয়ম হইতে বৈদ্যেশ্বর দর্শন করিতে যাইতে হইলে সাউথ ইণ্ডিয়ান্ রেলওয়ের বৈদ্যেশ্বরম্ কোইল নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। ষ্টেশন হইতে দেবালয় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। জনকনন্দিনী সীতাদেবী রাবণ কর্ত্তৃক নিঃসহায় অবস্থায় অপহৃতা হইলে দশরথ-মিত্র জটায়ুপক্ষী, সীতাদেবীর পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে দুরাত্মার কবল হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে করিতে লঙ্কেশ্বরের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইয়া, এই স্থানে মৃতকল্পাবস্থায় পতিত হন। এদিকে শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চবটীর কুটীরে সীতাদেবীকে দেখিতে না পাইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন, এবং হতাশপ্রাণে অনুজ লক্ষ্মণসহ বনের নানাস্থান অনুসন্ধান করিবার সময় এই স্থানে উপস্থিত হইলে, পিতৃসখা জটায়ুর নিকট সীতাদেবীর সন্ধান পাইলেন, কিন্তু সীতাদেবীর উদ্ধারের নিমিত্ত জটায়ুর এইরূপ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রকে কাতর হইতে হইল। এইরূপে কমললোচন শ্রীরামচন্দ্রকে সীতাদেবীর সংবাদ প্রদানপূর্ব্বক জটায়ু প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র স্বহস্তে পিতৃসখা জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া তাহার মহিমা প্রকাশের জন্য এই স্থানকে পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত করিলেন।

ষ্টেশন হইতে পূর্ব্বাভিমুখে দুই মাইল দূরে একটী প্রকাণ্ড শিবমন্দির আছে। মন্দিরটী বৃহৎ এবং তিনটী প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান বৈদ্যেশ্বর লিঙ্গরূপে পশ্চিমাভিমুখে বিরাজ করিতেছেন, এই দেবের নাম অনুসারে গ্রামটীর নাম বৈদ্যেশ্বর হইয়াছে। দেবালয়ের প্রাচীর দেওয়ালের মধ্যে নানাপ্রকার অশ্লীল মূর্ত্তি

খোদিত আছে, ইহার কারণ কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। সন্নিকটেই একটী কূপ আছে। প্রবাদ এইরূপ, যে স্থানে জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চুলি প্রস্তুত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই চুলি স্থানটাই কূপে পরিণত হইয়াছে। দেবালয়ের সম্মুখে চতুর্দ্দিকেই প্রস্তরের সোপান-শ্রেণীতে বাঁধান। এখানে একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, সেই পুষ্করিণীতে প্রথমে স্নান করিয়া দেব দর্শন করিবার নিয়ম আছে। মন্দিরের বহির্ভাগে পশ্চিমদিকে যে একটী মণ্ডপ আছে, সেই মণ্ডপটী পার হইলেই মূলমন্দিরে প্রবেশ করিতে পারা যায়। তখন পাণ্ডারা পূর্ব্বোক্ত কূপটাকে নির্দ্দেশ করিয়া জটায়ুর পবিত্র চরিত্রের বিষয় বর্ণনা করিতে থাকেন, এবং এই তীর্থকূপের নিয়মাদি পালন করিতে উপদেশ প্রদান করেন।

বৈদ্যেশ্বর মহাদেবের বিস্তর ভূসম্পত্তি আছে, এই সম্পত্তি হইতে বিস্তর আয় হইয়া থাকে। এই দেবতার প্রত্যহ ১।।৴ মণ চাউলের অন্নভোগ হইয়া থাকে। পূজার বন্দোবস্তও অতি পরিপাটি, দর্শনে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। যত অতিথি এখানে মধ্যাহ্ন ভোগের পূর্ব্বে উপস্থিত হয়, তাহারা সকলেই এই ভোগের প্রসাদ পাইয়া থাকে। যাত্রীদিগের সুবিধার্থে এখানে একটী ছত্রবাটী ও দুইটী হোটেল আছে এই ক্ষুদ্র পল্লীটীর সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ করিয়া মনের সুখে বিখ্যাত চিদম্বরমের অদ্ভুত দেবালয় দর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

চিদম্বরম

বৈদ্যেশ্বর হইতে চিদম্বরমের দেবালয়ে যাইতে হইলে ইহার পরবর্ত্তী চিদম্বরম নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। ষ্টেশন হইতে দেবালয়টী প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। এই তীর্থে আকাশরূপী ভগবান

মহেশ্বর বিরাজমান, অর্থাৎ মন্দিরমধ্যে কোন দেবতা বা বিগ্রহ মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায় না। স্থানীয় পূজারী ও আমাদের সঙ্গী গোমস্তা ঠাকুরের নিকট উপদেশ পাইলাম যে, এই অদ্ভুত দেবমন্দির স্বয়ং ব্রহ্মা উপস্থিত থাকিয়া, আপন ইচ্ছানুসারে পচ্ছন্দানুযায়ী বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। মন্দিরাভ্যন্তরে একটী ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর আছে, ঐ দেয়াল গাত্রে একখানি পর্দ্দা আছে, তাহাতে কেবল "আকাশলিঙ্গ" এই কথাটী লেখা আছে। ভক্তগণ প্রথমে বাহির হইতে মন্দিরটীর কারুকার্য্য এবং শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ভিতরে দেবদর্শন করিতে আসিয়া কেবল এই লেখাটী দর্শন করিয়া থাকেন। যাত্রীর সমাগম হইলে পূজক ঠাকুর মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক ঐ পর্দ্দা উত্তোলন করিয়া কেবল শূন্য দেওয়ালে "আকাশলিঙ্গ" এই লেখাটী দেখান। আমরা মন্দিরমধ্যে কেবল শূন্য দেওয়ালের লেখাটী দর্শন করতঃ দুঃখিত মনে প্রত্যাগমন-কালীন গোমস্তা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়! এইরূপ ভুবন বিখ্যাত অদ্ভুত প্রকাণ্ড মন্দিরমধ্যে দেবদর্শন পাইলাম না, কি নিমিত্ত?"

তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "ব্যোমরূপী বা আকাশরূপী লিঙ্গ মানব চক্ষুর অগোচর।"

তখন পুনরায় আর একবার এই প্রকাণ্ড মন্দিরের কারুকার্য্য ও সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আপন অদৃষ্টের বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দুগ্ধের পিপাসা ঘোলে মিটাইয়াই পরিতৃপ্ত হইলাম।

চিদম্বরমের মন্দিরাভ্যন্তরে যদিও দেবদর্শন না পাইয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু এখানে যথায় রৌপ্যমণ্ডিত মণ্ডপ শোভা পাইতেছে, সেই স্থানের সন্নিকটে কনকসভা, চিৎসভা, দেবসভা ও যে একটী নৃত্যসভা দর্শন করিলাম—উহাতেই পরিতৃপ্ত হইলাম, উপরোক্ত

সভা কয়টীর মধ্যে কনকসভার দৃশ্য দর্শনে মুগ্ধ হইতে হয়, ইহার কনকসভা নাম সার্থক হইয়াছে, এই কনকসভা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য !!

দাক্ষিণাত্যে প্রায় সকল দেবালয়ের তোরণ দ্বারগুলি লম্বাকৃতি, আমাদের বাঙ্গালা দেশের কলসীর ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ তোরণ বা গোপুর কোন দেবালয়ে দুইটী, কোনটীতে চারিটী আবার কোনটীতে বা পাঁচটী শোভা পাইতেছে। দুঃখের বিষয় দাক্ষিণাত্যে অধিকাংশ তীর্থ স্থানে ভাল খাবারের দোকান না থাকায় সময়ে সময়ে অপরিচিত নূতন যাত্রীকে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

চিদম্বরমের প্রকাণ্ড দেবালয়টী ১১৭ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং দুইটী প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। বাহিরের প্রাচীর প্রস্তর নির্ম্মিত আর ভিতরের প্রাচীরটী ইষ্টক নির্ম্মিত। যেন কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়মে কারেন্সি আফিসের ধন রক্ষিত হইতেছে। এই প্রস্তর নির্ম্মিত প্রথম প্রাচীরে চারিটী প্রবেশ দ্বার আছে, যাত্রীগণ আপন ইচ্ছানুসারে সেই দ্বারের মধ্য দিয়া দেবালয়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকেন। দেবালয়ের চতুর্দ্দিকেই প্রশস্ত পথ আছে, চিদম্বরমের মন্দির ব্যতীত এখানে আর একটী এই প্রকার বৃহৎ সুন্দর নটেশ্বর মহাদেবের মন্দির দর্শন পাইবেন। নটেশ্বরদেবের মন্দিরের চূড়াটী সোণার পাতে আবৃত সম্মুখেই রৌপ্যের পাতে মণ্ডিত একটী মণ্ডপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবালয়ের সম্মুখে একটী প্রকাণ্ড ঘণ্টা দোদুল্যমান আছে, যাত্রীগণ তথায় উপস্থিত হইয়া এই ঘণ্টায় ঘা দিয়া তাহাদের আগমনবার্ত্তা প্রচার করিয়া সাক্ষ্য রাখিয়া থাকেন। এই দেবালয়ের কারুকার্য্য এবং ঐশ্বর্য্য নয়নগোচর হইলে আত্মহারা হইতে হয়। তৎপরে অপর আর একটী পৃথক মন্দিরে ভগবান বিষ্ণুর অনন্তশয্যায় শায়িত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করিবেন। এই বিষ্ণু মন্দিরের প্রাঙ্গণের

একদিকে পিন্নিইয়ার নামক দেবালয়ে বিঘ্নেশ্বরের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দর্শন ও অর্চ্চনা করিবেন,কারণ বিঘ্নেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তাঁহার কৃপায় সকল প্রকার বিঘ্ন হইতে মুক্তিলাভ হয়। ইহার বিপরীতদিকে "হেম-তীর্থ" নামে একটী পুণ্যতোয়া সরোবর, আপন শোভা বিস্তার করিয়া আছে, এই তীর্থতীরের চারিদিকে প্রশস্ত বাঁধা রাস্তা আছে এবং নানাপ্রকার বৃক্ষ ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া ইহার সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি করিয়া দেবতার মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

যে সকল ভক্ত ব্রহ্মপুরীশ্বর মহাদেবের দর্শন অভিলায করিবেন, তাঁহারা এই স্থান হইতে শিবালী নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া মহেশ্বর ও মহেশ্বরী "ত্রিপুরা" সুন্দরীকে দর্শনপূর্ব্বক আপন জীবন সার্থক করিবেন। এই দেবদেবী উভয় মন্দিরই প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে। ব্রহ্মপুরীশ্বর মহাদেবেরও প্রত্যহ ১৷৹ দেড় মণ চাউলের অন্ন ভোগ্যের ব্যবস্থা আছে এবং সমাগত অতিথি ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সেই প্রসাদ বিতরিত হইয়া থাকে। দেবালয়ের বন্দোবস্ত দেখিলে জ্ঞানোদয় হয়। এইরূপ অন্নদান প্রথার ব্যবস্থা থাকায় কত যে গরীব দুঃখীর অন্নের সংস্থাপন হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এখানে শিবালী নগরের দেবদেবীর অর্চ্চনা করিয়া মায়াভরম্ নামক জংশন ষ্টেশনে অবতরণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর পুরীমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়।

মায়াভরম

মায়াভরম সহরের অপর নাম লক্ষ্মীপুরী। এই লক্ষ্মীপুরী—পুণ্যবতী কাবেরী নদীর উপরিভাগে অবস্থিত। শৈবগণ এই স্থানকে পরম তীর্থ বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন। এখানে অবস্থানকালে মা লক্ষ্মীর কৃপায়

রোগ, শোক, দুঃখ কোন কিছুই অনুভব হয় না, দেবীর আদেশে এখানে কেবল বসন্ত ঋতুই বিরাজ করিতেছে। লক্ষ্মীপুরে যে দেবালয় আছে, তথায় ময়ূরনাথ স্বামী নামে এক শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন, ইহার সন্নিকটেই দেবী অভয়াম্বার মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই স্থান হইতে পুণ্যতোয়া কাবেরী নদীতে স্নান করিতে যাইবার সময় অন্যূন এক মাইল পথ হাঁটিতে হয়। অথচ সহরটী এই নদীর উপরেই অবস্থিত। ইহার কারণ, নদী-পথটী এরূপ বক্রভাবে প্রসারিত হইয়াছে যে, এক মাইল পথ অতিক্রম না করিলে কিছুতেই তথায় উপস্থিত হওয়া যায় না। স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকটে অবগত হইলাম,এই স্থানটী প্রাচীনকাল হইতে লক্ষ্মীদেবীর আবাসস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সহরের রাস্তাগুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অনেকেই এই লক্ষ্মীপুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শান্তিলাভ করেন। অতি সুলভ মূল্যে সকল আহার্য্য সামগ্রীই পাওয়া যায়। এখানে সদাসর্ব্বদা নানাবিধ ফল বিক্রয় হয়, স্থানটী অত্যন্ত উর্ব্বরা। এখানকার অধিবাসীগণ লক্ষ্মীদেবীর কৃপায় বেশ সুখে কালযাপন করিয়া থাকেন, তাহারা সদাই প্রসন্নমনা। অপরিচিত নূতন হিন্দু যাত্রীদিগের বাস করিবার জন্য এখানে পাঁচটী ছত্রবাটী আছে, তন্মধ্যে নটকোটি শ্রেষ্ঠীদিগের যে দুইটী ছত্রবাটী আছে, তাহার বন্দোবস্ত অতি পরিপাটি, ইঁহাদের ছত্রবাটীর বন্দোবস্ত দেখিলে জ্ঞানোদয় হয়। দেবীর কৃপায় কটুবাক্য কাহাকে বলে, তাঁহারা উহা জানেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই দুইটী ছত্রবাটীতে ব্রাহ্মণদিগকে প্রত্যহ যত্নের সহিত ভোজন করাইবার নিয়ম দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। শ্রেষ্ঠীরাই এখানে প্রত্যহ অকাতরে অন্নদান করিয়া মা লক্ষ্মীর মান বজায় করিতেছেন।

ময়ূরনাথ স্বামীর মন্দির অতি বৃহৎ, তিনটী উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরি-

বেষ্টিত। মন্দিরাভ্যন্তরে লিঙ্গাকৃতি বিগ্রহ মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। এই দেবের বিস্তর ভূসম্পত্তি এবং নানাপ্রকার স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমুক্তা-যুক্ত জরোয়া অলঙ্কার আছে, এখানেও প্রত্যহ ১॥০ মণ চাউলের অন্ন ভোগ হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর দুইবার এখানে দেবতার উৎসব হয়। প্রথম উৎসবটী বৎসরের প্রথম মাস বৈশাখেই ১৫ দিন ব্যাপী, আর দ্বিতীয়টী সমস্ত কার্ত্তিক মাস ব্যাপী অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। দ্বিতীয় উৎসবের সময় অন্যূন এখানে পঞ্চাশ সহস্র যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে, এই উৎসব এক মহামারী ব্যাপার। এই মাস-ব্যাপী মেলার সময় কত যে গরীব দুঃখী লোকদিগের অন্নসংস্থাপন হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্বামীজীউর মূলমন্দিরের সন্নিকটে দেবী অভয়া-ম্বার শ্রীমন্দির শোভা পাইতেছে। এই দেবীর পূজা পদ্ধতি সমস্তই ময়ূরনাথ স্বামীর ন্যায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে এই পুরীতে উপ-স্থিত হইলে লক্ষ্মীদেবীর আশীর্ব্বাদে ক্ষণেকের জন্য সংসারের মায়া ভুলিয়া আর কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না।

লক্ষ্মীপুরী হইতে এক ক্রোশ দূরে ভুবনবিখ্যাত পেরুমল রঙ্গনাথের বিষ্ণুমন্দির দেদীপ্যমান। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান বিষ্ণুকে অনন্ত শয্যায় শায়িত দর্শন পাইবেন। এই রঙ্গনাথের মন্দিরটীও চারিটী প্রকাণ্ড প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রথম প্রাচীরের তোরণদ্বার পার হইলেই ইন্দু-সরোবর নামে একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাইবেন, ঐ সরো-বরে স্নান করিয়া শুদ্ধকলেবরে মূলমন্দিরে ভগবান রঙ্গনাথ স্বামীর দর্শন করিতে হয়। ইহার সন্নিকটেই "পেরুমল নায়িকা" নামে এক দেবী, পুরী আলোকিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে ভক্তি-পূর্ব্বক হৃদয়ের সহিত অর্চ্চনা করিবেন। এই দেবীস্থানের সম্মুখেই যে একটী মণ্ডপ আছে; তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে নানাপ্রকার দেবদেবীর

চিত্র সকল দর্শন করিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিবেন, বাস্তবিক এই সকল চিত্রগুলি দেখিলে হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। কোন চিত্রে কৈলাসে পার্ব্বতী পুত্রসহ ক্রীড়া করিতেছেন, কোনটীতে বা দেবাসুরের মহাযুদ্ধ হইতেছে, কোথাও বা নানাপ্রকার কৃত্রিম ফলমূলে সুশোভিত আছে। এইরূপ কত প্রকার পৌরাণিক চিত্রে মণ্ডপটী পরিপূর্ণ, তাহার ইয়ত্তা নাই। স্থানীয় পূজারী ঠাকুরের নিকট অবগত হইলাম যে, এই দেবের বার্ষিক ৯০০৲ টাকা বাঁধা আয়। এতদ্ভিন্ন আরও নানাপ্রকার উপায়ে ভগবানের পূজার নিমিত্ত বিস্তর আয় নির্দ্ধারিত আছে, ঐ সকল আয় হইতে সুচারুরূপে দেবতার পূজা সম্পন্ন হয়। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে দেবতার উৎসব হয়, তন্মধ্যে মাঘ মাসে যে উৎসব হয়, সেই উৎসব মাসব্যাপী এবং বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে সকল ভক্ত কার্ত্তিক মাসে দাক্ষিণাত্যের শোভা দর্শনের জন্য যাত্রা করেন, তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে কার্ত্তিক মাসের যাবতীয় দেবতার উৎসব দর্শন করিতে পান, ইহাই এ সময়ের যাত্রার ফললাভ হয়। অবগত হইলাম, এখানকার মাঘী উৎসব এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! মাঘ মাসে উৎসবের সময় প্রত্যহ অতি সমারোহে বিগ্রহ মূর্ত্তিটীকে কাবেরী সঙ্গমে স্নান করান হয়। যদি কোন ভাগ্যবান মাঘ মাসে এই স্থানে উপস্থিত হন, তাহা হইলে এই মাসব্যাপী দেবতার শোভা যাত্রা দর্শন করিতে অবহেলা করিবেন না। এইরূপে এখানকার দেবদেবীর সেবাপূর্ব্বক মনে মনে কমলাদেবীর শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া কুম্ভকোণম্ নামক স্থানে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম।

কুম্ভকোণম্

কুম্ভকোণম্—মান্দ্রাজপ্রদেশে কাবেরী নদীর তীরে ইহা একটী মহা তীর্থস্থল। চিদম্বরম ষ্টেশনের দশটী ষ্টেশনের পরই কুম্ভকোণম্ ষ্টেশন। কুম্ভকোণমে ছয়টী প্রসিদ্ধ দেবমন্দির বিরাজমান। কিন্তু মায়াভরম হইতে কুম্ভকোণম্ নামক স্থানে যাইতে হইলে কেবল এক মাইল রাস্তা অতিক্রম করিতে হয়। যাঁহারা চলিতে অক্ষম, তাঁহারা এই মায়াভরম হইতে গোশকটে যাত্রা করিবেন, কারণ অশ্বযান এখানে পাওয়া দুর্ঘট। সহরে প্রবেশ করিবার সময় পথিমধ্যে নগরের শোভা দেখিতে পাইবেন। সহরটী বহু দূর বিস্তৃত এবং বসতিতে পরিপূর্ণ। কলিকাতা সহরের ন্যায় এখানেও নাচ, তামাসা, থিয়েটার, নৃতগীতের আয়োজনের বিরাম নাই। এই সহরের মধ্যে প্রবেশকালীন পথিমধ্যে একখানি গোযানের উপর প্ল্যাকার্ড সন্নিবেশনপূর্ব্বক থিয়েটারের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইতেছে, দেখিতে পাইলাম। পশ্চিম তীর্থে যেরূপ বিশ্বেশ্বরের কৃপায় অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মাহাত্ম্য আছে, অর্থাৎ জীবগণের উদ্ধারসাধন হয়, দাক্ষিণাত্যে এই কুম্ভকোণমেও মহেশ্বরের কৃপায় সেইরূপ মাহাত্ম্য আছে, উপদেশ পাইলাম। অধিকন্তু এই স্থানের এত মাহাত্ম্য যে, জীবগণ এখানে দেহ ত্যাগ করিলে উদ্ধার হন, কিন্তু যদি কোন ভক্ত বহু দূরদেশ হইতে এই স্থানে আসিবার জন্য যাত্রা করিয়া থাকেন এবং এই পুণ্যভূমে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে পথিমধ্যে অপর কোন স্থানে জীবন-লীলা সম্বরণ করেন, তাহা হইলে স্বয়ং মহেশ্বর তাহাকে উদ্ধার করেন। এমন কি, সেই ভক্ত এই স্থানের সমস্ত মাহাত্ম্যই প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ আর কখন তাহাকে জঠর-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ধন্য মহেশ্বর! তোমার মহিমা ধন্য!

কুম্ভকোণম্ সহরের মধ্যে ছয়টী দেবালয় আছে, তন্মধ্যে কুম্ভেশ্বরের মন্দিরই প্রধান। এই দেবালয়ের প্রথম তোরণদ্বার পার হইলেই ভিতরে প্রবেশ করিয়া একটী বাজার দেখিতে পাওয়া যায়। মূলমন্দির মধ্যে ভগবান কুম্ভেশ্বর স্বামীর লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। স্বামীজীউর অত্যুচ্চ মন্দিরের তলদেশে উপস্থিত হইয়া ইহার কারুকার্য্য এবং স্থাপত্য নৈপুণ্য দর্শন করিলে আত্মহারা হইতে হয়। এতাবৎকাল এ প্রদেশে এরূপ কারুকার্য্যবিশিষ্ট উচ্চ দেবালয় আর কোথাও নয়নগোচর হয় নাই। কি সুন্দর প্রণালীতে ইহা গঠিত হইয়াছে, সে বিষয় যত চিন্তা করিবেন, ততই চমৎকৃত হইবেন। কুম্ভেশ্বর স্বামীর মন্দিরটী উচ্চে ১২৮ ফিট হইলেও ইহার শোভা অতীব সুন্দর। দেবতার নিত্য ব্যবহারোপযোগী বিস্তর রৌপ্যনির্ম্মিত পাল্কী, রথ, ঘোড়া, হস্তী প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া অনুমান করিলাম যে, এই দেবেরও বিস্তর সম্পত্তি আছে। স্থানটী অতিশয় উর্ব্বরা, এই নিমিত্ত বাঙ্গালা দেশের মত এখানে সকল প্রকার ফলমূল সস্তাদরে পাওয়া যায়। কত প্রকার যে জার্ম্মাণসিল্‌ভারের ঘটি, বাটি, বাক্স, খেলনা প্রভৃতি এখানে অল্পমূল্যে পাওয়া যায়, তাহার ইয়ত্তা নাই, এই স্থানটী জার্ম্মাণসিল্‌ভারের বাসন প্রভৃতির জন্যই বিখ্যাত। কুম্ভকোণম্ সহরে কুম্ভেশ্বর মহাদেবের দর্শনের জন্য আসিয়াছিলাম, এই নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমেই কুম্ভেশ্বর স্বামীর দর্শনপূর্ব্বক পর পর সোমেশ্বর স্বামী, শার্ঙ্গপাণি স্বামী, চক্রপাণি স্বামী এবং সর্ব্বশেষে রামস্বামীর দর্শন করিলাম।

চক্রপাণি স্বামীর মন্দিরটী কাবেরী নদীর উপরিভাগে অবস্থিত। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং দণ্ডায়মান মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। এই দেবালয়ের সন্নিকটে "মহামোক্ষম" নামক একটী সরোবর আছে, ঐ সরোবরটীর চতুর্দ্দিকেই প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানশ্রেণীর দ্বারা

বাঁধান, তদোপরি ছোট ছোট মন্দির দ্বারা পরিবেষ্টিত। চক্রপাণিদেবের সম্মুখস্থ নদীতে একটী কুণ্ড আছে, প্রতি বার বৎসর অন্তর তথায় মহা-মোক্ষ যোগ উপস্থিত হয়, তখন মুক্তি স্নান করিবার জন্য বহু দূরদেশ হইতে ভক্তগণ এখানে স্নান করিতে আসেন, ঐ সময় এত জনতা হয় যে; এত বড় সহরে কোথাও তিলমাত্র স্থান থাকে না। স্থানীয় অধি-বাসীদিগের নিকট অবগত হইলাম, ঐ মেলার সময় এখানে অন্যূন ৪০০০০০ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়।

রামস্বামীর দেবালয়—এই মন্দিরের তোরণদ্বারগুলি দেখিতে ছোট, কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য, এতাবৎকাল যত গোপুর দেখিয়াছি, ঐ সকল গোপুর অপেক্ষা চিত্তবিভ্রমকারী। এক-একখানি আস্ত প্রস্তর হইতে ইহার এক-একটী মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে, কোনটী শ্রীরাম রূপ, কোনটী বিষ্ণুরূপ, এইরূপ বিবিধ প্রকার দেবমূর্ত্তিই খোদিত হইয়া অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছে, যে কারীকরগণ এই সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এবং যাঁহাদের পচ্ছন্দে এই সকল স্থাপিত হইয়াছে, তাঁহারা মানব না দেবতা, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহাদের চরণে বার বার প্রণিপাত করিলাম। যাহা হউক, এই মন্দিরা-ভ্যন্তরে ভগবান রামস্বামীর পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিলাম। যাঁহারা মনে মনে বিবেচনা করেন যে, কলিকালে দেবতা-দিগের মাহাত্ম্য পাপপ্রযুক্ত অন্তর্হিত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট সবিনয় প্রার্থনা এই যে, একবার যেন তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে যাত্রাপূর্ব্বক এই সকল প্রাচীন তীর্থ স্থানসমূহ এবং দেবতাদিগের মাহাত্ম্য সকল স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আপনাপন ভ্রম সংশোধন করেন। আরও এই সকল অদ্ভূত কারুকার্য্যবিশিষ্ট সুন্দর গোপুরযুক্ত মন্দিরগুলির নির্ম্মাণ প্রণালী নয়নগোচর করিয়া কিছু কিছু শিক্ষালাভও করিয়া আপন অর্থ সদ্ব্য-

হার করেন। সে যাহা হউক, এইরূপে এখানকার মন্দিরের শোভা ও দেবতাদিগের অর্চ্চনাপূর্ব্বক তাঞ্জোর সহরের শোভা দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলাম।

এই কুম্ভকোণম্ সম্বন্ধে স্থানীয় পূজারীর নিকট উপদেশ পাইলাম, মহা প্রলয়কালে এক কুম্ভ "অমৃত" সুমেরু পর্ব্বতের গাত্রে সিকায় করিয়া ঝুলান ছিল। জলস্রোত প্রলয়রূপ ধারণ করতঃ, ঐ অমৃত সিকার উপর পর্য্যন্ত উঠিলে, কলসীটী সেই প্রবল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে দক্ষিণপ্রদেশে অর্থাৎ এই স্থানে আসে, প্রলয়ের অবসান হইলে ঐ জল শুষ্ক হয়, তখন এই অমৃত কলসীটী কাত হইয়া পতিত হইবার সময় ইঁহার কাণার এক অংশ ভাঙ্গিয়া অমৃত গড়াইতে থাকে। অন্তর্যামী ভগবান মহেশ্বর এই অমৃতের অপচয় হইতেছে অন্তরে জানিয়া, স্বয়ং হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশ কৈলাসপুরী হইতে এখানে উপস্থিত হন, এবং এই কুম্ভস্থ সমস্ত অমৃত পান করিয়া কুম্ভেশ্বর নাম ধারণ করেন। কুম্ভের কণা এই স্থানে ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া ভগবানের আদেশে এই স্থানটীর নাম কুম্ভকোণম্ হইয়াছে। অতঃপর একদা মহেশ্বর তাঞ্জোরের নায়কবংশীয় ধর্ম্মাত্মা শিবাপ্পার উপর সদয় হইয়া স্বপ্নে তাঁহার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করেন, তখন মহাত্মা শিবাপ্পা ভগবচ্চরণে অচলা ভক্তি স্থাপনপূর্ব্বক এই সুন্দর অত্যুচ্চ মন্দিরটী মনমত নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে লিঙ্গরাজকে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং নিত্য সেবার বন্দোবস্ত করিয়া মনের সুখে কালযাপন করিতে থাকেন, অদ্যাপিও তাঁহার বংশধরেরা পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্যপূর্ব্বক সেই পূর্ব্ব নিয়ম সকল পালন করিতেছেন।

তাঞ্জোর

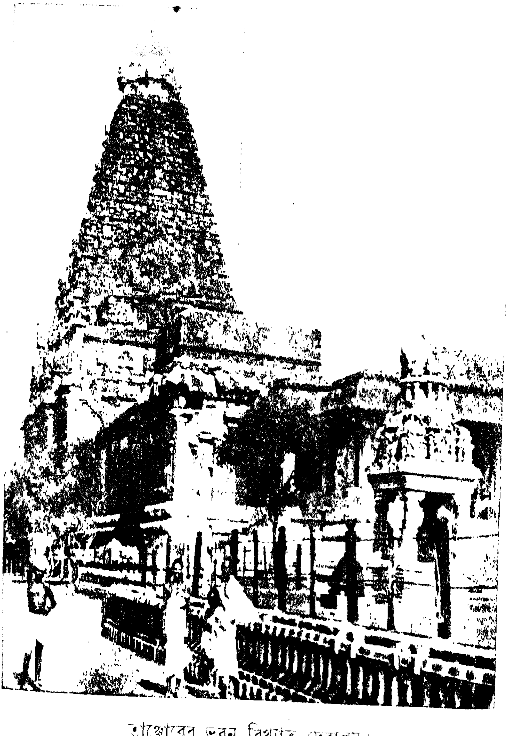
তাঞ্জোর একটী বিখ্যাত সহর। প্রাচীনকাল হইতে ইহা দক্ষিণ ভারতে রাজনীতি, সাহিত্য ও ধর্ম্মালোচনার কেন্দ্র স্থল। এই নগরী হিন্দুর স্থাপত্যবিদ্যা ও সভ্যতার জন্য চিরবিখ্যাত। তাঞ্জোরের কারু-কার্য্যবিশিষ্ট অদ্ভুত শিবমন্দির দর্শন করিলে যে, কত আনন্দ অনুভব হয়, তাহা লেখনীর দ্বারা প্রকাশ করা অসাধ্য।

মান্দ্রাজ হইতে এই তাঞ্জোর সহর ১০৯ ক্রোশ, দক্ষিণ-পশ্চিমে কাবেরী নদীর উপরিভাগে ব-দ্বীপের মধ্যস্থানে অবস্থিত। দক্ষিণ ভারতবর্ষের এই ব-দ্বীপের ন্যায় উর্ব্বরা স্থান আর দ্বিতীয় নাই। চোলা-রাজবংশদিগের ইহাই শেষ রাজধানী ছিল, তৎকালে বিজয়নগরের একজন নায়ক ইহার শাসনকর্ত্তারূপে বিরাজমান ছিলেন! তাঞ্জোরের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তা মহাবীর বেনকাজি, মহারাষ্ট্রীয় শিবাজীর ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া আপন বাহুবলে এই সহর অধিকার করেন। তৎপরে ১৭৭৯ খৃঃ রাণা বেনকাজি এই তাঞ্জোর সহর ও তন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রাম আপন দখলে রাখিয়া অন্যান্য নগরগুলি সুশাসনের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করেন। কালপ্রভাবে মহারাজ নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে ১৮৫৫ খৃঃ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট, সুবিধামত

নিকটস্থ গ্রামসমূহ ও সমস্ত তাঞ্জোর সহরটী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইয়াছেন। তাঞ্জোরের লোকসংখ্যা অনূ্যন ৫,৭,৯০০ শত।

ষ্টেশন হইতে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় রাস্তার দুই পার্শ্বে বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে মস্তক উত্তোলন করিয়া শোভা পাইতেছে, ঐ শোভা বর্ণনাতীত। ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে একটী ছত্রবাটী আছে, সেই ছত্রবাটীতে পরিশ্রান্ত যাত্রীরা, বিনা বাধায় বিশ্রাম সুখানুভব করেন এবং ভগবানের নিকট ছত্রস্বামীর মঙ্গল কামনা করিতে থাকেন।

যাত্রীরা গয়াধামে যেরূপ মাছি ও ভিমরুলের উপদ্রব, বৃন্দাবনে যেরূপ বানর ও মশার যন্ত্রণাভোগ সহ্য করিয়া থাকেন, এখানেও তাহাদিগকে সেইরূপ ছাড়পোকার উপদ্রব সহ্য করিতে হয়। বলাবাহুল্য, ছাড়পোকা সকল স্থানেই আছে, কিন্তু এখানকার ছাড়পোকার ক্রীড়া স্বতন্ত্র। বৃন্দাবনে যেরূপ আজগুবি গল্প শুনিতে পান যে, ব্রজবাসীগণ তথায় দেহ রাখিলে তাহারা বানররূপে জন্মগ্রহণ করেন, সুতরাং ব্রজমণ্ডলে বানরগণ যাত্রীদিগের প্রতি অত্যাচার করিলেও তাহাদের লাঞ্ছনা করিতে নিষেধ আছে, এখানেও সেইরূপ ছাড়পোকাকুল যাত্রীদিগের প্রতি অসীম সাহসে দিনমানেই দলে দলে আসিয়া দংশন করিতে থাকে, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কেহ তাহাদের প্রতি হিংসা করিতে পান না, কারণ স্থানীয় অধিবাসীদিগের বিশ্বাস যে, যে সকল দৈত্য, দানব ও অসুরগণ পাপকার্য্য করিয়া এখানে প্রাণত্যাগ করে, তাহারাই ছাড়পোকারূপে এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, অতএব ইহারা অবধ্য। সে যাহা হউক, এখানকার মত ছাড়পোকা আমি জন্মে কখন কোথাও দেখি নাই—যেন পিপীলিকাগুলি সারি দিয়া বর্ষাকালে সুখসচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের সেই শোভা যাত্রা দেখিলে ভয়ে প্রাণ শিহরিয়া উঠে।



তাঞ্জোরের ভুবন বিখ্যাত দেবালয়।

[৯১ পৃষ্ঠা।]

তাঞ্জোরের ভুবনবিখ্যাত ও মনোমুগ্ধকর দেবালয়টী একটী দুর্গ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। তাহার চতুর্দ্দিকেই গড়বন্দী, এই গড় অতিশয় গভীর ও প্রশস্ত। মূলমন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য একটী সেতু ঐ গড়ের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই সেতুর উপর দিয়া দেবালয়ে যাইবার সময় মূলমন্দিরের চূড়াটী দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ নির্দ্দিষ্ট চূড়া দেখিতে দেখিতে সহজেই দেবালয়ে পৌঁছিতে পারা যায়। পথিমধ্যে এই পথের দুই পার্শ্বে বৃক্ষ সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকাতে রাস্তাটী অতি সুন্দরভাব ধারণ করিয়া মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ডতাপ হইতে যাত্রীদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। এইরূপে এই সুন্দর মনোমুগ্ধকর বৃক্ষশ্রেণীর শোভা নয়নগোচর করিতে করিতে মূলমন্দিরে উপস্থিত হইয়া দেবালয়ের দুইটী প্রাঙ্গণ দেখিলাম। বহিঃপ্রাঙ্গণটী সমচতুষ্কোণ, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অন্যূন ২৫০ ফিট। তৎপরে যে দ্বিতীয় তোরণ পাইবেন, উহাও প্রস্থে ৫০০ ফিট এবং দৈর্ঘ্যে ২৫০ ফিট। এই দ্বিতীয় প্রাঙ্গণেই শ্রীমন্দিরটী বিরাজ করিতেছে। এই মন্দিরের মধ্য চূড়ার মত সুন্দর মন্দিরশীর্ষ ভারতমধ্যে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত মূলমন্দিরের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

এই কারুকার্য্যময় অদ্ভুত দেবালয়টী কিরূপ সুন্দর প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা একবার চিন্তা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ধন্য সেই মহাপুরুষ, যাঁহার তত্ত্বাবধানে এই মন্দিরটী প্রস্তুত হইয়াছে, আর ধন্য সেই দানবীর, যিনি অকাতরে জলস্রোতের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই মন্দির নির্ম্মাণকারীর শিল্প-নৈপুণ্যকে হৃদয়ের সহিত শত সহস্রবার প্রশংসা করিতে হয়। ইহার ভিত্তি সমচতুষ্কোণ, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অন্যূন ৯৬ ফিট। চতুর্দ্দিকেই নানা কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রাচীর পরিবেষ্টিত। মন্দিরের শীর্ষস্থিত বৃহৎ গোলা-

কার চূড়াটী একটী অখণ্ড গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত থাকায়, ইহার শোভা শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অবগত হইলাম, পাঁচ মাইল দীর্ঘ ঢালুপথ প্রস্তুত করিয়া এই গোলাকার চূড়াটী প্রথমে নির্ম্মিত হইয়া সুকৌশলে ঐ মন্দিরের শিখরদেশে তোলা হইয়াছিল। মন্দিরের তোরণদ্বারটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয়, শিবোদ্দেশে উহা উৎসর্গীকৃত। ধর্ম্মাত্মা কাঞ্চীর মহারাজ ১৩৩০ খৃঃ এই সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। মন্দির গাত্রে প্রতিষ্ঠিত সময়টী এইরূপ খোদিত দেখিতে পাইবেন।

এখানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নামে দুইটী দুর্গ আছে, কিন্তু এই দুইটী দুর্গই এত নিকট ও এরূপভাবে সংলগ্ন আছে যে, ইহাকে একটী দুর্গ বলিলেও চলে। ক্ষুদ্র নামক দুর্গ মধ্যে প্রধান দেবালয় এবং বৃহৎ নামক দুর্গ মধ্যে রাজপ্রাসাদ বিরাজমান। রাজপ্রাসাদের উত্তরভাগে স্কন্দদেবের একটী অতি সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরটী আয়তনে ছোট হইলেও গঠন ও সৌন্দর্য্যে এখানকার শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই স্কন্দদেবের মন্দিরটী সুব্রাহ্মণ্য স্বামীর মন্দির নামে খ্যাত আছে। ইহার বহিঃপ্রাচীর গাত্রে একটী জলসেচক যন্ত্র আছে, সেই যন্ত্রের সাহায্যে দেবালয়ের অভ্যন্তরসহ বিগ্রহগুলির উপর বারিবর্ষিত হয়। পূজকেরা ঐ বর্ষিতবারি যত্নের সহিত রাখিয়া পান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে ইহাই সৎ ও পবিত্র কার্য্য। এতদ্ভিন্ন এখানে আরও দুইটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে বহিঃস্তর মন্দিরটীর কারুকার্য্য এবং শিল্পনৈপুণ্য নয়নগোচর হইলে চমৎকৃত হইতে হয়। পাঠকবর্গের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত এখানকার প্রধান রাস্তার একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।



ভুঙ্গারের প্রধান রাস্তার চিত্র। [৯২ পৃষ্ঠা]

তাঞ্জোরের আদি বৃত্তান্ত

পুরাকালে ত্রিশিরা নামে এক দুর্দ্দান্ত রাক্ষস এই স্থানের পর্ব্বত-গুহায় বাস করিত। বলাবাহুল্য, সেই সময় এই স্থানের চতুর্দ্দিকেই জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। কারণ ত্রিশিরার অত্যাচারের ভয়ে তথায় কেহ বাস করিতে সাহস করিত না। একদা দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় কোন বিশেষ কারণ বশতঃ এই জঙ্গলে উপস্থিত হইলে ত্রিশিরা তাঁহাকে সামান্য মানব বোধে আক্রমণ করিল। যে কার্ত্তিকের বাহুবলে দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি বীরপুরুষগণ সতত ত্রাসিত হইতেন, যে কার্ত্তিকের অপর নাম "শক্তি," যাঁহার পরাক্রম দর্শন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র মহা-প্রলয়কর দানবযুদ্ধে তাঁহাকে সেনাপতি পদে বরণ করিয়া নিরাপদ হইয়াছিলেন, সেই দেবসেনাপতি "শক্তির" নিকট এই রাক্ষসের বিক্রম অতি তুচ্ছ। ত্রিশিরা তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি অবলীলাক্রমে এই রাক্ষসকে সংহার করিয়া এই স্থানটী নিরাপদ করেন এবং রাক্ষসের নাম অনুসারে এই স্থানের নাম ত্রিশিরাপল্লী রাখেন, কিন্তু এক্ষণে ইংরাজরাজের রাজত্বকালে সেই প্রাচীন ত্রিশিরাপল্লী নগর, ত্রিচিনাপল্লী নামে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, কার্ত্তিক এই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে বধ করিলে সুরবধিতান নামে এক রাজা, এই স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক মনের সুখে রাজত্ব করেন, এবং দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকের বাহুবলে নির্ব্বিঘ্নে এই ভয়ঙ্কর স্থানে রাজধানী স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া, ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ তিনি কাবেরী নদীর উত্তর তীরে, সুব্রাহ্মণ্য স্বামীর নামে বহু অর্থ ব্যয়সহ-কারে এই সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে স্বামীজীউর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন; এবং নিত্যপূজার নিমিত্ত বিস্তর

আয়কর ভূসম্পত্তি বরাদ্দ করেন, তদবধি এই স্থানে কার্ত্তিক "সুব্রাম্ম স্বামী" নামে খ্যাত হইয়া অদ্যাপিও পূজা পাইতেছেন।

তাঞ্জোরের মূলমন্দিরের ছোট গোপুরটী পার হইলেই একটী প্র প্রাঙ্গণ ভূমিতে উপস্থিত হইবেন। এই প্রাঙ্গণটী প্রস্তর নির্ম্মি ইহার পশ্চিমে অর্থাৎ মূলমন্দিরের সম্মুখে রেলিং ঘেরা প্রস্তরগ্রা বেদীর উপর একটী প্রকাণ্ড বৃষ মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন, ইহার পশ্ ভাগে শিবগঙ্গা নামে একটী পুণ্যতোয়া সরোবর আছে, ঐ সরোবরে ঠিক সম্মুখদিকে বৃদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দির বিরাজমান। মন্দিরাভ্যন্ত ভগবান মহেশ্বর লিঙ্গরূপে বিরাজ করিতেছেন। বেদীর উপর বৃষটী প্রথমে দেখিবেন, ঐ নন্দী মূর্ত্তিটী এই ভগবান বৃদ্ধেশ্বর স্বামীর বাহন। এই নন্দী মূর্ত্তিটী দৈর্ঘ্যে ১৬ ফিট এবং উর্দ্ধে নয় ফিট, এ খানি নিরেট পাথর হইতে এই বৃষ মূর্ত্তিটী প্রস্তুত হইয়াছে। প্রত্যহ এ বৃষ মূর্ত্তিটীতে তৈল নিষিক্ত হওয়াতে প্রথমে দেখিলেই উহা সুন্দর ব্রো ধাতুর মত চাক্‌চিক্য বলিয়া ভ্রম হয়।

দাক্ষিণাত্যে যতগুলি গোপুর ও মন্দির নয়নগোচর হইল, এরূ মন্দির আর কোথাও দেখি নাই। তাঞ্জোরের মূলমন্দিরের বিশেষ এই যে, গোপুরগুলির মূর্ত্তি সকল বিষ্ণুর লীলাসূচক এবং প্রাঙ্গণে মূর্ত্তিগুলি যেন শিবলীলা প্রকাশ করিতেছে।

পূর্ব্বে সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থ দর্শনের জন্য যখন প্রথম যাত্রা করি তখন একবার স্বপ্নেও ভাবি নাই যে দাক্ষিণাত্যের উচ্চ তোরণবিশি এরূপ অপূর্ব্ব কারুকার্য্যপূর্ণ সুন্দর মন্দির সকল এবং দেবতাদিগে অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া এত অধিক আনন্দলাভ করিব। যখ পশ্চিমে তীর্থস্থান সকল পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম, তখন মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে, হরিদ্বার, অযোধ্যা, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, জয়

পুরের ভুবনবিখ্যাত দেবালয় প্রভৃতির ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী এবং সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট দেবালয় ভারত মধ্যে আর কোথাও নাই, কিন্তু সেই ধারণা—সেইরূপ ভাব, এই দাক্ষিণাত্যের মন্দির সকল দর্শন করিয়া পরিবর্ত্তন করিতে হইল। যদিও গুরুজনের অনুরোধে দক্ষিণ তীর্থে যাত্রা করিয়াছিলাম, কিন্তু মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াছিলাম যে, গুরুজনবর্গকে সন্তুষ্ট রাখাই মানবজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য—এই বিশ্বাসে তাঁহাদের প্রীতির জন্য এবং রেলওয়ে কোম্পানীর যে সকল টাকাগুলি ঋণী আছি, উহা পরিশোধ করিবার জন্য যাত্রা করিলাম, কারণ পশ্চিম তীর্থের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী-ধনশালী এবং সৌন্দর্য্যশালী তীর্থ যদি আর কোথাও থাকিত, তাহা হইলে কি দলে দলে বঙ্গের নরনারীগণ তথায় গমন করিতেন না। হিন্দু নরনারী যে তীর্থের কাঙ্গাল, তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস তীর্থে দেবদর্শন করিলেই মানবজীবনের সকল পাপ বিদূরীত হয়। দক্ষিণে কোন তীর্থ স্থানের ত সুখ্যাতি শুনিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর তীর্থে শুভদিনে ঘট স্থাপনপূর্ব্বক শুভ যাত্রা করিলাম, কিন্তু খড়দহ রোড ষ্টেশন পার হইয়া দাক্ষিণাভিমুখে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই দেবমন্দির সমূহের সৌন্দর্য্য দর্শনে স্তম্ভিত হইতে লাগিলাম।

দক্ষিণতীর্থে—নবপ্রস্ফুটিত গোলাপের সৌরভের ন্যায় কার্য্যবিশিষ্ট সুন্দর দেবালয়গুলির মনোহর দৃশ্য যাহাতে সকল বঙ্গবাসীর মন আকর্ষণ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ রাখিয়া আমার এই ক্ষুদ্র ভ্রমণকাহিনী নামক পুস্তক রচনা হইয়াছে। যাঁহারা পশ্চিম তীর্থ সকল দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা যে ক্লেশ, যে অর্থ ব্যয় সহ্য করিয়া উহা সদ্ব্যবহার মনে ভাবিয়া সুখী হইয়াছেন, স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি,

তাঁহারা একবারমাত্র এই দক্ষিণে যাত্রা করিয়া তীর্থ স্থান সকল পরিভ্রমণ করিলে অধিকতর সুখানুভব করিবেন সন্দেহ নাই। এখানকার দেবালয়গুলির আয়তন এত বড় যে, এক-একটী দেবালয় যেন এক একটী গ্রাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহাদের চেষ্টায় এবং তত্ত্বাবধানে এখনও এই সকল প্রাচীন দেবালয়গুলিতে ভগবানের লীলা সকল অক্ষত দেহে বিরাজ করিতে করিতে সেই মহাত্মাদিগের কীর্ত্তি ঘোষণা হইতেছে, তাঁহাদিগকে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ভক্তি দান করিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? যে সকল ভক্ত পূর্ব্বোক্ত দেবালয়গুলিতে ভগবানের লীলাখেলা এবং দেবতার ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা এখানে এই সকল মন্দির এবং দেবতার ঐশ্বর্য্য দর্শন করিলে উহা সামান্য বলিয়া অনুমান করিবেন, ইহাই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। এই নিমিত্ত ভক্ত হিন্দু বঙ্গবাসীদিগকে সবিনয় অনুরোধ করিতেছি, যদি যথার্থ স্বর্গীয় শোভা-মূর্ত্তি দর্শন করিতে চান, তাহা হইলে একবার স্বচক্ষে সুস্থ শরীরে এই দক্ষিণ প্রদেশের তীর্থ এবং দেবালয় সকল দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করুন। এই সকল তীর্থ স্থান পরিভ্রমণ করিতে পারিলে জ্ঞানের বিকাশ, দৈহিক উন্নতি, আর তৎসঙ্গে পরকালের কার্য্য, এই ত্রিবিধ ফললাভ হয়। অতএব পাঠকবৃন্দ! সময় থাকিতে থাকিতে অর্থের সদ্ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান করিবেন।

যে পাণ্ডার গোমস্তাটী আমরা সৌভাগ্যক্রমে মান্দ্রাজে পাইয়াছিলাম, তিনি সঙ্গে থাকায় আমাদের সকল দিকে সুবিধা হইতে লাগিল। প্রথমতঃ কোন তীর্থে কোন্ পাণ্ডার নিকট যাইলে অল্পসল্প ব্যয় হইবে, কোন ছত্রবাটীতে বাস করিলে সকলদিকে সুবিধা পাইব, এই প্রকার সকল বিষয়ে তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল, তিনি নিজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত থাকায় স্থানে স্থানে তাঁহারই দ্বারা পুরোহিতের কার্য্য সম্পন্ন

হইতে লাগিল, আবার সুবিধামত তিনি সময় পাইলে স্থান মাহাত্ম্য এবং পৌরাণিক তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করিয়া ভগবচ্চরণে গাঢ় ভক্তিপ্রদান করিতে লাগিলেন, আবার কোথাও বা জঠরানল নিবৃত্তির জন্ত তাঁহারই দ্বারা পাক প্রস্তুত হইতে লাগিল, আমরা এরূপ একটী বিজ্ঞ লোক প্রাপ্ত হইয়া সৌভাগ্য বোধ করিতে লাগিলাম। ভগবানের কৃপা ব্যতীত কি কখন কেহ এমন সুবিধা পান ? বলাবাহুল্য, তিনি অহঙ্কার বর্জ্জিত, সদালাপি, সকল বিষয়েই পারদর্শি। এই মহাত্মার নিকট গল্প-চ্ছলে "যে তীর্থের যে মাহাত্ম্য এবং যে তীর্থ যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছে," এই সকল বিষয় উপদেশ পাইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। এ সকলই দেবমায়া, কারণ তাঁহার কৃপা ভিন্ন কখনই এরূপ সংঘটন হইতে পারে না।

এতাবৎকাল তাঁহার নিকট কোনরূপ অনুরোধ করি নাই, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই পালন করিয়াছি, তিনি যে স্থানে লইয়া গিয়াছেন, সেই স্থানেই সুবোধ বালকের মত গিয়াছি, অর্থাৎ তাঁহার উপদেশের বিরুদ্ধাচরণ কখন করি নাই। এ দেশে ক্রমাগত কেবল শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে অন্য এক প্রকার ভাবের উদয় হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার নিকট এই প্রথম অনুরোধ করিলাম যে, "ঠাকুরজি! অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঞ্জোরের উৎপত্তি প্রকাশ করিয়া আমাদের বাসনাপূর্ণ করুন এবং এই স্থান হইতে এমন একটী পুণ্য স্থানে যাত্রা করুন, যথায় মনের শান্তিলাভ এবং সুখানুভব হয়, অধিকন্তু শীঘ্র শীঘ্র যাহাতে ভগবান রামেশ্বর জীউর দর্শনলাভ করিতে সক্ষম হই, তাহারই ব্যবস্থা করিয়া বাধিত করুন।"

তিনি আমাদের মনের ভাব অবগত হইয়া বলিলেন, "বাবুজি! উপস্থিত আমরা ত্রিচিনাপল্লীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, এই স্থানে যাহা

কিছু নয়নগোচর হইবে, সমস্তই আশ্চর্য্য বোধ করিয়া স্তম্ভিত হইবেন, বিশেষতঃ এরূপ বৃহৎ ঐশ্বর্য্যশালী দেবালয় এবং ভগবান বিষ্ণুর অপূর্ব শ্রীমূর্ত্তি বোধ হয়, ভারতমধ্যে আর কোথাও দেখিতে পাইবেন কিনা সন্দেহ, অতএব প্রথমেই আপনাদিগকে সেই ভগবান শ্রীরঙ্গমজীউর প্রেমপূর্ণ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া তথা হইতে কিষ্কিন্ধ্যাপুরী যাত্রা করিব— আর ত্রিচিনাপল্লীর শোভা দেখাইবার জন্য এখান হইতে হাটাপথে গোশকটে গমন করিতে করিতে এ নগরের শোভা দেখাইব মনে করিয়াছি, এক্ষণে আপনাদের কিরূপ অনুমতি হয়।”

আমাদের মধ্যে সকলেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কারণ তাঁহার সেই উত্তেজিত বাক্যে আমাদের হৃদয়, শ্রীরঙ্গমজীউর শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য যেন নৃত্য করিতে লাগিল, আরও তিনি আমাদের যেরূপ উপদেশ দিতেন, তাহাতে আমাদের মঙ্গল বই কখন অমঙ্গল হয় নাই।

তাঞ্জোরের উৎপত্তি

পুরাকালে তন্‌জান নামে এক রাক্ষস সেই স্থানে বাস করিত, এত বড় সহর—যথায় কত সহস্র লোকের বসতি ছিল, সেই জনপূর্ণ স্থান তাহার দৌরাত্ম্যের এবং অত্যাচারের জন্য প্রায়ই জনশূন্য হইয়াছিল। এইরূপে একদা তন্‌জান ক্ষুধায় কাতর হইয়া পল্লীর চতুর্দ্দিকে আহার অন্বেষণ করিবার সময় এক স্থানে এক ধ্যানস্থ ঋষিকে দেখিতে পাইয়া জঠরানল নিবৃত্তির জন্য তাঁহাকেই আক্রমণ করিল। ধ্যানস্থ ঋষি সহসা চক্ষু উন্মিলন করিলে, এই ভয়ঙ্কর অদ্ভুত আকৃতি রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন দেখিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ঙ্কারী বিষ্ণুর

শরণাপন্ন হইলেন, তখন ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তকে উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য এই দুরান্ত রাক্ষসকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলে, তন্‌জান সেই তেজোময় মূর্ত্তি দর্শনে প্রাণভয়ে তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া স্তব করিতে লাগিল, ভগবান বিষ্ণু তাহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া অভিলাষিত বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। রাক্ষস উপস্থিত সুযোগ দেখিয়া আপন মুক্তির উপায়ের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য এই প্রার্থনা করিল যে, "ভগবান! যখন স্বয়ং আপনি আমায় উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, তখন ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর আমার কি হইতে পারে? কিন্তু শ্রীচরণে আমার শেষ ভিক্ষা এই যে, এই স্থানে আমি বহু কালাবধি বাস করিয়া পল্লীটী জনশূন্য করিয়াছি, অতএব এই নগর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে যেন আমার নাম অনুসারে ইহা প্রসিদ্ধ হয়। ভগবান বিষ্ণু "তথাস্তু" বলিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিলেন। তদবধি সেই রাক্ষসের নাম অনুসারে এই নগরের নাম তন্‌জন হইয়াছিল, এক্ষণে ঐ নামের পরিবর্ত্তন হইয়া ইহা তাঞ্জোর নামে পরিণত হইয়াছে।

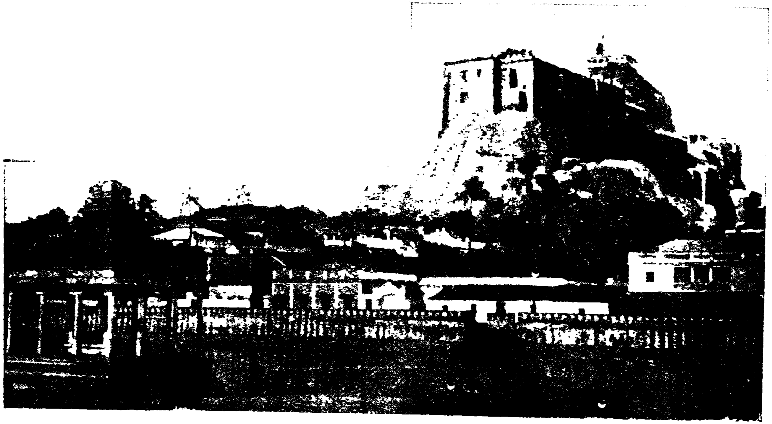
ত্রিচিনাপলী

ত্রিচিনাপলী বা ত্রিশিরা রাক্ষসের পুরী। এই পুরীতে তাঞ্জোর সহর হইতে রেলযোগে যাইতে হইলে ত্রিচিনাপলী নামক যে প্রধান ষ্টেশন আছে, তথায় অবতরণ করিতে হয়। পুরীটী তাঞ্জোরের ১৫ ক্রোশ পশ্চিমে কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা এই প্রেসিডেন্সির দ্বিতীয় নগর। এখানে ইংরাজরাজের বিস্তর সৈন্য থাকে। দুর্গের ভিতরে ত্রিচিনাপলী শৈল। গিরিরাজ সমভূমির মধ্যস্থলে একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে,ইহার উচ্চতা অনূ্যন ১৮২ হাত। এই শৈলশিখরে

উঠিবার জন্য পাহাড়ের গাত্রে পাথর কাটিয়া সিঁড়ি নির্ম্মাণ করিয়া উপরে উঠিবার সুবিধা করা হইয়াছে, এই অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপরিভাগে দুইটী মন্দির আছে, একটী শিবমন্দির—অপরটী গণেশজীউর মন্দির। প্রতি বৎসর পর্ব্ব উপলক্ষে এখানে এই পাহাড়ের উপরিভাগে অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। শ্রীরঙ্গ নামে এখানে যে প্রধান প্রকাণ্ড ও প্রশস্ত বিষ্ণুমন্দির আছে, এরূপ আয়তনে বৃহৎ মন্দির ভারতবর্ষ মধ্যে নাই।

ত্রিচিনাপলী এ লাইনে একটী রেলওয়ে কোম্পানীর বৃহৎ জংশন ষ্টেশন। কাবেরী নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে এই ষ্টেশনটী অবস্থিত। ষ্টেশনের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্রের উপরে "ফকিরের পাহাড়" নামে যে একটী পাহাড় আছে। অবগত হইলাম, ইংরাজরাজ্যের প্রতিষ্ঠিতা মহাবীর ক্লাইভ এই পাহাড়ের উপরই ফরাসিদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন।

ত্রিচিনাপলী একটী সমৃদ্ধিশালী সহর। এই সহরের দক্ষিণে গোল্ডনরক্ নামে একটী উচ্চ পাহাড় দেখিতে পাইবেন, তাহার তলদেশে কোম্পানীর প্রকাণ্ড জেলখানা। পুলিস, আদালত, ফোর্ট, সমস্তই এখানে বিদ্যমান। এই ফোর্টের উত্তরে কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে, সাধারণে ঐ পাহাড়গুলিকে ফ্রেঞ্চ পাহাড় বলে, কারণ ইংরাজদিগের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধকালে এই সকল পাহাড়ের উপর ফরাসীরা সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে কাবেরী নদীর পরপারে সেরিঙ্গম নামে একটী দ্বীপ আছে, তাহার দৃশ্য অতি মনোহর। এই সুন্দর দ্বীপটী ৩২টী খিলানের উপর সেতু দ্বারা সংলগ্ন আছে। এখান হইতে যত উত্তর দিকে যাইবেন, পর্ব্বতশ্রেণীর শোভা তত অধিক নয়নগোচর হইতে থাকিবে।



ত্রিচিনাপল্লী সহরের সাধারণ দৃশ্য। [১০১ পৃষ্ঠা।

ষ্টেশনের পশ্চিমে প্রসিদ্ধ চোলরাজদিগের রাজধানী ছিল, কিন্তু হায়! কালক্রমে সেই রাজধানী এক্ষণে সামান্য গ্রামে পরিণত হইয়াছে, দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। এই রাজধানী হইতে "শ্রীরঙ্গম" দেবালয়, মাত্র পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পাঁচ মাইল পথ, বাঁকা পার্ব্বত্য পথ, সেই পথের উপর দিয়া গো-যানে যাইবার সময় সহরের নানা প্রকার শোভা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম, কারণ এই গিরিপথের উপর ও নীচে কুটীরগুলি এরূপ অবস্থায় নির্ম্মিত হইয়াছে যে, উহা দেখিলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। এখানে দুই প্রকার গো-যান পাওয়া যায়, এক প্রকার স্প্রীংযুক্ত, অপরটি স্প্রীংবিহীন। স্প্রীংযুক্ত গাড়ীতে আরোহণ করিলে কোনরূপ কষ্ট হয় না, সুতরাং স্প্রীংওলা গাড়ীই ভাড়া করিলাম। এই পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করিবার জন্য প্রত্যেক গাড়ীখানি ৷৵০ আনা ভাড়া ধার্য্য হইল। যাঁহারা এই পাঁচ মাইল পথ রেলযোগে যাইবেন, তাঁহারা ত্রিচিনাপলী ফোর্ট নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিবেন। এই ষ্টেশন হইতে দেবালয়টী অন্যূন দেড় ক্রোশমাত্র। শ্রীরঙ্গমনাথের পাণ্ডা নিযুক্ত গোমস্তাগণ এখানে সহরের চতুর্দ্দিকে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকেন এবং যাত্রী সংগ্রহ করিয়া পাণ্ডার নিকট লইয়া যান, এই কর্ম্মের জন্যই তাহারা নিযুক্ত আছেন এবং ইহারই নিমিত্ত তাহারা পাণ্ডার নিকট বেতন পাইয়া থাকেন। আমাদিগের নিকট যে গোমস্তাটী ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া কেহ আমাদের বিরক্ত করিতে আসেন নাই সত্য, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা গো-শকটে যাইতে লাগিলাম, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীরঙ্গমনাথের পাণ্ডার গোমস্তারা আমাদের সঙ্গী গোমস্তাটীকে আয়ত্ত করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন, আমরা সকলে স্থিরভাবে এই রহস্য দেখিতে লাগিলাম। শ্রীরঙ্গমনাথের পাণ্ডার গোমস্তারা বেশ হিন্দি ভাষা জানেন, কিন্তু হিন্দি

ব্যতীত বাঙ্গালা বা ইংরাজী ভাষা জানেন না। আমাদের কলিকাতা অবগত হইয়া তাঁহারা আমাদিগকে কলকাতাওয়ালা সম্বোধন করিতে লাগিলেন। সে যাহা হউক, পূর্ব্বেই বলিয়া আমাদের সঙ্গী গোমস্তাটী সকল বিষয়েরই পরিণামের দি রাখেন, এইজন্য স্থানীয় গোমস্তাদিগের বারম্বার অনুরোধে পাণ্ডার নিকট সুফ বা সকল বিষয়ে সুবিধা হইবে, এই সকল মীমাংসা করিতে করিতে যিনি সকলের অপেক্ষা কম চা তাহাকে বলিলেন, "যদি তোমার পাণ্ডা আমার যাত্রীদিগকে বে অযত্ন করেন এবং তুমি যেরূপ হারে পূজা বা সুফল প্রভৃতির চুক্তি করিলে তাহাতে তোমার পাণ্ডা যদি অমত করেন, তাহা আমি নিশ্চয়ই অন্যত্র গমন করিব, তখন তুমি দুঃখ করিতে পারিবে তাঁহার সেই নীতিগর্ভ উপদেশগুলি কর্ণকুহরে প্রবেশ করিব আমাদের জ্ঞানোদয় হইল। অবশেষ আমাদের সঙ্গীটী সকল চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া তাহারই পাণ্ডার নিকট যাইতে স্বীকার লেন, তখন তিনিও সন্তুষ্টচিত্তে যত্নের সহিত আমাদের সহিত মি হইয়া পথ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এইরূপে সকলে এই সংক্রান্ত নানা বিষয় গল্প করিতে করিতে স্বচ্ছ . দেবস্থানে নি পৌঁছিলাম।

শ্রীশ্রীরঙ্গমজীউ

শ্রীরঙ্গম—দক্ষিণ ভারতের একটী মহাতীর্থ। ত্রিচিনা ফোর্ট নামক নগরেই শ্রীরঙ্গমজীউর দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে দিগের রাজধানী ও সুদীর্ঘ দুর্গ এই স্থানেই ছিল, কিন্তু হায়! ব প্রভাবে সে সমস্তই গিয়াছে, এক্ষণে নগর প্রবেশ পথে কেবল

প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাংশ প্রাচীরটীই দুর্গের চিহ্ন স্থান বলিয়া জানিতে পারিলাম। ইহার নিকটেই একটী প্রকাণ্ড গির্জ্জা শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

এই গ্রামে সদাসর্ব্বদা বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। পথি পার্শ্বে একটী বিস্তৃত জলাশয় আছে, তাহার চারিধারে প্রস্তর গ্রোথিত সোপানশ্রেণীতে আবৃত। ভগবান্ শ্রীরঙ্গমজীউর পবিত্র শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিবার পূর্ব্বে প্রথমে এই জলাশয়ে স্নান করিয়া শুদ্ধকলেবরে দেবালয়ের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। এই জলাশয়ের দক্ষিণদিকে "গণপতি আশ্রম" নামে ত্রিচিনাপলী পর্ব্বতের উপরিভাগে এক দেবালয় শোভা পাইতেছে। পাহাড়ের শিখরদেশে সিদ্ধিদাতা গণেশজীউর শ্রীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। দেখিলাম, এই গণপতিদেবের পূজার জন্য কাবেরী নদীর পবিত্র বারি, বিস্তৃত ছত্র উন্মুক্ত করিয়া, বাদ্যসহকারে অতি সমাদরে প্রত্যহ আনীত হয়।

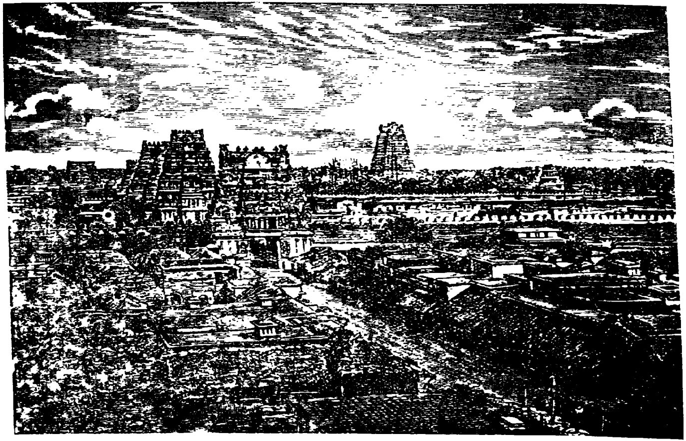
এখানে কাবেরী নদীতে স্নান করিবার সুবিধার্থে চাঁদনীযুক্ত সোপান বাঁধান একটী বাঁধা ঘাট আছে, সেই ঘাটে পিতৃপুরুষদিগের মঙ্গল কামনায় পিতৃতর্পণ, ঋষিতর্পণ প্রভৃতি সমাধা করিয়া এই নদীতে অবগাহন করিবার বিধি আছে।

শ্রীরঙ্গমজীউর অদ্ভুত কারুকার্য্যবিশিষ্ট সুন্দর মন্দিরের সম্মুখে একটী বৃহৎ তোরণদ্বার আছে। যদ্যপি কোন যাত্রী ছত্রবাটীতে না থাকিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই তোরণদ্বারের নিকট কিছু দক্ষিণা দিলেই বাসা ভাড়া পাওয়া যায়। এখানে অনেকগুলি ছত্রবাটী আছে, তথায় স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারা যায়, কিন্তু ছত্রবাটী হইতে দেবালয় অনেকদূরে অবস্থিত, এই কারণে আমাদের গোমস্তা ঠাকুরের উপদেশ মত এই তোরণদ্বারের নিকট একটী বাসা ভাড়া করিলাম।

এখানে মূলমন্দিরে উঠিবার একটী প্রশস্ত সোপান আছে, সেই সোপানের তোরণদ্বারের প্রাচীরটী দীর্ঘে অনূ্যন ২১ ফিট এবং প্রস্থে ৬ ফিট, উহা একটী প্রাকারে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ সাতটী প্রাকার এই মন্দির মধ্যে বিদ্যমান আছে। এই সকল প্রাকার মধ্যেই অতিথিশালা, ধর্ম্মশালা ও বসতবাটী দেখিতে পাইবেন। প্রথম হইতে তৃতীয় প্রাকার পর্য্যন্ত অবাধে সকলেই গমনাগমন করিয়া থাকেন, কিন্তু চতুর্থ দ্বারে কেবল হিন্দু ভিন্ন অপর কোন বিধর্ম্মী প্রবেশ করিতে পান না, তজ্জন্য পাহারার সুবন্দোবস্তও আছে।

শ্রীরঙ্গম মন্দিরে যে সাতটী প্রকোষ্ঠ আছে, তন্মধ্যে চারিটীতে ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও দেবালয়সম্পর্কীয় নানা লোক থাকেন। এইরূপ লোক এখানে অনূ্যন দশ হাজার আছে। বাহিরের প্রকোষ্ঠে বাজার, নানা দ্রব্যের দোকান, আর যাত্রীরাও থাকিতে পান। বলাবাহুল্য, এই বাহিরের প্রাকারটী সিকি ক্রোশেরও অধিক দীর্ঘ। সেই প্রাকার মধ্যস্থ সিংহদ্বারের চৌকাঠের বাজু পাথরের, উহা দৈর্ঘ্যে ২৭ হাত।

শ্রীরঙ্গমজীউর সুবৃহৎ গ্রামতুল্য মন্দিরটী যদি পাতি পাতি করিয়া দেখা যায়,তাহা হইলে সূর্য্যদেবের উদয়-অস্ত তিন-চারিদিনের কম সমস্ত দেখা শেষ হয় না। এই বিশাল বিস্তৃত মন্দিরটীর সীমা অনূ্যন দুই মাইল স্থান পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে। মূলমন্দিরে মোট ১৫টী গোপুর বা তোরণ দ্বার আছে ; ইহার মধ্যে সুসজ্জিত মণ্ডপগুলি নয়নগোচর হইলে এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরের রমণীয় দৃশ্য, দেবতার ঐশ্বর্য্য ও নানাপ্রকার বহু মূল্য অলঙ্কারে ভূষিত নারায়ণের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিলে মন যেন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। কি সুন্দর গঠন! কি সুন্দর প্রণালীতে শোভিত! শিল্পকারী মনের সাধে কি



শ্রীরঙ্গম মন্দিরের সম্মুখস্থ পথের দৃশ্য।

[১০৫ পৃষ্ঠা।

অদ্ভুত নৈপুণ্যে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টীর প্রশংসা করিব, যাহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, উহা বর্ণনা করিবার সময়, স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। এই সকল বিষয় একবার চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে পূর্ব্বে ভারতশিল্পীগণের পক্ষে অসাধ্য কিছুই ছিল না। মানবজীবন ধারণ করিয়া যিনি এই ভগবান শ্রীরঙ্গমজীউর মনোমুগ্ধকর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন না করিয়াছেন, তাঁহার জীবনই বৃথা। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত জগদ্বিখ্যাত সেই শ্রীরঙ্গমজীউর প্রকাণ্ড মন্দিরের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

প্রথম মহলের তোরণদ্বারটী পার হইলে শ্রীরঙ্গমজীউর রাংতার পাতের উপর গয়াধামে পাথরের উপর গদাধরের পাদপদ্মের ন্যায়, সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি দুই বা তিন পয়সায় খরিদ করিতে পাওয়া যায়; কিম্বা ভিতরে তৃতীয় মহলেও দোকানীদিগের নিকট এইরূপ মূল্যে খরিদ করিতে পারেন। এই প্রথম মহলে একটী প্রশস্ত রাস্তা দেখিতে পাইবেন, সেই রাস্তার দুই পার্শ্বে বহু লোকের বসতবাটী আছে। স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট সংবাদ পাইলাম যে, এখানে অন্যূন ১২০০ শত ঘর গৃহস্থের বাস আছে। এই মহলটী দৈর্ঘে ও প্রস্থে প্রায় এক মাইল, উচ্চে অন্যূন ত্রিশ হস্ত হইবে, কি অদ্ভুত ব্যাপার।

প্রথম মহল পার হইলেই দ্বিতীয় মহলে উপস্থিত হইবেন, এই দ্বিতীয় মহলটীতে কেবল ৬৮০ ঘর গৃহস্থ ব্রাহ্মণ বাস করেন এবং তাহার চারিধারে রাস্তার উপর কেবল বিদেশীয় গৃহস্থ ব্যবসায়ী দোকানীরা স্ত্রীপুত্র লইয়া বসবাস করিতেছেন, এইরূপ গৃহস্থ দোকানী এই মহলে প্রায় এক শত ঘর আছেন। তৎপরে তৃতীয় মহল—এই মহলের লোক সংখ্যা দ্বিতীয় মহলের ন্যায় হইবে। এই পর্য্যন্ত সকলেই অবাধে গমনাগমন করিতে পারেন। চতুর্থ মহলটী অন্যূন এক মাইল হইবে,

এই এক মাইল পথের মধ্যে তিনটী তোরণদ্বার আছে। ইহার পূর্ব্ব দিকের তোরণদ্বারটী উচ্চে প্রায় ১৫০ ফিট; উহার দৃশ্য অতি মনোহর। আর এই চতুর্থ মহলেই শত স্তম্ভযুক্ত একটী বৃহৎ মণ্ডপ শোভা পাইতেছে; ইহার সৌন্দর্য্য এবং সুশোভিত গঠন প্রণালী দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ করিতে হয়। এই সকল তোরণগুলি পার হইবার সময় এক-একবার মনে হয় যে, ইহা কি দেবালয়ে প্রবেশ করিতেছি,না এক-একটী ভিন্ন গ্রামে যাত্রা করিতেছি, কি বৃহৎ ব্যাপার, এরূপ যে কোথাও আছে পূর্ব্বে তাহা একবার আমি কল্পনাও করি নাই। অবগত হইলাম, মাঘ মাসে বৈকুণ্ঠ একাদশী তিথিতে শ্রীরঙ্গমজীউর এখানে যে ভোগমূর্ত্তি আছে, সেই ভোগ মূর্ত্তিটীকে এই মণ্ডপ মধ্যে আনীত হইয়া এই স্থানে উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, আর এই মণ্ডপের চারি ধারে যে বিস্তৃত পতিত জমি দেখিতে পাইবেন, ঐ জমির উপর বহু অর্থ ব্যয়সহকারে আটচালা প্রস্তুত হইয়া উৎসবকালে তাহার মধ্যে নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদ জনকক্রীড়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহার পর পঞ্চম প্রাকারে উপস্থিত হইবেন। এই প্রাঙ্গণটী চতুর্থ মহল অপেক্ষা সর্ব্বদিকে ছোট, কিন্তু এখানেও ঘন বসতি দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে সপ্তম প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে পর পর আয়তনে ছোট দেখিতে পাইবেন সত্য, কিন্তু ইহাদের সৌন্দর্য্য দেখিলে এক নূতন ভাবের উদয় হইতে থাকে। পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে যে কোন ম্লেচ্ছ বা অহিন্দু, এই চতুর্থ হইতে সপ্তম প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পান না। যদি কেহ ছদ্মবেশে কোনরূপে প্রবেশ করেন, আর যদি উহা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকে না; এই সকল অত্যাচার নিবারণকল্পে চতুর্থ হইতে সপ্তম দ্বার পর্য্যন্ত পাহারার সুবন্দোবস্ত আছে। এইরূপে সপ্তম প্রাকার বা প্রাচীর উত্তীর্ণ হইলে

যেন ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানের বৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত হইলাম, এইরূপ মনে হইবে।

মন্দিরাভ্যন্তরের স্তম্ভগুলি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়, এরূপ মনোহর ও উচ্চ স্তম্ভ এতাবৎকাল আর কোথাও দেখিতে পাই নাই। প্রত্যেক স্তম্ভে একটী অশ্বারোহী যোদ্ধৃগণের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে, ঐ মূর্ত্তিগুলি দূর হইতে দেখিলে যেন জীবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়। এইরূপ স্তম্ভ যে কত আছে, তাহা লেখনীর দ্বারা কত জানাইব। সে যাহা হউক, আবার এই সকল স্তম্ভের উপর কারুকার্য্যবিশিষ্ট মণ্ডপের ছাদ শোভা পাইতেছে। এই কারুকার্য্যের শিল্পনৈপুণ্য এবং স্থাপত্য বিদ্যা দর্শন করিলে নবাবী পছন্দ হার মানে, বোবার বোল ফুটে, অর্থাৎ এক মুখে কত বলিব, এক হাতে কত লিখিব, যাহা দর্শন করিকরিয়াছি—উহা অদ্ভুত, আশ্চর্য্য এবং ভয়ানক। এত দেশবিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কৈ! কখনও এমনটি দেখি নাই, তাই বলিতেছি যে দেবমহিমা কি অপর কোন বিষয়ের সহিত তুলনা হইতে পারে? যথায় স্বয়ং বৈকুণ্ঠপতি শ্রীরঙ্গমজীউ বিরাজমান, বিশ্বকর্ম্মা যাঁর আজ্ঞাবাহ, সেই পুরীর তুলনা কি লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায়। ধন্য প্রভু শ্রীরঙ্গমজীউ! ধন্য তোমার মহিমা! কতদিনে কত অর্থ ব্যয়সহকারে যে এই প্রশস্ত অদ্ভুত পুরীটী নির্ম্মিত হইয়াছে, উহা ভাবিলে সেই ধনকুবের, যাঁহার চেষ্টায় এবং উদ্যোগে ইহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহাকে শত সহস্রবার ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে। এরূপ বৃহৎ ব্যাপার ধরাতলে অন্য কোন স্থানে আছে বলিয়া অনুমান করা যায় না। ভগবান্! যদ্যপি আমাদের সহিত আপনার চেলারূপী গোমস্তাটী না পাঠাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আপনার এই পবিত্র পুরী আমাদের ভাগ্যে দর্শন লাভ হইত না—তাই আবার বলি, আপনার কৃপা না হইলে অর্থ

থাকিলেও কখন কেহ আপনার লীলা স্থান সকল দর্শন পান না। যাহা হউক, এইরূপে সপ্তম দ্বার পার হইয়া পুনরায় একটী প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম, তথায় সুবর্ণ কলস মূলমন্দিরের দ্বারে শোভা পাইতেছে, এই অষ্টম প্রাঙ্গণ মধ্যে ভগবান্ শ্রীরঙ্গমজীউ নানা অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া দেবালয়ের শেষ পর্য্যাঙ্কের উপর শয়ন করিয়া পাপীদিগকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন, তাঁহার নিম্নভাগে বহু মূল্য সিংহাসনোপরি ভগবানের পবিত্র ভোগ মূর্ত্তিটী দণ্ডায়মান থাকিয়া দেবালয়টী আলোকিত করিয়া আছেন। দেওয়ালের ও ভোগমূর্ত্তি, এই দুই মূর্ত্তিই উজ্জল কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। ভগবান্ শ্রীরঙ্গমজীউর অলঙ্কারের মধ্যে তাঁহার হস্তদ্বয়ে যে জরোয়া বালা জোড়াটী এবং কণ্ঠদেশে যে পদকখানি শোভা পাইতেছে, কেবল এই দুইটীর মূল্য ৪৫,০০০৲ হাজার টাকা। তদ্ভিন্ন বহু মূল্য হীরক, পান্না, স্বর্ণ ও চুনির বিস্তর গহনা আছে।

দেবতার সম্মুখে একটি গরুড় মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। ঐ গরুড়ের কি প্রেমপূর্ণ ভাব, কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের স্তুতি করিতেছে, কি মধুর ভাব! কি সুন্দর দৃশ্য! শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটী সোণার তালগাছ শোভা পাইতেছে। এই দেবালয়ে শ্রীরঙ্গমজী . শ্রীমূর্ত্তি ব্যতীত শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও অপরাপর বিস্তর দেবমূর্ত্তির দর্শন পাইবেন, কিন্তু গরুড়ের মূর্ত্তিটী এরূপভাবে প্রস্তুত ও এমনিভাবে দণ্ডায়মান আছে, যে দেখিলেই ভক্তির উদ্রেক হয়। জয়পুরে স্বাধীন রাজবাটীর দেবতা এবং ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া যে ভাব, যে গর্ব্ব, উদয় হইয়াছিল, এখানে শ্রীরঙ্গমজীউর পবিত্র মূর্ত্তি, দেবতার ঐশ্বর্য্য এবং দেবালয়ের বিশাল আয়তন দর্শন করিয়া সেই পূর্ব্ব ভাব পরিবর্ত্তন করিতে হইল। দক্ষিণ দেশে শ্রীরঙ্গমের দেবালয়ের ন্যায় বৃহৎ নন্দনানন্দদায়ক সৃষ্টি অতি অল্পই আছে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত বহু অর্থ ব্যয়সহকারে সেই



শ্রীরঙ্গম জীউর আদি ও ভোগ মূর্ত্তি।   [১০৯ পৃষ্ঠা।]

বিত্র শ্রীরঙ্গমনাথের এবং তাঁহার ভোগমূর্ত্তির একটী প্রেমপূর্ণ পবিত্র ত্তির চিত্র প্রদত্ত হইল।

শ্রীরঙ্গমের শ্রীমন্দির হইতে পূর্ব্বদিকে অর্দ্ধ মাইল দূরে জম্বুকেশ্বরের মূর্ত্তি দর্শন করিতে হইলে ত্রিচিনাপলী ফোর্ট নামক ষ্টেশনে অবতরণ রিয়া তথা হইতে প্রায় দুই মাইল পাকা রাস্তায় যাইতে হয়। ম্বুকেশ্বর ও শ্রীরঙ্গমজীউ এই দুই মন্দিরের ন্যায় কারুকার্য্যবিশিষ্ট ন্দির এবং ঐশ্বর্য্যশালী দেবালয় ত্রিচিনাপল্লীর সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ান আধিকার করিয়াছে, অতএব ভক্তগণ যদি এখানকার সমস্ত দেবন্দির দর্শন করিতে না পারেন, তাহা হইলে এই দুইটী দেবালয় র্ত্তব্যবোধে দর্শন করিবেন। জম্বুকেশ্বরের মন্দির মধ্যে মহাদেবের ঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির অন্যতম অপমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক রিবেন। মন্দিরের বাহিরে একটী ছোট কূপ আছে, সেই কূপ হইতে নবরত জল উঠিয়া দেবমহিমা প্রকাশ করিতেছে। মন্দিরাভ্যন্তরে র্ব্বদাই এক ফুট জল। ইহার পার্শ্বে একটী পুরাতন জম্বু বৃক্ষ দেখিতে াওয়া যায়। ভগবান মহেশ্বর এই জম্বু বৃক্ষতলে বহুদিন তপস্যা রিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি এখানে জম্বুকেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছেন। ই তীর্থে সুফলের নিয়ম আছে।

কাবেরী নদী

পুণ্যতোয়া কাবেরী নদীকে এখানে সকলে "গঙ্গা" সম্বোধন করিয়া থাকেন, কারণ এই নদী মহেশ্বরের বরপ্রভাবে গঙ্গার ন্যায় তীর্থ ফল প্রদান করিয়া থাকেন। দক্ষিণ ভারতে এই নদীই প্রধান—জনশ্রুতিগত, পবিত্রতা ও কৃষিকার্য্যের জলদানের এই নদীই একমাত্র ভরসা।

নদীটীর কিম্বদন্তী এইরূপ ;—

লোপমুদ্রা নামে ব্রহ্মার এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মা সেই কন্যাকে কবের মুনির কন্যা বলিয়া পৃথিবীতে পরিচিত করান, কারণ উক্ত মুনিই এই কন্যাকে তাঁহার আজ্ঞায় পালন করিয়াছিলেন। কন্যা বয়স্থা হইলে তিনি এই পালক পিতার মুক্তি কামনা করিয়া সর্ব্বপাপনাশিনী নদী হইবার মানস করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনায় রত হইলেন। মহেশ্বর তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া সেই নারীরত্নের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন, লোপমুদ্রা পূর্ব্ব সঙ্কল্পানুসারে সর্ব্বপাপনাশিনী নদী হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন মহেশ্বর সদয় হইয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন, অধিকন্তু তাঁহার নিজেরও মুক্তি উপায় প্রদান করিলেন। অসংখ্য পাপী এই নদীতে স্নান করিলে, তাহারা সকলেই বরপ্রভাবে মুক্ত হইবে—সন্দেহ

নাই, কিন্তু সেই পাপীদিগের স্নানহেতু তিনি নিজে যে পাপ সঞ্চয় করিবেন, তৎস্খলনার্থে বৎসরের মধ্যে একদিন কার্ত্তিক মাসে গঙ্গাদেবীকে মৃত্তিকাভ্যন্তর দিয়া এই কাবেরীর উৎপত্তি স্থলে উপস্থিত হইতে আজ্ঞা করিলেন, অর্থাৎ দেবীর শুভাগমনে তাঁহার সঞ্চিত পাপ নাশ হইবে।

ততলা কাবেরী নামক স্থানই এই নদীর উৎপত্তি স্থল এবং "ভাগমণ্ডল" নামক স্থান হইতে ইহার প্রথম উপনদী মিলিত হইয়াছে। এই দুই স্থানেই প্রাচীন মন্দির সমূহ অদ্যাপি অক্ষতদেহে বিদ্যমান রহিয়াছে। গঙ্গাদেবীর কৃপায় ও স্থান মাহাত্ম্যহেতু এখানে উক্ত দিনে দলে দলে ভক্ত নরনারীগণ স্নান করিয়া দেহ পবিত্র করিয়া থাকেন।

কুর্গপ্রদেশে কাবেরীর গতি অতি কষ্ট সঙ্কুল, নদীগর্ভ প্রস্তরময়, তীরভূমি উন্নত ও ঘন তরুরাজি পরিপূর্ণ। অনেক স্থলে ইহা ফল্গু নদীর ন্যায় হাঁটিয়া পার হওয়া যায়, কিন্তু বর্ষাকালে ইহার গভীরতা বিশ হইতে ত্রিশ ফিট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে, সেই সময় এই নদীর তরঙ্গস্রোত দর্শন করিলে প্রাণে আতঙ্ক হয়। এখানে ইহার অনেকগুলি উপনদী আছে। কাবেরী নদীর তীরে উপনীত হইলে দেখিতে পাইবেন, প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে দ্বিজগণ আহ্নিকের সময় তাঁহাকে স্মরণ করিতে থাকেন, ইহাতেই নদীর পবিত্রতা প্রকাশ পাইতেছে।

কুর্গ সহর হইতে এই পুণ্যসলিলা কাবেরী নদীর তটে গমনকালীন রাস্তার দুই পার্শ্বে অট্টালিকা শ্রেণীসমূহ দণ্ডায়মান থাকিয়া যেন ভক্তগণকে এই পুণ্য নদীর অর্চ্চনা করিতে উপদেশ প্রদান এবং আহ্বান করিতেছে। এখানে দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহ সকল বাস করিবার জন্য অল্প মূল্যে ভাড়া পাওয়া যায়। সহরটী নদীর উপরিভাগে অবস্থিত, সুতরাং স্থানটী স্বাস্থ্যকর। এই সহরের চতুর্দ্দিকে যে সকল নানাবিধ ফল, মূল সুবিধা দরে বিক্রয় হইতেছে দেখিতে পাইলাম, সেগুলি এত

বড় ও এত সুমিষ্ট যে স্বচক্ষে না দেখিলে বা আস্বাদ করিলে কাহারও বিশ্বাস হইবে না। এক-একটী পেয়ারা (আমরুত) যেন এক-একটী বাতাবী লেবুর ন্যায়, কলিকাতা সহরে সচরাচর আমরা যে ঝিঙ্গা দেখিয়া থাকি, এখানে সেই ঝিঙ্গা যেন কলিকাতার একটী চিচিঙ্গার মত লম্বা, এক-এক গাছি ইক্ষু যেন এক-একটী বড় তলদা বাঁশের ন্যায় দেখিতে, এই সকল ফল মূল হইতে স্থানটীর কিরূপ উর্ব্বরাশক্তি এবং স্বাস্থ্যকর তাহা সহজেই অনুমান করুন।

কাবেরী নদীর পশ্চিমতটে ব্রহ্মগিরি নামে যে পাহাড় আছে, সেই স্থান হইতে ইহা উত্থিত হইয়া প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখিনী হইয়া মহীশূর প্রদেশের অন্তর্গত তাঞ্জোর জেলার অভ্যন্তর দিয়া প্রবাহান্তর হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই সঙ্গম স্থানটী স্থানীয় হিন্দুদিগের নিকট "দাক্ষিণগঙ্গা" নামে প্রসিদ্ধ এবং ইহার তীরভূমিগুলিও গঙ্গার ন্যায় পবিত্র।

মহীশূর রাজ্যে কাবেরী নদী হইতে শ্রীরঙ্গপট্টম ও শিবসমুদ্রব নামে দুইটী দ্বীপের সৃষ্টি, অদ্যাপি যাত্রীগণ সেই পবিত্র স্থানটী দেখিতে পাইবেন। ত্রিচিনাপলির শ্রীরঙ্গমদ্বীপের ন্যায় ইহারাও পবিত্র বলিয়া খ্যাত। এ প্রদেশে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের প্রস্তর গ্রথিত সেতু এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

শিবসমুদ্রম দ্বীপের চতুর্দ্দিকে কাবেরীর জলপ্রপাতের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। এই স্থান হইতে নদীর স্রোত উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখিনী হইয়া দুইটী ধারা বহির্গত হইয়াছে। ইহার পশ্চিম ধারাটী "গগণচিক্কি" আর পূর্ব্বের ধারাটী "ভারচুক্কি" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত কাবেরীর জলপ্রপাতের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।



কাবেরী নদীর জলপ্রপাতের দৃশ্য।

[১১২ পৃষ্ঠা।

প্রথমোক্তটী আবার একটী ক্ষুদ্র দ্বীপের দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এই স্থানের স্রোত ভয়ানক গর্জ্জনসহকারে পাহাড়ের উপর বেগে পতিত হয়; উহা হইতেই মেঘাকার ফেণপুঞ্জের উদ্ভব করে এবং বাষ্পরাশি উঠিতে থাকে, কিন্তু পূর্ব্বদিকের ধারাটী অপেক্ষাকৃত শান্তমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় অধিবাসীদিগের নিকট অবগত হইলাম, বর্ষারম্ভে ইহা পর্ব্বত গাত্রে পদার্দ্ধ ক্রোশব্যাপীয়া বিস্তৃত হইয়া জলরাশি পাতিত করে। অন্য সময়ে প্রধান স্রোতঃ অশ্বখুরাকারে জলপাতন করিতে থাকে। যে স্থানে এই স্রোতদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গম স্থানের নাম "মেকোদাতু" বলিয়া খ্যাত আছে।

ত্রিচিনাপলীর প্রসিদ্ধ পাহাড়ের নিকট শ্রীরঙ্গম দ্বীপে কাবেরী নদী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে—উভয়েরই উপর ইষ্টক নির্ম্মিত সেতু আছে। যাত্রীগণ তথায় গমন করিলে অদ্যাপি সেই প্রাচীন সেতু দেখিতে পাইবেন। যাহা হউক, আমরা যে দুইদিন এখানে ছিলাম, সেই দুইদিনই এই পুণ্যসলিলা নদীতে স্নান করিয়া স্নিগ্ধ ও প্রীত হইয়াছিলাম।

বঙ্গদেশের গঙ্গার তীরভূমির ন্যায় কাবেরীর উভয় তীরে শস্যপূর্ণ শ্যামলক্ষেত্র, ধান্যশীষের দোলায়মান গুচ্ছরাশি, নারিকেলের নিকুঞ্জ কানন, গুবাক ও ফলভরাবনত কদলীবৃক্ষ সকল যেন প্রকৃতির ভূষণ স্বরূপ হইয়া রমণীয়তা ধারণ করিয়াছে। কি মধুর দৃশ্য! আবার ক্ষেত্রের শষ্পশয্যা, ঊর্দ্ধমুখে শয়ান, এ স্বভাবের শোভা দর্শন করিলে প্রাণ পুলকে উথলিয়া উঠিবে। প্রভাতের সেই বালারুণচ্ছটা, সন্ধ্যাগগণের সেই রক্তিম আভা, ঢলঢল সেই নব দুর্ব্বাদলময় প্রান্তরের সবুজলীলা, চারিদিকের সেই গাছপালার বিচিত্র হরিৎসমন্বয়, মাথার উপর মেঘের সেই বর্ষব্যাপিনী লীলাখেলা—নয়ন ভরিয়া, প্রাণ ভরিয়া দেখিবার

সামগ্রী, এই সকল নিরীক্ষণ করিলে আত্মহারা হইতে হয়। শীতল সমীরণের নিয়ত সরসর শব্দ, প্রভঞ্জনের স্বন্ স্বন্ স্বনন, সময়ে সময়ে পার্শ্বস্থ কুল্যার-কুলের কুলকুল রব, অজস্র বিহঙ্গকুলের বিচিত্র কাকলি, কিঞ্চিৎ উড্ডীয়মান পক্ষীর পক্ষপুটধ্বনি এবং বায়ুস্তর ভেদ করিয়া শন্ শন্ শব্দ ; আহা! স্বভাবের কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! এই সকল নয়নগোচর হইলে আনন্দে অধীর হইতে হয়। এইরূপে কাবেরী নদীর প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিয়া এখান হইতে কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর শোভা দর্শনের জন্য যাত্রা করিলাম।

কিষ্কিন্ধ্যাপুরী

ত্রিচিনাপল্লী ফোর্ট নামক বৃহৎ জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিয়া মান্দ্রাজ হইতে যে লাইনটী গণ্টাকুল জংশনের উপর দিয়া গিয়াছে, ঐ লাইনের সাহায্যে গণ্টাকুল নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। তৎপরে এখান হইতে সাউথ মারহাট্টা রেলযোগে হস্‌পেট নামক ষ্টেশনে যাত্রা করিয়া কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর শোভা দর্শন করিতে হয়। এই স্থানে বিস্তর পাণ্ডা আছেন, ইচ্ছানুসারে ঐ সকল পাণ্ডার মধ্যে একজনকে তীর্থগুরু মান্য করিয়া সঙ্গে লইবেন, কারণ কিষ্কিন্ধ্যা, ঋষ্যমূক, পম্পাসরোবর, তুঙ্গভদ্রানদী ও হাম্পিনগরে যতগুলি দেবতা আছেন, তাঁহাদিগের অর্চ্চনার জন্য একজন পূজারীর আবশ্যক, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ সকল দেবস্থানে বিগ্রহমূর্ত্তি বিরাজমান আছেন এবং নিত্যসেবারও বন্দোবস্ত আছে সত্য, কিন্তু যাত্রীদিগের অর্চ্চনার জন্য কোন পাণ্ডা বা পূজারী পাওয়া যায় না। অতএব যাত্রীগণ কর্ত্তব্যবোধে এই হস্‌পেট নগর হইতে একজন পাণ্ডা সংগ্রহ করিবেন। এই পাণ্ডা সঙ্গে থাকিলে তাঁহার দ্বারা দুই কার্য্যই সমাধা হইবে; একদিকে পথপ্রদর্শন অপ

দিকে দেবতার পূজা তাঁহারই দ্বারা সম্পন্ন হইবে, বিশেষতঃ কোন অপরিচিত স্থানে যাইবার সময় স্থানীয় একটী লোক থাকা যে কত উপকার, উহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন।

কিষ্কিন্ধ্যায় যতগুলি দেবালয় আছে, তন্মধ্যে বিরূপাক্ষ, রামস্বামী ও নৃসিংহস্বামীর দেবালয়ই প্রসিদ্ধ। হস্‌পেট ষ্টেশন হইতে সাত মাইল গো-যানে গমন করিলে হাম্পি নামে একটী নগর পাইবেন—তথা হইতে কিষ্কিন্ধ্যা, ঋষ্যমূক ও পম্পাসরোবর প্রভৃতি তীর্থ স্থানগুলির সেবা করিতে পাইবেন। পুণ্যতোয়া তুঙ্গভদ্রানদীর দক্ষিণ দিকের উপরিভাগে এই হাম্পি নগর শোভা পাইতেছে, আর বামভাগে ঋষ্যমূক পর্ব্বত বিরাজমান।

ঋষ্যমুক পর্ব্বত, হাম্পিনগর ও তুঙ্গভদ্রানদী কি কারণে পুণ্যস্থানে পরিণত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ত্রেতাযুগে ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব মহাবীর দ্যুতিমান ও ধৃতিমান শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্যপালন করিবার জন্য চৌদ্দ বৎসর বনবাস গমনে প্রস্তুত হইলে রামানুজ লক্ষ্মণ প্রিয় ভ্রাতাকে বনগমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহার অনুগমন করেন, তদ্দর্শনে শ্রীরামপ্রণয়িণী জনকবংশোদ্ভব দেবমায়া নির্ম্মিতা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না নারীশ্রেষ্ঠা। লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র দর্শন করিয়া রোহিণী যেমন নিশাকরের অনুগামিনী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাদ্গামিনী হইলেন। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ চিরপ্রথানুসারে বল্কল ও জটা পরিধান করিলেন, কিন্তু সীতাদেবী রাজা দশরথের ইচ্ছানুযায়ী এবং পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞানুসারে নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তাঁহার অনুগমন করেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর

সামগ্রী, এই সকল নিরীক্ষণ করিলে আত্মহারা হইতে হয়। শীতল সমীরণের নিয়ত সরসর শব্দ, প্রভঞ্জনের স্বন্ স্বন্ স্বনন, সময়ে সময়ে পার্শ্বস্থ কুল্যার-কুলের কুলকুল রব, অজস্র বিহঙ্গকুলের বিচিত্র কাকলি, কিঞ্চিৎ উড্ডীয়মান পক্ষীর পক্ষপুটধ্বনি এবং বায়ুস্তর ভেদ করিয়া শন্ শন্ শব্দ ; আহা! স্বভাবের কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! এই সকল নয়নগোচর হইলে আনন্দে অধীর হইতে হয়। এইরূপে কাবেরী নদীর প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করিয়া এখান হইতে কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর শোভা দর্শনের জন্য যাত্রা করিলাম।

কিষ্কিন্ধ্যাপুরী

ত্রিচিনাপলী ফোর্ট নামক বৃহৎ জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিয়া মান্দ্রাজ হইতে যে লাইনটী গণ্টাকুল জংশনের উপর দিয়া গিয়াছে, ঐ লাইনের সাহায্যে গণ্টাকুল নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। তৎপরে এখান হইতে সাউথ মারহাট্টা রেলযোগে হস্‌পেট নামক ষ্টেশনে যাত্রা করিয়া কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর শোভা দর্শন করিতে হয়। এই স্থানে বিস্তর পাণ্ডা আছেন, ইচ্ছানুসারে ঐ সকল পাণ্ডার মধ্যে একজনকে তীর্থগুরু মান্য করিয়া সঙ্গে লইবেন, কারণ কিষ্কিন্ধ্যা, ঋষ্যমূক, পম্পাসরোবর, তুঙ্গভদ্রানদী ও হাম্পিনগরে যতগুলি দেবতা আছেন, তাঁহাদিগের অর্চ্চনার জন্য একজন পূজারীর আবশ্যক, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ সকল দেবস্থানে বিগ্রহমূর্ত্তি বিরাজমান আছেন এবং নিত্যসেবারও বন্দোবস্ত আছে সত্য, কিন্তু যাত্রীদিগের অর্চ্চনার জন্য কোন পাণ্ডা বা পূজারী পাওয়া যায় না। অতএব যাত্রীগণ কর্ত্তব্যবোধে এই হস্‌পেট নগর হইতে একজন পাণ্ডা সংগ্রহ করিবেন। এই পাণ্ডা সঙ্গে থাকিলে তাঁহার দ্বারা দুই কার্য্যই সমাধা হইবে; একদিকে পথপ্রদর্শন অপর

দিকে দেবতার পূজা তাঁহারই দ্বারা সম্পন্ন হইবে, বিশেষতঃ কোন অপরিচিত স্থানে যাইবার সময় স্থানীয় একটী লোক থাকা যে কত উপকার, উহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন।

কিষ্কিন্ধ্যায় যতগুলি দেবালয় আছে, তন্মধ্যে বিরূপাক্ষ, রামস্বামী ও নৃসিংহস্বামীর দেবালয়ই প্রসিদ্ধ। হস্‌পেট ষ্টেশন হইতে সাত মাইল গো-যানে গমন করিলে হাম্পি নামে একটী নগর পাইবেন—তথা হইতে কিষ্কিন্ধ্যা, ঋষ্যমূক ও পম্পসরোবর প্রভৃতি তীর্থ স্থানগুলির সেবা করিতে পাইবেন। পুণ্যতোয়া তুঙ্গভদ্রানদীর দক্ষিণ দিকের উপরিভাগে এই হাম্পি নগর শোভা পাইতেছে, আর বামভাগে ঋষ্যমূক পর্ব্বত বিরাজমান।

ঋষ্যমুক পর্ব্বত, হাম্পিনগর ও তুঙ্গভদ্রানদী কি কারণে পুণ্যস্থানে পরিণত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ত্রেতাযুগে ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব মহাবীর দ্যুতিমান ও ধৃতিমান শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্যপালন করিবার জন্য চৌদ্দ বৎসর বনবাস গমনে প্রস্তুত হইলে রামানুজ লক্ষ্মণ প্রিয় ভ্রাতাকে বনগমনোদ্যত দেখিয়া তাঁহার অনুগমন করেন, তদ্দর্শনে শ্রীরামপ্রণয়িনী জনকবংশোদ্ভব দেবমায়া নির্ম্মিতা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না নারীশ্রেষ্ঠা। লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র দর্শন করিয়া রোহিণী যেমন নিশাকরের অনুগামিনী হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্রের পশ্চাদ্গামিনী হইলেন। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ চিরপ্রথানুসারে বল্কল ও জটা পরিধান করিলেন, কিন্তু সীতাদেবী রাজা দশরথের ইচ্ছানুযায়ী এবং পুরোহিত বশিষ্ঠদেবের আজ্ঞানুসারে নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া তাঁহার অনুগমন করেন। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর

যখন তাঁহারা পঞ্চবটী বনে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় লঙ্কেশ্বর রাজা দশাননের ভগ্নী "শূর্পনখা" সেই অজানুলম্বিত নবজলধর পিতাম্বর রঘুবরের অপরূপরূপমাধুরী মূর্ত্তি দর্শনে কামাতুর হইয়া নবযৌবনসম্পন্না সুন্দরীবেশে শ্রীরামসন্নিধানে গমন করেন।

অন্তর্যামী ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এই রাক্ষসীর মায়া এবং তাহার মনোগত কুভাব অন্তরে অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। শূর্পনখা তখন মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, এই সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা সুন্দরী যতদিন এই বীর পুরুষের সহিত একত্রে থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত কিছুতেই তাহার মনস্কামনা সিদ্ধি হইবার উপায় নাই, অতএব কোনরূপে ইহাকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে—এইরূপ যুক্তি করিতেছেন, এমন সময় দূরে রামানুজ লক্ষণদেবকে একাকী দর্শন করিয়া তিনি তাঁহার নিকট গমন করতঃ আপন কুঅভিলাষ প্রকাশ করিলেন, তৎশ্রবণে লক্ষ্মণ কুপিত হইয়া ঐ মায়ারূপধারিণী শূর্পনখা সুন্দরীর নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া জগৎকে এই শিক্ষা প্রদান করিলেন যে কোন পরপুরুষের সহিত কোন অপরিচিত কামিনীর সহবাস নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি ইহাতেও তিনি উত্তেজিত হন, তাহা হইলে পরিণামে তাহাকে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।

শূর্পনখা এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়া লক্ষ্মণকে শাসন করিবার অভিপ্রায়ে তাহার প্রধান সেনাপতিদ্বয় খর ও দূষণকে সসৈন্যে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিলে, কালসম লক্ষ্মণের বাহুবলে তাহারা সকলেই নিহত হইল, তদ্দর্শনে শূর্পনখা ক্ষোভে, ক্রোধের বশবর্ত্তিনী হইয়া অগ্রজ লঙ্কাধিপতি রাবণের শরণাপন্ন হইলেন এবং নানাপ্রকার প্রলোভনবাক্যে সীতাদেবীর সৌন্দর্য্যমাধুরী প্রকাশ করিতে করিতে তাঁহাকে স্বীয়পুরে হরণ করিয়া আনিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

কালপ্রভাবে দশানন ভগ্নীর নিকট সীতার অপরূপরূপমাধুরীর পরিচয় পাইয়া হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া মারীচসহ পূর্ব্বকথিত আশ্রমপদে উপনীত হইলেন। অনন্তর মারীচ মায়াপ্রভাবে রাজকুমারদ্বয়কে দূরে আনয়ন করিলে রাবণ রাজা শ্রীরামপত্নী সীতাদেবীকে একাকী পাইয়া নিঃসহায় অবস্থায় নানাপ্রকার ছলনা প্রকাশে তাঁহাকে হরণ করিয়া মনের সুখে লঙ্কাপুরে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে গৃধ্ররাজ জটায়ু সীতাদেবীর পরিচয় পাইয়া রাবণের গর্হিত কার্য্যে বাধা দিবার জন্য প্রাণপণে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে মৃতপ্রায় হইলেন, তখন রাজা পূর্ণ উৎসাহে আপন পুরে উপস্থিত হইয়া অশোকবনে দেবীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

এদিকে অনুজ লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র শূন্য আশ্রম দর্শন করিয়া মৈথিলী অপহৃতা হইয়াছে জানিতে পারিলেন এবং যার পর নাই শোকার্ত্ত হইয়া আকুলচিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। রঘুবীর হতাশপ্রাণে সীতার অন্বেষণ করিবার সময় নিবিড় বনমধ্যে এক স্থানে পিতৃসখা জটায়ুর নিকট মূর্চ্ছাবস্থায় দেবীর সন্ধান পাইলেন। ধর্ম্মাত্মা জটায়ু শ্রীরাম স্থানে দেবীর সন্ধান প্রদানপূর্ব্বক আপন প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তখন শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং জটায়ুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সীতার উদ্ধার মানসে লক্ষ্মণসহ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে পম্পা নদীতীরে বানররূপী হনুমানের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তৎপরে ঐ হনুমানের বচনে সুগ্রীবের সহিত পরিচয় হইল। মহাবীর রঘুনন্দন নিজের অবস্থা আনুপূর্ব্ব সমস্ত সুগ্রীবকে প্রকাশ করিলেন, বিশেষতঃ সীতারও আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন এবং প্রমাণস্বরূপ হনুমানের নিকট দেবীর যে সকল চিহ্নস্বরূপ অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও সুগ্রীবকে দেখাইলেন।

মহাকপি সুগ্রীব শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করণান্তর অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাঁহার সহিত সখ্যতাসূত্রে বদ্ধ হইলেন। কপিবর নিজে প্রণয়-বশতঃ বানররাজ বালির সমস্ত বৈরীভাব অতি দুঃখভরে তাঁহার নিকট নিবেদন করিলে রঘুনন্দনও তৎসমক্ষে বালিবধের প্রতিজ্ঞা করিলেন। বানর, বালির বলের বিষয় সর্ব্বদাই বলিতেন এবং রাঘবের বীর্য্য বিষয় সদাই সন্দেহ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা সুগ্রীব তাঁহার বল প্রত্যয়ের জন্য মহাপর্ব্বত সদৃশ দুন্দভির উত্তম দেহ সন্দর্শন করাইলেন। অন্তর্যামী মহাবল মহাবাহু শ্রীরামচন্দ্র তাহার অন্তরের ভাব অবগত হইয়া ঐ অস্থি দর্শনমাত্র পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই পর্ব্বতপ্রমাণ শুষ্ক দেহ দশ যোজন দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং পুনর্ব্বার বাণ দ্বারা সপ্ততাল ভেদ করিলেন। এইরূপে বাণ সপ্ততাল ও গিরি ভেদ করতঃ রসাতলে প্রবেশ করিল, তদ্দর্শনে রাঘবের বলের বিষয় সুগ্রীবের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল।

অনন্তর পিঙ্গলবর্ণ মহাকপি শ্রীরামবলে বলীয়ান হইয়া সিংহনাদে বালিকে পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থে আহ্বান করিলে কপীশ্বর বালি ঐ নিনাদ আকর্ণন করিয়া ক্রোধে উন্মত্তসহকারে মহিষী [illegible]র উপদেশ বাক্য উপেক্ষাপূর্ব্বক সুগ্রীবের সহিত সংগ্রামে প্র[illegible]ও হইলেন, সেই সময় রাঘব সুগ্রীবের বাক্যানুসারে এক শরে বালিকে বিনাশ করিয়া ঐ শূন্য সিংহাসনে সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এইরূপে সুগ্রীব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জনক দুহিতার অন্বেষণার্থে পৃথিবীর চারিদিকে বানরবৃন্দকে প্রেরণ করিলেন। মহাবলী হনুমান গৃধ্র সম্পাতির উপদেশ মত শত যোজন বিস্তীর্ণ লবণ সমুদ্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক একাকী অকুতোভয়ে রাবণ পালিতা লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিয়া অশোক বনোপবিষ্টা চিন্তাকুলা সীতাদেবীকে বন্দনাপূর্ব্বক বৈদেহীকে অভিজ্ঞান

সূচক নিদর্শন প্রদর্শনসহকারে তাঁহার অন্বেষণবার্ত্তা বিজ্ঞাপন করিল এবং আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিয়া মহাত্মা রাঘবের নিকট যুক্তকরে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিষয় এবং সীতাদেবীর কুশলবার্ত্তা প্রদান করিল। তখন শ্রীরামচন্দ্র সীতার উদ্ধারকল্পে সুগ্রীবের যাবতীয় বীর-কপি সৈন্য সমভিব্যাহারে মহা সমুদ্রতীরে উপনীত হইলেন এবং আদিত্যসন্নিভ শর দ্বারা সমুদ্র বিক্ষোপিত করিতে লাগিলেন। সরিৎ-পতি ভগবানের আগমনবার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং সপরিপারে উত্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনাপূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধির জন্য এই মহা সমুদ্রের উপরে সেতুবন্ধন করিতে যুক্তিপ্রদান করিলেন, অধিকন্তু যদ্বারা তাঁহার অধীনস্থ যাবতীয় কপি সৈন্যগণ অনায়াসে পরপারে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সাগর আরও বলিলেন যে, এই সেতুবন্ধনকালে তিনি সলিলোপরি ভাসবান থাকিয়া সাধ্যমত তাঁহার সাহায্য করিবেন, এইরূপ পরামর্শ প্রদানপূর্ব্বক তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র নামে রাবণ বধার্থে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া সসৈন্যে সমুদ্রতীরে সীতাদেবীর উদ্ধারের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন, এই ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকন করিয়া লঙ্কেশ্বর রাজা দশাননকে বিনীতভাবে সীতাদেবীকে শ্রীরামকরে প্রত্যার্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কালের গতি কে রোধ করিতে পারে, কনিষ্ঠের সেই উপদেশ বাক্য শ্রবণে রাবণ কুপিত হইয়া তাহাকে পদা-ঘাত করিয়া অপমানপূর্ব্বক স্বর্ণপুরী লঙ্কা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এইরূপে বিভীষণ সমুদ্রের পরপারে যথায় সেই পরম পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র সসৈন্যে বিরাজ করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনাপূর্ব্বক তাঁহারই শরণাপন্ন হইয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিতে

লাগিলেন। এই সঙ্কট সময় যে যে স্থানে রঘুবীর দেবীর সন্ধানের জন্য পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানই পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে।

বিরূপাক্ষ দেব

বিরূপাক্ষ দেব—এখানে পম্পবতীশ্বর নামে বিরাজ করিতেছেন। এই শিবালয়ের সম্মুখে একটী কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত প্রশস্ত মণ্ডপ আছে। ঐ মণ্ডপের সম্মুখে যে একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাইবেন, প্রথমে তাহাতে স্নান করিয়া দেব দর্শন করিতে হয়। শিবালয়ের সম্মুখস্থ যে তোরণদ্বার আছে, তাহার দুই পার্শ্বে পান্থশালা বিরাজমান। দেবালয়ের এই সকল শোভা দর্শন করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত পার্শ্ব দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলেই পুণ্যসলিলা তুঙ্গভদ্রানদীর তীরে পৌছিতে পারা যায়, তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীরামস্বামীর শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক করিবেন। রামস্বামী, বৈষ্ণবদিগের একটী পুণ্য তীর্থ। ইহার অপরপারে ঋষ্যমুখ পর্ব্বত, এই পর্ব্বতের উপর বায়ুবণিতা অঞ্জনা দেবী যে স্থানে হনুমানকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেই স্থানে একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ মন্দির মধ্যে অঞ্জনা-স্বামীর একটী বিগ্রহ মূর্ত্তি দর্শন পাইবেন। এই পর্ব্বতের নিম্নভাগে যে একটী গুহা দেখা যায়—প্রবাদ আছে, ঐ গুহার মধ্যে বানররাজ বালির ভয়ে সুগ্রীব, হনুমান ও জাম্বুবানাদির সহিত লুকাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতেন। এই স্থানেই পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সুগ্রীবের সীতা সম্বন্ধে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল ও সুগ্রীব সীতা উদ্ধার করিবেন, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই স্থানটী কিষ্কিন্ধ্যার পরিবর্ত্তে আনিগন্ধি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

হনুমান ও সুগ্রীবের নিকট সীতাদেবীর যে সমস্ত অলঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্দর্শনে এই স্থানেই শ্রীরামচন্দ্রের সীতাবিরহ শোক শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, তখন তিনি নিকটস্থ তুঙ্গভদ্রানদীতে স্নান করিয়া সেই শোকের অবসানপূর্ব্বক, এই নদীর দক্ষিণ তীরে এক স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, সেই বিশ্রাম স্থানই "রামস্বামী" নামক তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

এই তুঙ্গভদ্রানদীতে নামিবার জন্য সমতলভূমি হইতে কোনরূপ বাঁধা ঘাট বা সোপান নাই। পার্ব্বত্য স্থান বলিয়া অনেকগুলি বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড সজ্জিত থাকায় উপর হইতে নীচে নামিতে যাত্রীদিগকে বিশেষ কোনরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। তুঙ্গভদ্রার স্রোত যখন ঐ সকল প্রস্তর খণ্ডের উপর ঘাতপ্রতিঘাত করিতে থাকে, তখন সেই শ্রুত মধুর কল্লোলধ্বনি শ্রবণে আনন্দ হয়। এখানে যে একটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে শ্রীরাম সীতার পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক করিবেন। এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইলে চিরপ্রথানুসারে শ্রীরাম স্বামীর অর্চ্চনা করিবার পর ভগবানের সম্মুখে একটী নারিকেল ফাটাইয়া পূজা প্রদান করিতে হয়। স্থানটী অতি নির্জ্জন, এই হেতু বহু সাধু সন্ন্যাসীকে এই স্থানে তপস্যা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

সন্ধ্যাকালে এই তুঙ্গভদ্রাতীরে যখন ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত স্তোত্র পাঠ করিতে থাকেন, সেই সময় এক রমণীয় মধুর শ্রুতি শব্দ উত্থিত হইতে থাকে। ঐ স্তোত্র পাঠ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হয়। রামস্বামীর মন্দির হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে ভগবান নরসিংহ স্বামীর মন্দির বিরাজমান। এই মন্দিরটী প্রাচীনকালের প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু বে-মেরামতি অবস্থায় থাকায় ক্রমশঃ ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইতেছে। ইহার অনতিদূরে "নরপতি" রাজগণ কৃত যে

সেতুস্তম্ভ আছে, উহার কারুকার্য্য এবং শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিতে ভুলিবেন না। সন্নিকটেই তারাগড়, বালিকুট, অঙ্গদকূট ও শৃঙ্গগিরি বিদ্যমান থাকিয়া মোহান্ধ মানবগণকে একমাত্র ব্রহ্মকে ভজনা করিতে উপদেশ দিতেছে। উপরোক্ত যে সকল স্থান প্রকাশিত হইল, এই সমস্ত স্থানগুলিই কিষ্কিন্ধ্যাপুরী নামে প্রসিদ্ধ। এখানে দুইটী ছত্রি আছে, একটীতে শ্রীরামচন্দ্র যেরূপে বানররাজ বালিকে বধ করিয়াছিলেন, অপরটীতে সুগ্রীবকে যেরূপে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই দুই প্রকার চিত্র মূর্ত্তি দর্শন পাইবেন।

কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর এই স্থান হইতে এক ক্রোশ দূরে পম্পা সরোবর দেখিতে পাইবেন। এই পুণ্য সরোবরটীর চতুর্দ্দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানশ্রেণীতে শোভিত আছে। ঋষ্যমূক পর্ব্বতের যে অংশ তুঙ্গভদ্রা-নদীর বামতীরে অবস্থিত, তাহারই মধ্যে পর্ব্বতশ্রেণীর ভিতরে এই পম্পা সরোবরটী অবস্থিত। এই পম্পাতীরে অসংখ্য হংস, চক্রবাক ও জলকুক্কুট প্রভৃতি জলচর পক্ষীসমূহে পরিবৃত থাকিয়া প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে যাত্রীদিগের প্রাণে আনন্দোৎপাদন করিতে থাকে। যাঁহাকে ভগবান কৃপা করিবেন, তিনিই এই সকল অনির্ব্বচনীয় শোভা দর্শন লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। ইহার নিকটেই মাতঙ্গ সরোবর। এই দুইটী পুণ্য সরোবরই দেখিতে এখানকার পুষ্করিণীর ন্যায়।

মাতঙ্গ সরোবরের তীরে "মাতঙ্গ" নামে এক ঋষির আশ্রম স্থান ছিল, ঐ ঋষির নাম অনুসারে এই সরোবরটীর নাম মাতঙ্গ সরোবর হইয়াছে।

ভারতের চারিদিকে যেরূপ চারি ধাম প্রসিদ্ধ আছে, সেইরূপ চারি দিকে চারি সরোবরও প্রসিদ্ধ আছে, যথা;—উত্তরে মানস সরোবর, পূর্ব্বে ভুবনেশ্বর তীর্থে বিন্দুসরোবর, দক্ষিণে এই পম্পা সরোবর ও

পশ্চিমে দ্বারকায় (কচ্ছদেশে) নারায়ণ সরোবর। এই চারি সরোবরে ভক্তিভাবে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান, পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিলে বহু পুণ্য সঞ্চয় হয়।

পম্পা সরোবরের উপরিভাগে পম্পেশ্বর মহাদেবের একটী বৃহৎ মন্দির শোভা পাইতেছে। ঐ শিবালয়ের মধ্যে যাত্রীদিগের বাসো-পযোগী ধর্ম্মশালা বা বিশ্রাম স্থান ভাড়া পাওয়া যায়। এই মহাদেবের দেবালয়টী অন্যূন এক ক্রোশ স্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার মধ্যে দুইটী মহল দেখিতে পাইবেন। প্রথম মহলে প্রধান তোরণের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। ঐ প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বেই পৃথক পৃথক গৃহমধ্যে দেবতা-দিগের উৎসবমণ্ডপ সকল শোভা পাইতেছে। দ্বিতীয় মহলটী অপেক্ষাকৃত ছোট, এই মহলেই ভগবান পম্বেশ্বর মহাদেব বিরাজ করিতেছেন; সম্মুখেই দেববাহন একটী বৃষ মূর্ত্তির দর্শন পাইবেন। এই স্থানের দেয়ালে নানা রঙ্গে রঞ্জিত ভিন্ন ভিন্ন দেবতার চিত্র অঙ্কিত আছে। ইহার পশ্চিম দিকে যে একটী ফটক দেখিতে পাইবেন, সেই ফটকের ভিতর দিয়া তুঙ্গভদ্রানদীতে স্নান করিতে যাইতে হয়। এইরূপে এখানকার এই সকল তীর্থ দর্শন করিয়া বাসাবাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম, একটী ঘরে আমাদের ন্যায় কতকগুলি বিদেশী একটী রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন, অনুসন্ধানে অবগত হইলাম, রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ মন্দের দিকে দাঁড়াইতেছে, তখন পূর্ব্বপরিচিত আমাদের সেই গোমস্তাটীকে এখান হইতে রামেশ্বর তীর্থে যাইবার জন্য বারম্বার জেদ করিতে লাগি-লাম, কিন্তু হায়! সকলই বৃথা হইল, কারণ আমরা যতবারই তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম, ততবারই তিনি উত্তর করিলেন, "বাবুজি! আপ-নারা কলিকাতায় থাকেন, ইচ্ছা করিলেই এত দূরদেশে এই সকল তীর্থ স্থানে আসিতে পারিবেন না, এই নিমিত্ত বলিতেছি, যদ্যপি ভাগ্যক্রমে

এই দূরদেশে আসিয়াছেন, তবে এখানকার প্রধান স্থান সকল দর্শন না করিবেন কেন ?”

তাঁহার সেই উত্তেজিত বাক্যে দলস্থ রমণীগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন, কিন্তু আমার ভাল বোধ হইল না। আমি বিরক্তভাবে তাঁহাকে বলিলাম, “ঠাকুর! কেবল এ দেশ ও দেশের শোভা দর্শন করিতে করিতে আমাদের সমস্ত টাকা ব্যয় হইতে লাগিল, কিন্তু যাঁর দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া সংসারের কত বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক কত অর্থ ব্যয়সহকারে বাটী হইতে যাত্রা করিয়াছি, সেই পরম পুরুষ ভগবান্ রামেশ্বরজীউকে যত শীঘ্র পারেন, দর্শনদান করান, ইহাতেই আমরা সকলে সৌভাগ্য বোধ করিব।”

এত তর্কবিতর্কের পর তিনি উত্তর করিলেন, “আচ্ছা এবার আপনাদের কথামত এখানে মহীষাশূর রাজ্যের রাজপ্রাসাদ ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত চামুণ্ডাদেবীর দর্শন করাইয়া নিশ্চয়ই এখান হইতে রামেশ্বর তীর্থে যাত্রা করিব। অগত্যা আমরা সকলেই তাঁহার প্রস্তাবে রাজি হইলাম,কিন্তু আন্তরিক ইচ্ছা যে, এখান হইতে অপর কোন স্থানে না যাইয়া বরাবর রামেশ্বর তীর্থে গোমস্তাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গমন করি, আবার পরক্ষণেই ভাবিলাম, এই যে অপরিচিত স্থানে আসিয়াছি—তাহার দূরতা, রেলে টিকিট খরিদ করিবার সময় ক্লেশ-ভোগ, মোট গাঁটরীর জন্য কুলীদিগের তোষামোদ ও লাঞ্ছনাভোগ এবং জংশন রেলষ্টেশনে কোন্ গাড়ী হইতে কোন্ গাড়ীতে ভুলক্রমে উঠিয়া বিপদাপন্ন হইব, এই সকল বিষয় যত চিন্তা করিতে লাগিলাম, মনমধ্যে ততই ভয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এমন কি মনে হইতে লাগিল, যেন অন্তিম সময়ে এই দূরদেশ যমের বাড়ী আসিয়াছি। স্বদেশ হইতে কত দূরে আসিয়াছি, উহা একবার চিন্তা করিবার সময় প্রাণ শিহরিয়া

উঠিতে লাগিল। আবার একদিকে ভাবিলাম, ভগবান্ কি আবার কথন এই পবিত্র স্থানে আসিবার সুযোগ দিবেন? গোমস্তা ঠাকুর উচিৎ কথাই বলিয়াছেন, অতএব যত দূর পারি, উহা সহ্য করিয়া তাঁহার উপদেশ পালন করিবার চেষ্টা করি। এই সকল বিবেচনা করিয়া, পর দিন প্রাতে মহীশূর রাজ্যে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

মহীশূর

কিষ্কিন্ধ্যা হইতে মহীশূরপ্রদেশে যাইতে হইলে প্রথমে গণ্টাকুল জংশন ষ্টেশনেই উপস্থিত হইতে হয়। তৎপরে সাউথ মারহাট্টা রেল-ওয়ের অন্তর্গত মহীশূর ষ্টেট রেলওয়ে লাইনে মহীশূর নামক বৃহৎ ষ্টেশনে পৌছিতে হয়। এই ষ্টেশনটী এ লাইনের একটী বিখ্যাত ও বেশ বড় ষ্টেশন। আহারীয় নানাপ্রকার দ্রব্য এখানে সুবিধা দরে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে এই স্থানে দুর্দ্ধর্ষ মহিষাসুরের রাজধানী ছি[illegible] এই অসুরের অধিষ্ঠাত্রী স্বয়ং "দেবীভবানী" তাঁহার একমাত্র [illegible]র ছিলেন। এই দেবীর শক্তিবলে বলীয়ান হইয়া অসুররাজ দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতি কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, সকলেই তাঁহার ভয়ে ত্রাসিত হইতেন। একদা এই অসুর কামবাণে মত্ত হইয়া এক কুলকামিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া যখন তাহার উপর পাশব অত্যাচার করিতেছিলেন, সেই সময় ঐ নারীরত্ন ভয়ার্দ্ধচিত্তে ভগবতীর শরণাপন্ন হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। স্বয়ং সতী যথায় বিরাজমান, তথায় কুললক্ষ্মী সতীর অপমান তিনি কি কখন সহ্য করিতে পারেন? এই রমণীর করুণ আর্ত্তনাদে তাঁহার আসন টলিল, এমন সময় মাভৈ! মাভৈ! রবে

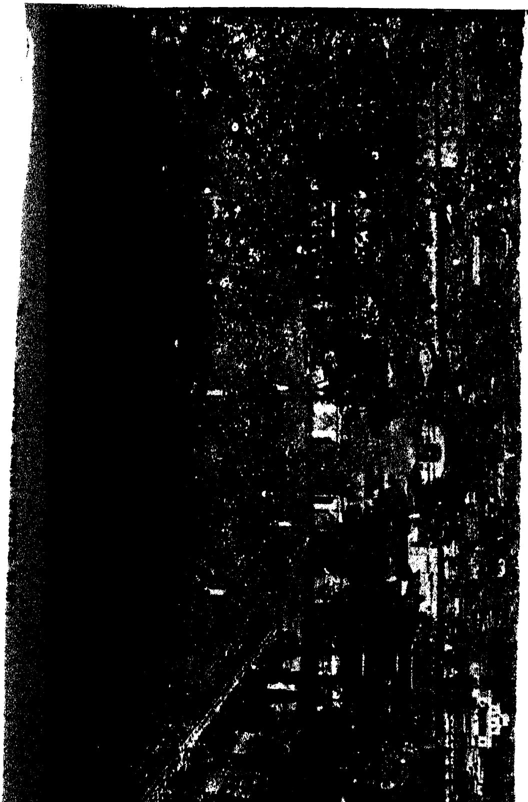
তুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, তথাপি অসুররাজের জ্ঞানোদয় ইল না। রাজার এই অত্যাচারের জন্য তখন তিনি রোষভরে রণ-ঙ্গিনীবেশে অষ্টভুজা সংহারমূর্ত্তিতে সেই দুর্জ্জয় অসুররাজকে বিনাশ-র্ব্বক সকলকে এই শিক্ষাদান করেন যে, কখন যেন কেহ কোন সতী মণীর প্রতি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া অত্যাচার না করে। তৎপরে াজপুরী হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া স্থানীয় চামুণ্ডা নামক পর্ব্বতের শিখর-েশে দেবী বিশ্রাম করিতে থাকেন। এই পর্ব্বতের নিম্নদেশে বর্ত্তমান াজধানী অবস্থিত। সন্নিকটেই একটী সুন্দর বাটী গভর্ণমেণ্ট হইতে ্রয়োজিত হইয়া রেসিডেণ্ট মহোদয়ের বাস ভবন নামে শোভা পাই-তেছে। এই রেসিডেণ্ট হাউসের সৌন্দর্য্য দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে য়। সহরের পথগুলি পরিষ্কার ও প্রশস্ত, এই সহরের দক্ষিণদিকে কটী দুর্গ আছে, উহার চারিধারে দৃঢ়ভাবে প্রশস্ত প্রাচীর দ্বারা পরি-বষ্টিত, অদ্যাপি যেন নবজীবনে আতিথ্যের পূর্ব্ব গৌরব প্রকাশ করি-তেছে। এই দুর্গ মধ্যেই রাজপ্রাসাদ, তথায় তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে সপরি-ারে বাস করিয়া থাকেন। প্রাসাদের সম্মুখেই বৃহৎ প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের ম্মুখেই দ্বিতল প্রাসাদ, উহা "নবরাত্র মহল" নামে শোভা পাইতেছে। েখানে একখানি রৌপ্যনির্ম্মিত সিংহাসন আছে, এতদ্ভিন্ন আরও বহু-বধ মূল্যবান সামগ্রী সজ্জীকৃত আছে। এই নবরাত্র মহলের প্রবেশ ারটী চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত এবং গজদন্তের কারুকার্য্যে শোভিত। বগত হইলাম, এই গৃহটীতে রাজা গুপ্তভাবে ইচ্ছামত বিশ্রাম করেন। াহার পর "দশহরা" নামক প্রকাণ্ড দরবার গৃহ দেখিতে পাইবেন, াই দরবার গৃহে এক রত্নসিংহাসনোপরি রাজা উপবেশনপূর্ব্বক প্রজা-ন্দের শুভাশুভ বিচার করেন। এই প্রাসাদের "অশ্ববিলাস" নামক হলে কেবল বহু মূল্য ছবিতে সুশোভিত আছে। ইহার পরই দেবা-

লয় মহল, তথায় চামুণ্ডাদেবী ও নৃসিংহদেবের পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন পাইবেন।

মহীশূর রাজ্যে উপস্থিত হইলে মহারাজের রাজপ্রাসাদ এবং উদ্যান বা গ্রীষ্ম ভবনটীর অদ্ভুত সুসজ্জিত শোভা দর্শন করিতে ভুলিবেন না। এখানে বৈদ্যুতিক আলোকের বন্দোবস্ত আছে এবং এরূপ সুন্দর সুন্দর আশ্চর্য্য দ্রব্য সকল দেখিতে পাইবেন, যদ্দ্বারা মনে প্রীতি অনুভব হয়। এখানে রাজার বিস্তর সৈন্য বর্ত্তমান থাকিয়া রাজ্যের শোভা বর্দ্ধিত করিয়া আছে। যাহারা জয়পুর রাজভবন গিয়াছেন, তাঁহারা তথায় যেরূপ অশ্বশালা, হস্তীশালা, উঠশালা, গোশালা প্রভৃতি দেখিয়াছেন, এখানেও ঠিক সেইরূপভাবে উহাদিগকে সজ্জিত দেখিয়া কত আনন্দ অনুভব করিবেন। পাঠকবর্গের প্রীতির জন্য মহীশূর রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ রাস্তার একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল।

চামুণ্ডাদেবীর মন্দির

মহীশূর রাজভবন হইতে চামুণ্ডা পাহাড় অন্যূন এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপরিভাগে চামুণ্ডাদেবীর প্রকাণ্ড মন্দির শোভা পাইতেছে। সমতলভূমি হইতে পাহাড়টী প্রায় ১০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। উহাতে উঠিতে দেড় ঘণ্টা সময় লাগে, এই দেবালয়ের উপরে উঠিবার প্রস্তরময় প্রাচীন সোপানশ্রেণী সজ্জিত থাকায় উঠিতে যত কষ্ট ও তত সময় অতিবাহিত করিতে হয়। মন্দিরটী প্রকাণ্ড সপ্ত প্রকোষ্ঠে বিভক্ত হইয়া পর্ব্বতটী এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে। ইহার গঠনপ্রণালী এবং শিল্পনৈপুণ্য বা কারুকার্য্যগুলি দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান দেবালয়ের ন্যায় দেখিতে পাইবেন। ইহার



চতুর্দ্দিকই প্রস্তরের উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, আর মধ্যে মধ্যে সেই সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণ। কি অদ্ভুত ব্যাপার। এত উচ্চ পাহাড়ের উপর কিরূপে এই সকল গৃহ নির্ম্মাণের সরঞ্জাম উত্তোলিত হইয়াছে, উহা ভাবিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। এই সকল প্রাঙ্গণের সম্মুখে নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তিবিশিষ্ট উচ্চ গোপুর শোভা পাইতেছে। মন্দিরাভ্যন্তরে জগজ্জননী প্রস্তরনির্ম্মিত অষ্টভুজা মূর্ত্তিতে রণরঙ্গিণীবেশে সিংহাসনোপরি দণ্ডায়মানা। এই মূর্ত্তিটীর দক্ষিণ হস্তস্থিত ত্রিশূল দ্বারা অসুররাজকে বিদ্ধ করিতেছেন, আর বাম হস্তস্থিত নাগপাশ দ্বারা তাহাকে আবদ্ধ করিয়াছেন এবং অন্য ছয় হস্তে তীর, ধনু ও চক্র দ্বারা দুর্দ্দান্ত অসুরকে বধ করিতেছেন। একি ভাব মা! তোমার ভক্ত নিজ দোষে তোমারই রোষে পতিত হইয়া আজ প্রাণ হারাইতেছে। কি গম্ভীর ভাব! কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! দুর্জ্জয় অসুরদিগকে বিনাশ করিবার জন্যই আপনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আর এইজন্যই আপনার অপর একটী নাম "অসুর-নাশিনী"। অসুররাজের মহিষাকৃতি দেহ, নরাকৃতি মস্তক, তাঁহার অধিষ্ঠাত্রীদেবী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অন্তিম সময়ে রোষভরে চক্ষুদ্বয় লাল বর্ণ করিয়া দেবীর পানে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইতেছে। অসুরের সেই রাগতপ্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তির ভাব নয়নগোচর হইলে অদ্যাপিও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। আবার এই দেবীমূর্ত্তির উপরিভাগে আমাদের এ দেশের ন্যায় চালচিত্র অঙ্কিত থাকায় মা যেন এক নূতনভাবে অবনীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। দেবালয়ের পার্শ্বে এক বৃহৎ বৃষমূর্ত্তি থাকায় ঐ স্থানটীর সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমাদের বাঙ্গলা দেশে যেরূপ দেবীস্থানে পশু বলি হইয়া থাকে, এ প্রদেশে সেরূপ প্রথা নাই, কিন্তু শূদ্রগণ পর্ব্বতের পাদদেশে সমতল-ভূমির উপর দেবী উদ্দেশ্যে পশু বলি দিয়া থাকে। স্থানীয় অধিবাসী-

দিগের নিকট পর্ব্বতোপরি দেবী প্রতিষ্ঠা হইবার কারণ অবগত হই-লাম যে, এই দেবী মহিষাসুরকে বিনাশ করিয়া রজনীযোগে রাজ-মহিষীকে স্বপ্নাদেশ করেন, "মহিষি! আমি দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করিবার জন্যই কৈলাস ত্যজিয়া পৃথিবীর নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া জীবদিগকে শিক্ষাপ্রদান করিতেছি। তোমার স্বামীর বারম্বার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া অতি দুঃখেই তাহাকে বিনাশ করিয়াছি, ইহাতে তুমি দুঃখ করিও না—ধর্ম্মে মতি রাখিয়া স্বচ্ছন্দে প্রজাপালন কর, আমার বরপ্রভাবে প্রাণান্ত হইলে কৈলাসে পুনরায় স্বামীসনে মিলিত হইতে পারিবে। রাজা আমার উপদেশ অমান্য করিয়াছিলেন, তাই তাহার প্রতিফলস্বরূপ আমি এই রণবেশে তাহাকে বধ করিয়া তোমার পুরী পরিত্যাগ করিয়া সন্নিকটস্থ চামুণ্ডা পর্ব্বতোপরি বিশ্রাম করিতেছি, এই অনাবৃত স্থানে থাকিয়া আমার অতিশয় কষ্ট হইতেছে অতএব যদি সংসারের মঙ্গল চাও, তাহা হইলে আমার আদেশ ম[illegible] এই পর্ব্বতের শিখরদেশে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দাও।" মহিষী দেবীর উপদেশ মত শ্রদ্ধাসহকারে বহু অর্থ [illegible] করিয়া মনের ম[illegible] এই সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দিরটী নির্ম্মাণ [illegible]ইয়া এবং মন্দির মধ্য[illegible] সেই স্বপ্নাদিষ্ট দেবীর রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক তাঁহার নিত্য সেবা[illegible] সুবন্দোবস্ত করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

প্রতি শারদীয়া পূজার সময় এখানে এই মন্দিরে নয় দিবসব্যাপী নবরাত্র ব্রত মহাসমারোহে দেবীর স্থানে পালন হইয়া থাকে। ঐ স[illegible] বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়া যাগ, হোম ও বেদ পাঠ করেন, এ[illegible] কি সপ্তশতী চণ্ডী পাঠ হয়। হোম, চণ্ডী পাঠ, জপ এবং বেদ পা[illegible] এ দেশের পূজার মূল অঙ্গ। অন্নব্যঞ্জনের মহা নৈবেদ্য প্রস্তুত হ[illegible] পূজার সময় রাজপরিবারবর্গ সকলেই এই উচ্চ পাহাড়ের উপর আ[illegible]

করিয়া ভক্তিসহকারে দেবীর পূজা দর্শন করিয়া থাকেন এবং যাতে পূজার কোনরূপ ত্রুটি না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। পূজার সময় প্রাসাদ হইতে রাজপরিবারবর্গ নয় দিবস এই চামুণ্ডা পাহাড়ের উপর আসিয়া বাস করেন। দেবালয়ের কিছু দূরে পাহাড়ের উচ্চ স্থানে তাঁহাদের বিশ্রামাগারটী নির্ম্মিত আছে, সুতরাং এই স্থানটী অতি রমণীয়, এখানে কিছুতেই গ্রীষ্ম অনুভব হয় না। চামুণ্ডা নামক পাহাড়ের উপর দেবী অবস্থান করিতেছেন বলিয়া জগজ্জননী এখানে চামুণ্ডা নাম ধারণ করিয়াছেন। রাজবিশ্রামাগার হইতে নিম্নে, সহরের চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দুর্গ মধ্যস্থ প্রাসাদ, শ্রীরঙ্গপত্তম এবং শিবসমুদ্রের পুণ্যতোয়া কাবেরীর ক্ষীণছায়া নয়নগোচর হইতে থাকে। এতদ্ভিন্ন এই বিস্তৃত পর্ব্বতের উপর এজেণ্ট সাহেবের একটী বাঙ্গালোর এবং স্নান ও পান করিবার সুবিধার্থে পৃথক একটী চতুর্দ্দিক বাঁধান পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ পথে রাজাদিগের সমাধি-ক্ষেত্র দেখিতে পাইবেন। এই ক্ষেত্রে স্বর্গীয় মহারাজ কৃষ্ণ রায়ের সমাধির উপর একটী অট্টালিকা আছে, তন্মধ্যে মহারাজের প্রস্তর নির্ম্মিত একটী সুন্দর মূর্ত্তি বৃহৎ কূর্ম্মাসনে বসিয়া জীবিত অবস্থায় যেরূপ ভাবে ইষ্টদেবতার উপাসনা করিতেন, ঠিক্ সেইরূপ একটী প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। এই সমাধিক্ষেত্রে আরও বিস্তর রাজপরিবারবর্গের সমাধি আছে, প্রত্যহ ঐ সকল রাজাদিগের প্রতিমূর্ত্তিগুলির যথানিয়মে পূজা হয়। এখানে সাধু সন্ন্যাসীদিগের বসবাসের জন্য পুরাকাল হইতে একটী মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে, ঐ মঠে অদ্যাপিও বিস্তর সাধু সন্ন্যাসীরা বাস করিয়া রাজবংশধরাদিগের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। এই

মহাত্মা

মহীশূর রাজ্যমধ্যে রেসিডেণ্ট মহোদয়ের বাঙ্গালোর ও শ্রীরঙ্গপত্তন এই দুই নগরের শোভা দর্শন যোগ্য।

মহীশূর রাজ্য দেশীয় হিন্দু রাজার অধীন, মান্দ্রাজের পশ্চিমে দাক্ষিণাত্যের সমভূমিতে ইহা অবস্থিত। হায়দার আলি ও টিপুসুল তানের প্রাদুর্ভাবকালে এ রাজ্যের বিলক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছিল পূর্ব্বদিকে বাঙ্গালোর, এখানে ব্রিটিশ কমিশনার‚ও অনেক ব্রিটিশ সৈ অবস্থান করে। দক্ষিণে মহীশূর রাজ্যের রাজধানী। ১৭৯৯ খৃঃ হায়দার আলি ও টিপুসুলতানের শাসনকালে ইংরাজেরা যখন নগরটী অবরো করেন, তৎকালে ঐ মহাযুদ্ধে মহাবীর টীপু হত হয়েন। শ্রীরঙ্গপত্ত কাবেরী নদীর দ্বীপোপরি হায়দার আলির রাজধানী ছিল।

মহীশূর প্রাসাদ হইতে দক্ষিণদিকে দশ মাইল দূরে শ্রীরঙ্গপ নামে একটী নগর আছে। পূর্ব্বে এই স্থানে হাইদার আলির রাজধা ছিল, সুতরাং হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরের নিকট বহু অর্থ সহকারে আপন ইচ্ছামত ভারত বিখ্যাত দিল্লী নগরের যুম্মা মসজি অনুকরণীয় এক মনোমুগ্ধকর মসজিদ তিনি প্রস্তুত করাইয়া ম কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, অদ্যাপিও ঐ সুন্দর মসজিদটী ত দেহে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার যশগুণ ঘোষণা করিতেছে, শ্রীরঙ্গ সহরটী দেখিতে পরিষ্কার, রাস্তাগুলি প্রশস্ত। এখানে বহু লো বসতি আছে, কাবেরী নদীর চরদ্বীপের উপরিভাগে ইহা অব এখানে শ্রীরঙ্গজীউর যে প্রাচীন দেবালয় বর্ত্তমান আছে, উহাই রঙ্গজীউর মন্দির নামে প্রসিদ্ধ। এই দেবের নাম অনুসারে স নাম শ্রীরঙ্গপত্তম্ হইয়াছে।

কথিত আছে, গৌতম মুনির জনৈক শিষ্য এই স্থানে একটী ... পবিত্র মূর্ত্তি

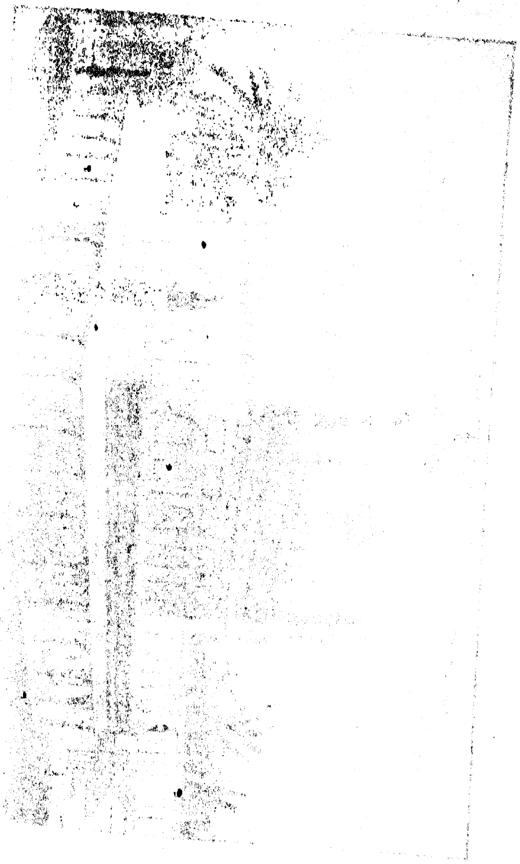
ন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া তিনি "কিংকর্ত্তব্য" এই সার-
ঞ্চ শ্লোকটী হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক সেই স্থানে যথায় মূর্ত্তিটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,
ই স্থানে একটী গর্ভগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া এই পবিত্র দেবমূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠা
রিয়া তাঁহার নিত্যসেবার বন্দোবস্তপূর্ব্বক মনের সুখে কালাতিপাত
রিতে থাকেন। ইহার কিছুদিন পর মহীশূরের রাজকন্যা যিনি
কমাত্র উত্তরাধিকারিণী ছিলেন, সেই কন্যারত্নগ্রহবশতঃ কঠিন পীড়া-
স্ত হন, রাজার বহু চেষ্টাসত্ত্বেও এই রাজকন্যার পীড়া কিছুতেই উপশম
ইল না দেখিয়া তিনি হতাশ হইলেন; এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে
হাত্মা রামানুচার্য্য এই রাজ্যে পদার্পণ করেন এবং রাজকন্যার কঠিন
ড়ার বিষয় অবগত হন। তাঁহার চেষ্টায় এবং যত্নে অল্পদিনের মধ্যে
ই রাজকন্যাকে তিনি সেই কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিলেন। তখন
জা তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি রাজকন্যাকে
হার শিষ্যা হইতে আদেশ করেন। এইরূপে রাজকন্যা তাঁহার শিষ্যত্ব
হণ করিলেন। ভারতের চতুর্দ্দিকে এই শুভ সমাচার বিঘোষিত হইলে
র্ব্বোক্ত গৌতম ঋষির শিষ্য তাঁহার নিকট শ্রীরঙ্গজীউর নরলোকে অব-
র্ণ এবং ভগবানের গর্ভগৃহে বাস করিবার সময় কষ্টের বিষয় অতি
খভরে জ্ঞাপন করেন। তখন আচার্য্য মহাশয় তাঁহার এক কীর্ত্তি
পনের জন্য শিষ্যা রাজকন্যাকে এই দেবতার একটী মন্দির নির্ম্মাণ
রাইয়া যাহাতে সুচারুরূপে নিত্যসেবা হয়, তাহার উপায় করিবার
পদেশ দেন। গুরুর উপদেশ মত রাজকন্যা সেই গর্ভগৃহের উপর এই
ং গোপুরযুক্ত দেবালয়টী নির্ম্মাণ করাইয়া অতি সমারোহে শ্রীরঙ্গ-
উর উক্ত মূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপে এই দেবালয়টীর সৃষ্টি
ইয়াছে, এই মন্দিরের চূড়ার উপরিভাগে পাঁচটী পিত্তলের কলসী
শোভা পাইতেছে। শ্রীরঙ্গমজীউর মন্দিরের সন্নিকটেই ভগবান নৃসিংহ-

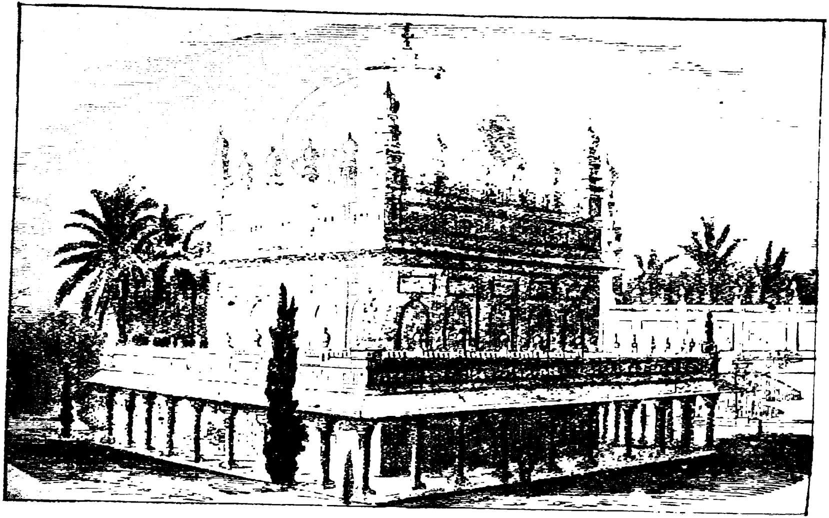
দেবের অপূর্ব্ব মন্দির বিরাজমান। এখানকার এই দুইটী মন্দিরই স্থানীয় রাজার অধীন। দেবালয়ের ব্যয় কারণ রাজষ্টেট হইতে বাৎসরিক ৮০০০৲ হাজার টাকা বরাদ্দ আছে।

এখানে উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য স্থানগুলির শোভা দর্শন করিবেন। ১। শ্রীরঙ্গজীউর দেবালয়, ২। নৃসিংহদেবের দেবালয়, ৩। আলিসুলতানের সমাধি স্থান, ৪। টিপুসুলতানের কবরস্থান, ৫। আলামসজিদ্ নামে একটী সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট মসজিদ। ঐ সকল স্থানের শোভা এবং সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া মনে মনে ভগবান রামেশ্বরজীউর শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে গোমস্তা ও তথাকার পাণ্ডার উপদেশ মত সহর হইতে মহীশূর নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। হস্পেট নামক স্থান হইতে যে পাণ্ডাকে সঙ্গে লইয়াছিলাম তাহাকে মাত্র চারটী টাকা প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিলাম। এইরূপে এখানকার কার্য্য সকল সম্পন্নপূর্ব্বক রামেশ্বর তীর্থ দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলাম। বলাবাহুল্য এখান হইতে রামেশ্বর যাইতে হইলে প্রথমে মাদুরা, তথা হইতে ভিন্ন লাইনে রামেশ্বর তীর্থে পৌঁছিতে হয়। পাঠক বর্গের প্রীতির জন্য শ্রীরঙ্গপত্তনের টিপুসুলতানের সেই সমাধিক্ষেত্রের মনোমুগ্ধকর চিত্রের দৃশ্য প্রদত্ত হয়।

মাদুরা

মাদুরা একটী জংশন ষ্টেশন। ভাগৈ নদীর দক্ষিণতীরে মাদ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিমে ১৭০ ক্রোশ দূরে সহরটী অবস্থিত। এই জংশন ষ্টেশন হইতে যে অপর আর একটী ব্রাঞ্চ লাইন আছে, যে লাইনটী বরাবর এখান হইতে রামেশ্বর তীর্থ স্থানে যাইবার জন্য পাম্বাম পর্য্যন্ত গিয়াছে সেই লাইন দেখিয়া একবার শ্রীশ্রীরামেশ্বরজীউর শ্রীচরণ ধ্যান করিলে





আলি স্থলতানের সমাধি স্থান। [১৩৪ পৃষ্ঠা]

মাদুরা ভারতের অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত নগর। পূর্ব্বে পাণ্ড্যগণ এই নগরের রাজা থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতেন। কর্ণাটের প্রকাণ্ড সমভূমিই এই পাণ্ড্যজাতির বাস স্থান। ইহার পশ্চিমসীমানা ঘাট-পর্ব্বত নামে খ্যাত। পাণ্ড্যদেশে দুইটী প্রাচীন রাজ্য ছিল, ইহার উত্তরাঞ্চলে চোলা রাজ্যের রাজধানী "কাঞ্চীপুর," আর দক্ষিণাঞ্চলস্থ "পন্দ্যন" রাজ্যের রাজধানী এই সহর মাদুরা নামে প্রসিদ্ধ।

এইরূপে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহারা রাজত্ব করেন। কথিত আছে যে, শেষ পাণ্ড্য রাজা সুন্দর বা গুণপাণ্ড্য আপন প্রতিভাবলে জৈনদিগকে সবংশে ধ্বংশ করিয়া নিকটবর্ত্তী চোলরাজা জয় করেন। তৎপরে উত্তরাঞ্চল হইতে একদা এক ক্ষমতাপন্ন ও সমৃদ্ধিশালী হিন্দু রাজা, সসৈন্যে এখানে উপস্থিত হইয়া পাণ্ড্যরাজাকে আক্রমণ করেন, তাঁহার অমিতবিক্রমে পাণ্ড্যরাজকে পরাজিত হইয়া প্রাণভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে হইল। তদবধি ইহা বিজয় নগরের বিশাল সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে নায়েক বংশের পত্তনকর্ত্তা মহাবীর বিশ্বনাথ এখানে শাসনকর্ত্তা রূপে বিজয়নগর হইতে প্রেরিত হয়েন। কালক্রমে তাঁহার বংশধরেরা সৌভাগ্যশালী রাজা হইয়া রাজ্য শাসন করেন। বিশ্বনাথ জীবিত অবস্থায় তাঁহার অধীনস্থ সৈন্য সামন্তদিগকে এবং ৭২ জন প্রধান কর্ম্মচারীকে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য নানা স্থানে ভূমি দান করেন। ইঁহাদের বংশধরেরা সেই বিশ্বনাথ প্রদত্ত ভূমি অদ্যাপিও ভোগ করিতেছেন। বিশ্বনাথের পরবর্ত্তী রাজগণের মধ্যে ত্রিমলই মহাপরাক্রমশালী ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্যটী নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ১৭৪০ খৃঃ এই মাদুরা চান্দা সাহেবের হস্তগত হয়। তৎপরে ১৮০১ খৃঃ কর্ণাটের নবাব কর্ত্তৃক এই মাদুরা সহরটী ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হয়।

কথিত আছে, পুরাকালে এখানে একটী বিখ্যাত চতুষ্পাঠী ছিল। প্রবাদ এইরূপ, স্বয়ং মহাদেব এই চতুষ্পাঠীতে হীরকমণ্ডিত একখানি আসন রাখিয়াছিলেন। এই আসনখানি এমনই গুণসম্পন্ন ছিল যে, কোন যোগ্য ব্যক্তি এখানে উপস্থিত হইলে আসনখানি আপনা হইতে বিস্তৃত হইয়া আগন্তুককে বসিতে আহ্বান করিত। কিন্তু কোন অযোগ্য ব্যক্তি এই চতুষ্পাঠীতে প্রবেশ করিতে আসিলে উহা আপনা-আপনি সঙ্কুচিত হইত। এই আসনের ক্ষমতাবলে চতুষ্পাঠীস্থ লোকেরা কোন্ ব্যক্তি যোগ্য এবং কোন্ ব্যক্তি অযোগ্য তাহার পরীক্ষা করিতেন।

মাদুরা সহরের অপর একটী নাম মধুরাপুরী। অবগত হইলাম, এখানে যে সকল প্রাচীন অদ্ভুত দেবালয় আছে, তদ্দর্শনে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। যখন রেল ভাড়া দিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন সহরের শোভা এবং অদ্ভুত দেবালয়গুলির সুন্দর দৃশ্য সকল দর্শন না করি কেন? এখানে আহারীয় সমস্ত দ্রব্যও পাওয়া যায়, মাদুরা সহরে বহু লোকের বসতি আছে।

এই সহরটী নামেও যেরূপ শ্রুত মধুর "· ·পুরী" বসবাসের পক্ষেও সেইরূপ সুখপ্রদ। এখানকার রাস্তাগুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। ষ্টেশনের সম্মুখে "মঙ্গলমল" নামে একটী ধর্ম্মশালা বিরাজমান। এই ছত্রবাটীতে বাস করিবার কালে সকল বিষয়ে সুবিধা দেখিলাম, কিন্তু প্রতি রোজ প্রতি ঘর প্রতি চারি আনা হিসাবে ভাড়া দিতে হয়, এতদ্ভিন্ন দ্বারবান, বেহারাদিগের পারিতোষিক স্বতন্ত্র। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে এতাবৎকাল যত ছত্রবাটীতে বাস করিলাম, কিন্তু কোথাও ভাড়া দিতে হয় নাই, কেবল দ্বারবান, বেহারাদিগকে কিছু কিছু পারিতোষিক দিয়াছিলাম কিন্তু এখানকার ব্যবস্থা স্বতন্ত্র দেখিলাম। ছত্রবাটীতে

ভাড়া দেওয়া প্রথা আমরা এই প্রথম দেখিলাম। যাহা হউক, বাধ্য হইয়া এই ছত্রবাটী মধ্যে তিনখানি ঘর ভাড়া লইয়া ইহার ছাদের উপর হইতে সহরের চারিধারের দৃশ্য দেখিয়া লইলাম, তৎপরে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর জঠরানল নিবৃত্তির জন্য আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহের নিমিত্ত গোমস্তা ঠাকুরের সঙ্গে বাজারের দিকে গমন করিলাম। এই ছত্রবাটীর অনতিদূরে বাজার আছে, তথায় আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্যই পাওয়া যায়। তরিতরকারী এখানে এত সস্তা যে, দুই আনায় বাজার খরিদ করিলে একটী বড় গৃহস্থের স্বচ্ছন্দে চলে। নানাবিধ ফলও প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে স্থানে শত সহস্র লোকের বসবাস, সে স্থানে মাটীর হাঁড়ি পাওয়া যায় না। যাহা হউক, কোন প্রকারেও আহারের বন্দোবস্ত করিয়া সেদিনকার মত তথায় বিশ্রাম করিলাম, কারণ ক্রমাগত এক গাড়ী হইতে অন্য গাড়ীতে উঠিয়া মোট গাঁটরীগুলির তত্ত্বাবধান করিতে করিতে এবং নিয়মিত নিদ্রা না হওয়ায় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম।

পর দিবস প্রত্যূষে দেব দর্শন ও সহরের শোভা দর্শন করিবার জন্য বহির্গত হইলাম। দুঃখের বিষয় এই যে, কলিকাতা হইতে এত দূর আসিলাম, দুই-চারি স্থান ব্যতীত এপ্রদেশে কোন স্বজাতি বাঙ্গালী ভায়াকে দেখিতে পাইলাম না। এখানকার প্রধান দেবতা সুন্দরেশ্বর স্বামী। কথিত আছে, পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং এই দেব ও দেবী মীনাক্ষীকে মনোমত সজ্জিত করিয়া প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক আপন মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে যাত্রীগণকে প্রথমে শিব-গঙ্গে নামক তীর্থের পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া দেব স্থানে পূজা করিতে যাইতে হয়। ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীর সন্ধান পাইয়া সসৈন্যে লঙ্কা যাইবার পূর্ব্বে এই সুন্দরেশ্বর স্বামীর পূজা করিয়াছিলেন।

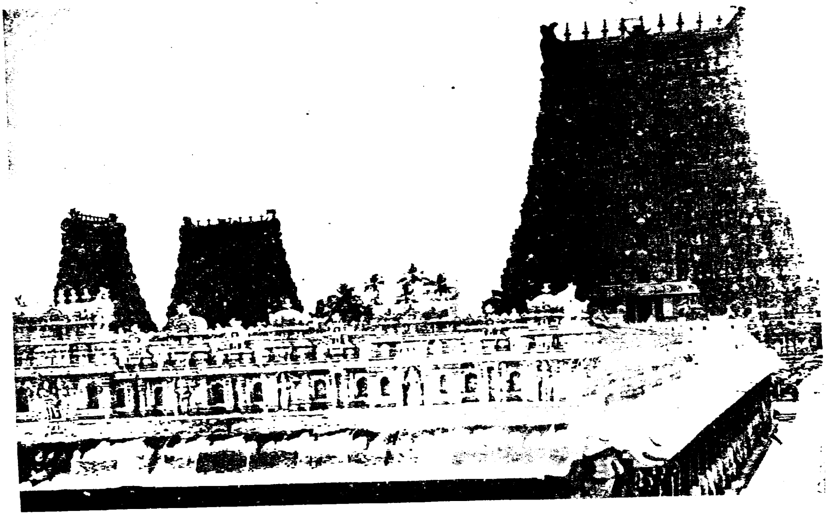
এই দেবালয়টী প্রাচীন ও বৃহদায়তন। এরূপ প্রকাণ্ড মন্দির অদ্যাপি কোথাও দেখিতে পাই নাই। তাই বলিতে হয়, দাক্ষিণাত্যে যত ভ্রমণ করিবেন, ততই আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। যদ্যপি গোমস্তাটী আমাদের সঙ্গে না থাকিতেন, তাহা হইলে দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে কত ভাল ভাল দেবালয় আমাদের ভাগ্যে দর্শন লাভ হইত না। ছত্রবাটী হইতে সুন্দরেশ্বর স্বামীর দেবালয় অন্যূন অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। স্পর্দ্ধাসহকারে বলিতে পারা যায় যে, এই দক্ষিণ প্রদেশের মত অদ্ভুত দেবালয় এবং দেবতার ঐশ্বর্য্য ভারতের চারি ধামের মধ্যে আর কোথাও নাই, কি অদ্ভুত ব্যাপার, কোন্‌টী রাখিয়া কোন্‌টীর প্রশংসা করিয়া বর্ণনা করিব। এই সকল স্বচক্ষে দর্শন না করিলে কিছুই বিশ্বাস হয় না। এখানকার গোপুরগুলির উচ্চ উচ্চ প্রতিমূর্ত্তিগুলি ও নানাবিধ কারুকার্য্যবিশিষ্ট স্তম্ভ সকল এবং বিগ্রহাদি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া ভাবিবেন যে, ত্রিমার্গের এ কোন্ স্থানে উপস্থিত হইলাম। স্বর্গ, মর্ত্ত্য না বলিরাজের পাতালপুরী—যথায় স্বয়ং ভগবান পুরীর দ্বার রক্ষা করিতেছেন। আহা! কি শান্তিপ্রদ প্রেমময় মধুর দৃশ্য! যাহা দর্শন করিয়াছি, জীবনের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত এই সকল দেবতা ও দেবালয়ের চিত্রাদি হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। এ প্রদেশে অনেক স্থানে অনেক প্রকার সুশ্রী এমন কি ইহা অপেক্ষা বৃহৎ দেবালয় দর্শন করিয়াছি সত্য, কিন্তু স্বর্গতুল্য শান্তিপ্রদ চারি সার করিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে স্তম্ভগুলি সজ্জিত, তাহার মধ্যে জল প্রবাহিত হইবার পয়ঃপ্রণালী আর কোথাও নয়নগোচর হয় নাই। এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিলে প্রেমভরে সেই পরম প্রেমময় পতিতপাবন শ্রীহরির শ্রীচরণে ভক্তির উদ্রেক হইতে থাকে। এখানকার মূলমন্দিরের সম্মুখেই প্রকাণ্ড গণেশজীউর মূর্ত্তি প্রথমে দর্শন পাই-

বেন। আরও সুখের বিষয়, এই স্থানে পূজারীদিগের কোন প্রকার জুলুম দেখিতে পাওয়া যায় না। যাত্রীরা সাধ্যমত যাহা দান করেন, তাঁহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হন; যদিও এ প্রদেশে অধিকাংশ দেবালয়ে সুফলের নিয়ম আছে, কিন্তু স্থানে স্থানে আবার এ প্রথা নাই। এই মাদুরায় সুফলের নিয়ম দেখিলাম না, কিন্তু সুন্দরা স্বামীর দেবালয়ের মধ্যে এই নিয়ম দেখিলাম যে, দেবস্থানে একটী ফল উৎসর্গ করিতে হয়।

দক্ষিণ ভারতবর্ষের মন্দিরের ন্যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির উত্তর ভারতবর্ষে কুত্রাপি নাই। এই মন্দিরগুলির অধিকাংশই চতুষ্কোণ ও দীর্ঘাকার। ইহাদের এক একদিকে উচ্চ সিংহদ্বার শোভা বিস্তার করিয়া আছে। সকলের মধ্যস্থলে দেবালয়, দাক্ষিণাত্যে একটী অদ্ভুত নিয়ম দেখিলাম, যে স্থানে পূজারীগণ থাকেন, প্রায় সকল দেবালয়ে তাহার পরবর্ত্তী স্থানেই এক দল নর্ত্তকী থাকেন। উহারা "দেবদাসী" নামে খ্যাত। অবগত হইলাম, এরূপ দেবদাসী কোন দেবালয়ে ২০০০ সহস্র, কোনটীতে অত্যাধিক থাকিয়া দেবকার্য্যে রত আছেন। ইহারা নানা জাতীয় এবং সৎকুলোদ্ভবা। কেন না কোন অপুত্রক এখানকার কোন দেবালয়ে আসিয়া মানস করেন যে, হে ভগবান! আমার সন্তান সন্ততি না হওয়ার জন্য বংশ লোপ পাইতেছে, অতএব কৃপা-পূর্ব্বক আমায় পুত্র বা কন্যা সন্তান প্রদান করুন? এইরূপ মানতের পর যদ্যপি প্রথমেই সেই ভক্তের কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলে তিনি ভক্তিভাবে ঐ কন্যাকে কিছু অর্থসহ দেবালয়ে রাখিয়া যান। তাহা-দের মতে ইহা অতি পুণ্য কার্য্য বলিয়া গণিত। কালক্রমে ঐ কন্যা বয়োপ্রাপ্ত হইয়া দেব সেব্যায় রত হন, কিন্তু যদি এইরূপ কোন দেব-দাসী কুলটা হয়, তাহা হইলে সমাজে তাহার পিতামাতাকে আত্মীয়-স্বজনের নিকট নিন্দনীয় হইতে হয় না।

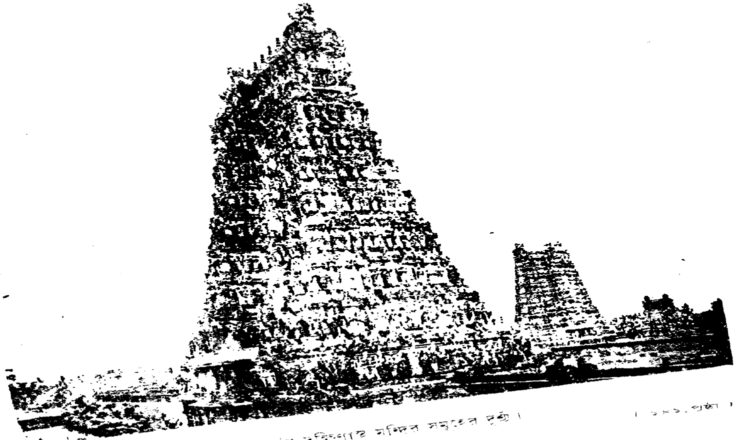
সুন্দরস্বামী নামক লিঙ্গরাজের মন্দিরের পার্শ্বে অন্য এক প্রকোষ্ঠে মীনাক্ষীদেবীর মন্দির শোভা পাইতেছে। মন্দিরাভ্যন্তরে জগজ্জননী হীরা মুক্তাজড়িত বহু মূল্য অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া মন্দিরটী এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। দেবীর সম্মুখে বৃন্দাবনে শেঠেদের দেবালয়ের প্রাঙ্গণের ন্যায় একটী সোণার তালগাছ দেখিতে পাইবেন। এই দেবালয়ের ভিতর অনেক স্থানে লৌহ গরাদেযুক্ত কপাট—তাহাতে নয় শত করিয়া বড় বড় প্রদীপ আঁটা আছে, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় যখন এই সকল প্রদীপগুলিকে প্রজ্জ্বলিত করা হয়, তখন মন্দিরটী কিরূপ সুন্দর দেখায়, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারেন। মিনাক্ষীদেবীর মন্দিরের চূড়াটী স্বর্ণপাতে পণ্ডিত। প্রত্যহ আরতির সময় মান্দ্রাজী বাজনা বাজিবার সুবন্দোবস্ত আছে। কি অদ্ভুত ব্যাপার। দেবদেবীর যে সকল বহু মূল্য আসবাব দেখিলাম, তাহা লিখিয়া কত জানাইব। রৌপ্যনির্ম্মিত প্রকাণ্ড হস্তী, সুন্দর রথ ও নানাপ্রকার যানবাহনাদি যাহা দেখিলাম উহাই উল্লেখযোগ্য। সোণার পাতমোড়া দুইখানি বৃহৎ পাল্কী ও দুইটী বহু মূল্য পান্না ও মুক্তাজড়িত ছত্র দেখিলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট অবগত হইলাম, এই দেবের কেবল অলঙ্কারগুলির মূল্য তিন লক্ষ টাকার অধিক, এতদ্ভিন্ন দেবষ্টেটেরও বিস্তর আয় আছে। মাদুরা সকল দিকে সকল বিষয়ে সুন্দর এবং ঐশ্বর্য্যশালী। সুতরাং ইহার মধুপুরী নাম সার্থক হইয়াছে। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত মাদুরার প্রাচীন মন্দির সমূহ পথের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

মাদুরা সহরের দক্ষিণে যে একটী অপূর্ব্ব প্রস্তর খোদিত বড় বড় পুত্তল সজ্জীকৃত মন্দির আছে, ঐ মন্দিরের দৃশ্য অবলোকন করিলে আত্মহারা হইবেন, সন্দেহ নাই। এই অত্যুচ্চ নয়নানন্দদায়ক মন্দিরের



মাদুরার প্রাচীন মন্দির সমূহের দৃশ্য।

[১৪০ পৃষ্ঠা ।



মাদুরার দক্ষিণস্থ মন্দির সমূহের দৃশ্য। (১৮১ পৃষ্ঠা)

শিখরদেশ হইতে নিম্নভাগ পর্য্যন্ত যে ভাবে পুত্তলগুলি খোদিত হইয়া সজ্জিত আছে, এইরূপ কারুকার্য্যবিশিষ্ট পরিষ্কার অবস্থায় মনোহর দৃশ্য অদ্যাপি আর কোথাও নয়নগোচর হয় নাই। যাহা হউক, ভগবানের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে এখানকার মন্দির ও দেবতাদিগের দর্শন করিয়া এতাবৎকাল যাঁহার দর্শন আশে সংসারের মায়াবন্ধন ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম,সেই কৃপাবান ও দ্যুতিমান ভগবানের ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের আরাধ্যদেব যিনি এখানে রামেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছেন, তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আমাদের মহাব্রত উদ্যাপন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। যে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম, যাঁহার করুণায় এই ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত ; যাঁহার ইঙ্গিতমাত্র সৃষ্টি স্থিতি লয়প্রাপ্ত হয়, যে পরম পুরুষ স্বয়ং শ্রীহরি আপন ইচ্ছায় নরাকারে চারি অংশে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণপূর্ব্বক নরলোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কিরূপে সীতা দেবীকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ভারতের শেষ সীমায়, অনন্তসাগর বক্ষে এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কি সুন্দর কৌশলে সেতুবন্ধন করিয়া দুর্জ্জয় রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ রাজাকে সবংশে বিনাশপূর্ব্বক সাধ্বী সতী সীতাদেবীর উদ্ধার-সাধনসহকারে আপন গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এই সকল লীলাখেলা দর্শন করিবার জন্য মন যেন নৃত্য করিতে লাগিল। পাঠকগণের প্রীতির নিমিত্ত মাদুরার দক্ষিণাস্থ মন্দিরের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্রীরামেশ্বরজীউ

মাদুরা সহর হইতে রামেশ্বর তীর্থ দর্শন করিতে যাইতে হইলে মাদুরা নামক জংশন ষ্টেশন হইতে পাম্বাবান নামক যে ব্রাঞ্চ লাইন আছে, সেই লাইনে রেলগাড়ীতে উঠিয়া মাণ্ডাপম নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিতে হয়। এই ষ্টেশন হইতে আবার একটী শাখা লাইন দেখিতে পাইবেন। যাঁহারা সেতুপতিদিগের রাজধানীর শোভা দেখিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা এই স্থান হইতে ঐ পাম্বাবান ব্রাঞ্চ লাইনে গমনপূর্ব্বক রামনাদ নামে যে একটী বড় ষ্টেশন পাইবেন, তথায় অবতরণ করিয়া সেতুপতিদিগের রাজধানীর শোভা এবং ঐশ্বর্য্য দেখিতে পারেন। রামনাদের রাজা সেতুপতি উপাধিপ্রাপ্ত হন, কারণ শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক রামেশ্বর দেব প্রতিষ্ঠিত হইলে এই রাজা ভগবানের নিত্য সেবার জন্য শতাধিক আয়কর গ্রাম দেবতার নামে উৎসর্গ করেন, ঐ গ্রাম সমূহের আয় হইতে সচ্ছন্দে ভগবানের পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে। রামনাদে যে সমস্ত লোক বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই শৈবধর্ম্মাবলম্বী। আমাদের গোমস্তা ঠাকুরের নিকট উপদেশ পাইলাম, রামনাদে এত অধিক লোকের বাস আছে, যদ্বারা ঐ জমিদারীর বাৎসরিক আয় এগার হইতে বার লক্ষ টাকা। এরূপ জমিদারী এ প্রদেশে আর কোথাও নাই বলিলেও চলে। পরম ভক্ত সেতুপতি রামেশ্বরদেবের নিত্যসেবার বন্দোবস্ত করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, এই হেতু রামেশ্বরদেবের শ্রীমন্দিরটী সেতুপতির অধীন হইয়াছে, অদ্যাপিও তাঁহার বংশধরেরা শ্রদ্ধাসহকারে সেই পূর্ব্ব নিয়মগুলি পালন করিয়া রাজার মহিমা গৌরবান্বিত করিতেছেন। সেতুপতি কেবল যে রামেশ্বরদেবের পূজার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এমন নয়, এই রামেশ্বর

দেব ব্যতীত তিনি স্বীয় রামনাদ নামক রাজধানী মধ্যে "কোদণ্ড রামস্বামী, বিশ্বনাথ স্বামী, বাণশঙ্করী, নীলকণ্ঠী ও রাজরাজেশ্বরীদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।" আরও বিদেশী যাত্রীদিগের বিশ্রামের নিমিত্ত রাজধানীর নানা স্থানে ছত্রবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া অমরত্বলাভ করিয়াছেন।

মাণ্ডাপম্ ষ্টেশনটীর দৃশ্য ঠিক একখানি সুশোভিত চিত্রের ন্যায়। এই ষ্টেশনে একখানি রেলওয়ে যাত্রী-ষ্টীমার অপেক্ষা করিতে থাকে। ট্রেণখানি পৌছিবামাত্রই উক্ত ষ্টীমারখানি যাত্রীদিগকে লইয়া পক্-প্রণালী নামক সাগরের উপর দিয়া প্রায় দুই মাইল পথ ভাসিতে ভাসিতে অতিক্রম করিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে রামেশ্বর নামক দ্বীপে উপস্থিত হয়। এই ষ্টীমার হইতে যাত্রাকালীন সাগর মধ্যস্থ মৎস্য ও অপরাপর জলজন্তুগুলির ইতস্ততঃ গমনাগমন দেখিলে কত আনন্দ অনুভব করিতে থাকিবেন। এই স্থানের জল এত সচ্ছ ও স্থিরভাব যে, সহজেই উহাদের গতিবিধি দেখিতে পাওয়া যায়। এই পক্প্রণালীর উপর হইতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কপিবানরদিগের সাহায্যে যে সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন এবং সীতাদেবীর উদ্ধার-সাধন হইলে সাগরের অনুরোধে শ্রীরাম আজ্ঞায় লক্ষ্মণদেব সেতুর যে যে স্থান ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন, উহা সমস্তই দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে সেতুটা দেখিলে যেন ঠিক একটী লম্বা প্রস্তর রেখা বরাবর জলের উপর পাতত রহিয়া শ্রীরামচরণ ধ্যান করিতেছে। এইরূপ ভ্রম হয়, সেই সেতুর ভগ্নাংশের মধ্য দিয়া কেবল অনবরত সাগরস্রোতের গতিবিধি হইতেছে। সেতুটীর চতুর্দ্দিকেই সাগরসলিলে পরিপূর্ণ। আহা! কি অপরূপ মনোহর দৃশ্য! এই সমস্ত ভগবানের অসাধ্যসাধন লীলাখেলা দর্শন করিলে সুখী হইবেন, সন্দেহ নাই।

ষ্টীমারখানি রামেশ্বর দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র ঘাট মাঝিরা নিয়মানুসারে কতকগুলি নৌকা পাঠাইয়া যাত্রীদিগকে তীরে পৌছিয়া দেয়। এই তীর হইতে ভুবনবিখ্যাত রামেশ্বরদেবের দেবালয় অন্যূন তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত, কিন্তু যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য রেলওয়ে কোম্পানী এই তিন ক্রোশ পথের জন্য রেল বিস্তার করিয়া কত সুবিধা করিয়াছেন, তাহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এই সাগরতীর হইতে ছোট রেলযোগে বিনা কষ্টে ভারতের শেষ সীমায় ঐ প্রাচীন পবিত্র তীর্থ স্থানের নিকট যে ষ্টেশন আছে, তথায় নির্ব্বিঘ্নে পৌছান যায়। পম্বান নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া কেবল চালাঘর, তন্মধ্যে একটী পাকা ছত্রবাটী ও কয়েকখানি দোকান ঘর দেখিতে পাইলাম। এখানে অশ্ব-যান ও গো-যান উভয় যানই ভাড়া পাওয়া যায়। আমরা কিন্তু রেলযোগেই গিয়াছিলাম, সুতরাং যাত্রাকালীন রেলগাড়ী হইতে পথিমধ্যে অনেকগুলি ছত্রবাটী দেখিতে পাইলাম, যাঁহারা এখান হইতে তীর্থ স্থানে হাটাপথে গমন করেন, তাঁহারা এই সকল পান্থশালায় বিশ্রাম করিয়া থাকেন।

এই ষ্টেশন হইতে বহির্গত হইয়া একটী জনশূন্য মাঠ পাইবেন, সেই মাঠ পার হইলে পর আবার একটী পূর্ব্ব পশ্চিম বিস্তৃত রাস্তা পাইবেন, ঐ রাস্তাটী বরাবর রামেশ্বরের মূলমন্দিরের নিকট শেষ হইয়াছে। রাস্তার দুই ধারে সারি সারি আম্র, নারিকেল ও তাল বৃক্ষ সকল দণ্ডায়মান থাকিয়া যেন যাত্রীদিগকে ভগবানের দর্শনের জন্য পথ প্রদর্শন করাইতেছে। পথিমধ্যে এক স্থানে একটী আশ্চর্য্য বৃক্ষ দেখিলাম, যাহার গুড়ির নিম্নার্দ্ধে পাষাণে পরিণত হইয়াছে, অথচ সকলেই এই বৃক্ষটীকে ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া থাকেন।

নগরমধ্যে দেবের বাহন জীবন্ত "হস্তী" সকল তারকেশ্বরের বাহনের

ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে দেখিতে পাইবেন। মূলমন্দিরের সন্নিকটেই যাত্রী থাকিবার বাসা পাওয়া যায়। আপন সুবিধামত এই স্থানে বাসা লইতে হয়। দেবালয়ের বহির্ভাগে যে সকল বাসাবাটীতে অপরাপর যাত্রীরা বাসা লইয়াছেন। উহা দেখিয়া বুঝিলাম, ঐ সকল বাসা বাটীতে এক প্রবেশ দ্বার ব্যতীত অপর কোনরূপ জানালা বা বায়ু প্রবেশের পথ নাই, এরূপ বাসায় বাস করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়, আমাদিগকে কিন্তু ঐরূপ ঘরে থাকিতে হয় নাই, কারণ আমাদের গোমস্তার অনুরোধে পাণ্ডা পূর্ব্ব হইতে তাঁহার নিজালয়ের এক পার্শ্বে এক নির্জ্জন স্থানে আমাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা বেশ স্বাধীনভাবে আমাদের নিকট আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, কেন না এখানে ইঁহাদের অন্তঃপুর অবরোধ প্রথা নাই।

এই তীর্থে গয়াধামের ন্যায় অনেকগুলি পাণ্ডা নিযুক্ত গোমস্তা, চারিধারে পরিভ্রমণ করিয়া 'পাণ্ডাদিগের খতিয়ান বহি সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম ধাম প্রকাশসহকারে যাত্রীদিগকে আয়ত্ত করিতে থাকেন এবং প্রত্যাগমনকালে খাতিয়ান বহিতে তাঁহাদিগকে নাম স্বাক্ষর করিয়া লইয়া থাকেন। এই সকল গোমস্তা বাঙ্গালীদিগকে দেখিতে পাইলে অত্যন্ত যত্ন করিয়া আপন পাণ্ডার নিকট লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন, কারণ পাণ্ডাদের বিশ্বাস, বাঙ্গালী বিশেষতঃ স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিলে তাহার নিকট সকল বিষয়ে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। আমাদের নিকট যে গোমস্তা ঠাকুর ছিলেন, তিনি পূর্ব্ব হইতে আমাদের লোক সংখ্যা পত্র দ্বারা লিখিয়া এখানে পাণ্ডার নিকটে সংবাদ পাঠান, সুতরাং পাণ্ডা বাঙ্গালী যাত্রা অবগত হইয়া আমাদের নিমিত্ত তিনখানি উত্তম গৃহ পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়া-

ছিলেন। আমরা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ভাবী পাণ্ডা গঙ্গাধর পিতাম্বররাম মহাশয় আমাদের নিমিত্ত তত্ত্বাবধানের এবং মোট গাঁটরী বহনের জন্য দুইটী বেহারা পাঠাইয়াছেন। তাহাদের সহিত গোমস্তা ঠাকুর আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট বাসায় লইয়া গেলেন। তথায় যাহা কিছু অভাব ছিল দেখিলাম, পাণ্ডাকে বলাতে তিনি সমস্তই পূরণ করিয়া দিলেন। এই বাসাবাটীতে যাবতীয় মোট গাঁটরী ও আসবাব সকল স্থাপন করিয়া ধুলা পায়ে একবার ভগবান রামেশ্বরজীউর শ্রীচরণ দর্শন প্রার্থনা করাতে পাণ্ডা গঙ্গাধর পিতাম্বররাম ঠাকুর বেশ আদা হিন্দী আদা ইংরাজী মিশ্রিত ভাষায় কথা কহিয়া উপদেশ দিলেন, "বাবুজি! অদ্য বিশ্রাম করুন, আপনারা পথশ্রমে ক্লান্ত, এখান হইতে দেবালয়টী নিকটে অনুমান করিতেছেন, কিন্তু অন্ততঃ দেড় ক্রোশ পথ না হাঁটিলে ভগবান রামেশ্বরজীউর দর্শন লাভ হইবে না।"

তাঁহার উপদেশ বাক্যগুলি আমাদের সকলকার মনঃপুত হইল না, কেন না সকলেই ধুলা পায়ে ভগবানের দর্শন অভিলাষী, কেই বা তাঁহার উপদেশ বাক্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবে। যাহা হউক, কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর আমাদের মনোতুষ্টির নিমিত্ত তিনি একজন পূজারী ব্রাহ্মণকে দেব দর্শনের জন্য সঙ্গে দিলেন। তখন সকলেই আমরা শুদ্ধ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ভগবানের শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিতে বাসা হইতে বহির্গত হইলাম। প্রথমেই বড় রাস্তার উপর দিয়া মূলমন্দিরের প্রথম তোরণ দ্বারে উপস্থিত হইলাম। রামেশ্বর তীর্থ স্থানটা ঠিক্ যেন হরিদ্বারের তীর্থ স্থানের ন্যায় দেখিতে, এখানে পশ্চিমদেশীয় ব্রাহ্মণদিগের অনেকগুলি পুরীর দোকান পথিমধ্যে দেখিতে পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। মান্দ্রাজের ন্যায় আহার্য্য সংগ্রহের জন্য কোনরূপ কষ্ট পাইতে হইবে না। লুচি, কচুরী, সিঙ্গারা এই সমস্ত প্রতি সের আট আনা

রাবরী বার আনায় খরিদ করিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, এই প্রথম তোরণ দ্বার বা গোপুরটী উচ্চে অন্যূন ৬০।৭০ হস্ত দেখিয়াই স্তম্ভিত হইলাম। সন্ধ্যার সময় হইতে মূলমন্দিরের সম্মুখে একটী উজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বালিবার ব্যবস্থা আছে, ঐ আলোকের সাহায্যে যাত্রীরা স্বচ্ছন্দে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকেন, এই উচ্চ গোপুরটীর দুই পার্শ্বে দুইটী অলিন্দা আছে, সেই অলিন্দার মধ্যে কার্ত্তিক ও গণেশজীউর মূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। প্রথম গোপুরের ভিতর দিয়া দেবালয়ে যাইবার প্রস্তর নির্ম্মিত সুন্দর স্তম্ভ, তাহার উপর ছাদগুলি কি শিল্পনৈপুণ্যে প্রস্তুত হইয়াছে, দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। এই পথটি ধরিয়া বহু দূর যাইবার সময় রাস্তার দুই ধারেই ছবির দোকান সকল সজ্জিত দেখিতে পাইলাম। এই রাস্তার দক্ষিণদিকে "মাধবতীর্থ" নামে একটী পুষ্করিণী আছে, উহার জল স্পর্শ করিতে হয়। যে স্থানে এই রাস্তাটী শেষ হইয়াছে, তাহার দুইদিক্ দিয়া দুইটী পথ আছে, ঐ দুইটী পথের মধ্যে যে কোনটী দিয়া গমন করিলেই বরাবর মূলমন্দিরে পৌছিতে পারা যায়। এই দুইটী পথের মধ্যে পূজারী ঠাকুরের উপদেশ মত আমরা দক্ষিণ দিকের পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলাম; কারণ অবগত হইলাম, এই পথের দৃশ্য অতি সুন্দর এবং শীঘ্র মূলমন্দিরের নিকট পৌছান যায়। এ রাস্তাটীও প্রায় পূর্ব্বোক্ত স্তম্ভাবলম্বিত ছাদবিশিষ্ট। ঐ সকল স্তম্ভের রাস্তাগুলিতে যেন বারান্দার মত আছে, কি সুন্দর কারুকার্য্য! কি সুন্দরভাবে সজ্জিত। এই সকল নয়নগোচর হইলে মনে হয়, যেন স্বর্গ দ্বার না বৈকুণ্ঠপুরীতে যাইতেছি। স্তম্ভগুলির নৈপুণ্য স্থাপত্য নয়নগোচর হইলে ঠিক্ যেন চিদম্বরমের কনকসভা বলিয়া ভ্রম হয়। প্রত্যেক স্তম্ভে নানাপ্রকার দেবদেবী ও রাজাদিগের মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এইরূপে এই পথ দিয়া দেবের গর্ভগৃহে উপস্থিত

হইয়া দেখিলাম, একদিকের চাতালে রামনাদের রাজাদিগের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। ইহার পর শিবকুণ্ড নামে আবার একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দৃশ্য অতি মনোহর। এই স্থান হইতে মূলমন্দির পর্য্যন্ত এরূপ অনেকগুলি কূপ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রত্যেক কূপগুলি এক-একটী তীর্থ বলিয়া খ্যাত। মন্দিরের সম্মুখে একটী নন্দী মূর্ত্তি আছে, ঐ মূর্ত্তিটী একখানি আস্ত প্রস্তর হইতে খোদিত হইয়াছে। দেবালয়ের চারিদিকেই হল ও বড় বড় প্রাঙ্গণ, কি অদ্ভুত কাণ্ড! পূজারী ঠাকুর, যিনি আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট উপদেশ পাইলাম। এই মূলমন্দিরের বহির্ভাগের ধূসর বর্ণ প্রস্তরের মণ্ডপটী সেতুপতির দ্বারা নির্ম্মিত। এই বহির্ভাগের মণ্ডপটীর দৃশ্য তত মনোমুগ্ধকর নহে, কিন্তু ভিতরের প্রাকারটী দেখিতে যেমন সুন্দর, কারুকার্য্যগুলিও তেমনি চমৎকার। এই ভিতরের প্রাকারটী মাদুরার রাজগণ কর্ত্তৃক ভারতের নানা স্থানের সুদক্ষ কারীকর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া এখানে স্থাপিত হইয়াছে। ধন্য তাঁহাদের পছন্দ, আর ধন্য যাঁহারা অকাতরে জলস্রোতের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়া আপন আপন কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। স্থানীয় পূজারীর নিকট অবগত হইলাম, যে সকল বহু মূল্য উৎকৃষ্ট প্রস্তর এই মন্দির মধ্যে সংযোজনা করা হইয়াছে, ঐ সকল প্রস্তরগুলি বহু ব্যয় ও যত্নের সহিত সিংহল হইতে খরিদ করা হইয়াছিল। এই রামেশ্বরদেবের মূলমন্দিরটী প্রস্তুত করিতে অভাব পক্ষে পঞ্চাশ যাট বৎসর সময় লাগিয়াছিল, ইহাতেই অনুমান করুন, কত অর্থ এবং কত কষ্টে মন্দিরটী অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াছে এবং এই সকল শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিতে কত সময় অতিবাহিত করিতে হয়। এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, প্রধান পাণ্ডা গঙ্গারাম পিতাম্বর ঠাকুর কি নিমিত্ত আমাদিগকে সেইদিন বিশ্রাম করিতে উপ-

দেশ দিয়াছিলেন। যাহা হউক, দূর হইতে মন্দিরাভ্যন্তরের ডেক্ ঢাকা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন চরিতার্থ করিলাম। এইরূপে দেব দর্শন করিয়া সেদিনকার মত বাসায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিলাম।

এই পুণ্য স্থানে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডার উপদেশ মত নিয়মগুলি পালন করিতে হয়। সর্ব্বপ্রথমেই মহা সমুদ্রতীরে ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণসহকারে সঙ্কল্প করিতে হয়। সঙ্কল্পের সময় পঞ্চরত্ন, যজ্ঞোপবীত, নারিকেল, সুপারি বা হরিতকী ও পুষ্প এবং দক্ষিণাসহ জলেশ্বর বরুণদেবের উদ্দেশে অর্ঘ্য, তৎপরে দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধার কামনা করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। ইহার পর শিব, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী এবং সুগ্রীব, হনুমান, নল, নীল প্রভৃতির উদ্দেশে তিলমিশ্রিত জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হয়, এই সকল নিয়মগুলি যথানিয়মে পালন করিয়া ভক্তিসহকারে সমুদ্রে স্নান করিতে হয়, তৎপরে সাগরতীরের উপরিভাগে যথাবিধি পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, এই সমস্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে কায়-মনোচিত্তে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণ ধ্যান করা কর্ত্তব্য মনে করিবেন, শেষ এক খণ্ড প্রস্তর মন্ত্রপুতসহকারে সাগরতীরে স্থাপন করিয়া এখানকার তীর্থ কার্য্য সমাপ্ত করিতে হয়। বলাবাহুল্য, এরূপ না করিলে এখানকার তীর্থ ফল পাওয়া যায় না।

পর দিবস লক্ষ্মণতীর্থে মস্তক মুণ্ডণসহকারে গো-দান, ভূমি-দান, অন্ন দান, বস্ত্র-দান, স্বর্ণ-দান সাধ্যমতে দানকার্য্য সম্পন্ন করিয়া লক্ষ্মণ-দেব প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণেশ্বর নামক মহা লিঙ্গকে পূজা করিবার নিয়ম। তৎপরে এই তীর্থে স্নান করিয়া ভক্তিসহকারে স্থানীয় দেবতাদিগের দর্শনপূর্ব্বক একটী নারিকেল ভেট দিয়া লক্ষ্মণদেবের অর্চ্চনা করিয়া নিয়মগুলি পালন করিতে হয়। লক্ষ্মণতীর্থের জল ঘোলা—সবুজ বর্ণ

এবং দেখিতে ঠিক্ একটী পুষ্করিণীর ন্যায়, এই তীর্থটী সদর রাস্তার উপর অবস্থিত। ইহার উপরিভাগে যে একটী বাঁধান চাঁদনী আছে, ভক্তগণ পাণ্ডার উপদেশ মত ঐ চাঁদনীর উপর বসিয়া দানকার্য্য সম্পন্ন করেন। এইরূপে লক্ষ্মণতীর্থের নিয়মগুলি পালন করিয়া দ্বীপটীর শোভা দর্শন করিতে যাত্রা করিলাম।

যে প্রশস্ত পথটী ষ্টেশনের নিকট দিয়া বরাবর রামেশ্বরদেবের মূল-মন্দিরের সম্মুখে গিয়াছে, সেই রাস্তার উপর দিয়া পক্প্রণালী নামক সাগরকূলে উপস্থিত হইয়া দ্বীপের দৃশ্য অবলোকন করিয়াই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এ দৃশ্য প্রথমে যিনিই দেখিবেন, তাঁহাকেই স্তম্ভিত হইতে হইবে। কারণ একদিকে ভারত মহাসাগর—অপরদিকে বঙ্গোপসাগর এই দুই সাগরের মধ্যে এখান হইতে বহু দূরে পক্প্রণালীর উপর সেতুবন্ধনের চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। এখানে সাগরদ্বয়ের যে ভীষণ মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, উহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এই ভীষণ তরঙ্গায়িত অকূল সাগর কিরূপে বন্ধন হইয়াছিল, উহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ভগবান ব্যতীত কি কখন এই অসাধ্য-সাধন হইতে পারে? আবার ভাবিলাম, হনুমানই বা কিরূপে এই মহাসমুদ্র এক লম্ফে পার হইয়াছিল। তাই বলিতে হয়, ভগবানের লীলাখেলা এবং মানবদিগকে উপদেশ দেওয়া ছাড়া ইহা আর কিছুই নয়। কি অদ্ভুত ব্যাপার! দেবমায়া ভিন্ন, লীলাময়ের লীলা ব্যতীত এ সকল কি কখন অপরে সম্ভবে? আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাগরের উপর যে স্থানে সেতুটী বন্ধন হইয়াছিল, তাহার দক্ষিণ অংশের জল স্থির ভাব, কিন্তু উত্তর অংশের সলিলরাশি অবিরত তরঙ্গের তরঙ্গ তুলিয়া দর্শকগণের প্রাণে আতঙ্ক সঞ্চার করে। আগন্তুক ঐ তরঙ্গমালার ঘাতপ্রতিঘাতের ভয়ঙ্কর শব্দ দূর হইতে শ্রবণ করিলে কর্ণ বধির

হইয়া যায়। যাহা হউক, এই পম্ববান তীর হইতে যত দূর দৃষ্টি চলে, উহাই দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। পূর্ব্বে যখন ষ্টীমারে উঠি, তখন ইহার দৃশ্য পুষ্করিণীর ন্যায় শান্ত ভাব দেখিয়াছিলাম, কিন্তু সেই পক্-প্রণালীকে এক্ষণে তাহা অপেক্ষা শত গুণ দুরন্তভাব দেখিয়া পূজারী ঠাকুরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তদুত্তরে তাঁহার নিকট উপদেশ পাইলাম যে, এই স্থানে দুই মহাসাগরের ঘাতপ্রতিঘাতের নিমিত্ত এইরূপ অবস্থা দেখিতেছেন। এইরূপে দ্বীপের শোভা দর্শন করিয়া সেদিনকার মত বিশ্রাম করিলাম।

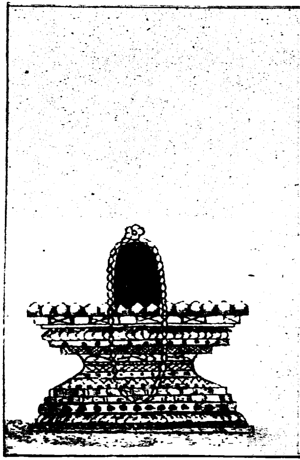
পর দিবস প্রত্যূষে পাণ্ডার উপদেশ মত লক্ষ্মণতীর্থে স্নানপূর্ব্বক শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিয়া শুদ্ধচিত্তে মূলমন্দিরে দেবদেবীর অর্চ্চনা করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলাম। এখানে দেবতার পূজা দিবার কোনরূপ বাঁধা নিয়ম দেখিলাম না, যাঁহার যেরূপ সাধ্য তিনি সেইরূপই পূজা প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু অবস্থাহীন লোকদিগকে পূজার ডালার মূল্যস্বরূপ পাণ্ডার নিকট এক টাকা দিলেই তিনি ভক্তের সম্মুখেই ঐ টাকা হইতে আবশ্যকীয় পূজার দ্রব্য সকল খরিদ করেন এবং রামেশ্বরদেবের মস্তকে গঙ্গাজল খরিদ করিয়া দিবার মূল্য এক টাকা, মোট এই দুইটী টাকা প্রত্যেক ভক্তকে দিতে হয়। ভগবানের পৃথক্ ভোগের নিমিত্ত মানসিক থাকিলে বা ইচ্ছা করিলে সাধ্যানুসারে পাণ্ডার নিকট মূল্য প্রদান করিতে হয়।

যে গৃহে ভগবান রামেশ্বরদেব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সেই গৃহমধ্যে পূজারী ব্যতীত অপর কেহ, এমন কি ভক্ত নিজে ব্রাহ্মণ হইলেও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পান না। দেবালয়ের সম্মুখভাবে যে নাটমন্দির আছে, ভক্তগণ ঐ নাটমন্দির হইতে ভগবানের দর্শন লাভ করিয়া জীবন ও নয়ন চরিতার্থ করিয়া থাকেন। যে বেদীর উপর লিঙ্গরাজ বিরাজ

করিতেছেন, সেই বেদীটী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে অন্যূন তিন ফিট স্বর্ণমণ্ডিত নানা কারুকার্য্যে শোভিত আছে। এই স্বর্ণবেদীর উপর ঊর্দ্ধে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত বাহির থাকিয়া ভগবান ভক্তগণকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন। পাণ্ডা ঠাকুরের নিকট উপদেশ পাইলাম, এই অনাদী লিঙ্গটী "জ্যোতিঃলিঙ্গ" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। পূজার সময় ব্যতীত লিঙ্গরাজ সর্ব্বদা ৺তারকেশ্বরের লিঙ্গ মূর্ত্তির ন্যায় ডেক্ ঢাকা থাকেন, অর্থাৎ মূল লিঙ্গের উপর একটী সর্পফণাবিশিষ্ট ডেক্ দ্বারা আবৃত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করেন। পাঠকবর্গের চিত্তরঞ্জনের নিমিত্ত লিঙ্গ-রাজের মূল আদিমূর্ত্তি ও ডেক্ ঢাকা মূর্ত্তি, এই দুই মূর্ত্তিরই চিত্র প্রদত্ত হইল।

রামেশ্বরদেবের নাটমন্দিরের সম্মুখে একটী সোণার তালগাছ শোভা পাইতেছে। ইহার দক্ষিণদিকে অষ্টধাতু নির্ম্মিত শ্রীরামসীতা ও হনু-মানের প্রতিমূর্ত্তি দর্শন পাইবেন। এই মূর্ত্তিত্রয়ের সন্নিকটেই বানর-রাজ সুগ্রীবেরও একটী মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। যে দেবের দর্শনের কাঙ্গাল হইয়া কত অর্থ, কত কষ্ট, কত পর্ব্বত, কত নদ, কত নদী অতিক্রম করিয়া এই পবিত্র স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, আজ করুণাময় রামেশ্বরজীউর কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া ঐ মহাব্রত উদ্যাপন করিয়া জীবন ও নয়ন সার্থক বোধ করিতে লাগি-লাম। ধন্য রামেশ্বরদেব! ধন্য তোমার মহিমা! ভগবান রামেশ্বরদেবের শ্রীচরণে ভক্তিসহকারে ভক্তি দান করিয়া অভিলাষিত প্রার্থনা ভিক্ষা করিলাম এবং মন্দিরটী প্রদক্ষিণপূর্ব্বক শ্রীশ্রীরামেশ্বরীদেবীর অর্চনার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

প্রতি বৃহস্পতিবারে ভগবান রামেশ্বরদেবের উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। সেই সময় এই পবিত্র মূর্ত্তির যে ভোগমূর্ত্তি আছে, সে



শ্রীশ্রীরামেশ্বর দেবের
আদি মূর্ত্তি—১৫২ পৃষ্ঠা।



শ্রীশ্রীরামেশ্বরী দেবীর
প্রতিমূর্ত্তি—১৫৫ পৃষ্ঠা।



শ্রীশ্রীরামেশ্বর দেবের ঢেকঢাকা
মূর্ত্তি—১৫২ পৃষ্ঠা।

মূর্ত্তিটীকে লইয়া এই মন্দিরটী প্রদক্ষিণ করান হয়। প্রতি সোমবারে ৺তারকেশ্বর স্থানে যেরূপ যাত্রীদিগের সমাগম হয়, এখানেও সেইরূপ প্রতি বৃহস্পতিবারে তদপেক্ষা অধিক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এত বড় দেবালয় ও নাটমন্দিরে তখন তিলার্দ্ধ স্থান থাকে না।

রামেশ্বরদেবের পূজার প্রধান অঙ্গ, বিল্বপত্র ও গঙ্গাজল, সেই গঙ্গাজলই এখানে সংগ্রহ করা কঠিন, ছোট এক শিশি গঙ্গাজলের মূল্য এক টাকা। ইহার কারণ এই যে, কাশীর উত্তরগামিনী গঙ্গা হইতে শুদ্ধচিত্তে শুদ্ধাচারে পদব্রজে এই জল আনীত হইয়া এখানে এত উচ্চ দরে বিক্রীত হইতে থাকে।

প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে অন্ততঃ একজনকে ভগবানের ষোড়শোপচারে পূজা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই পূজার দ্রব্যাদি খরিদ, ব্রাহ্মণের দক্ষিণা, সহকারী বেদ পাঠকারীর মজুরী প্রভৃতির মোট খরচ ৫৷৷॰ টাকা ধার্য্য আছে। এই মূল্য পাণ্ডার নিকট প্রদান করিলে তিনি স্বহস্তে আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী খরিদ করিবেন এবং যে যে বাবুদে উক্ত ৫৷৷॰ টাকা খরচ হইবে, তাহার একটী হিসাব দেখান। যিনি সহস্র বিল্বপত্র দ্বারা গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করিয়া ভগবানের অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে পৃথক্ একটী টাকা এই মাঙ্গলিক কার্য্যের জন্য দিতে হয়। প্রত্যেক যাত্রীকে ৵॰ হিসাবে দেব দর্শনের জন্য ভেট দিতে হয়। ইহাই এখানকার নিয়ম দেখিতে পাইলাম। যে ব্যক্তি ষোড়শোপচারে ভগবানের পূজা প্রদান করিবেন, স্বয়ং পাণ্ডা তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া ভক্তের নাম, গোত্র উচ্চারণসহকারে সঙ্কল্পপূর্ব্বক দেবার্চ্চনা করিয়া থাকেন এবং পক্কান্নের ভোগ, কর্পূরারতি যাবতীয় নিয়ম সকল পালন করেন, অর্থাৎ ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া বিল্বপত্র পুষ্প ও চন্দন প্রদানে ভগবানকে সজ্জিত করিয়া ঐ

ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করেন। এই পূজার সময় অপর তিনজন পূজক সমস্বরে বেদ পাঠ করিয়া পাণ্ডাব সহায়তা করেন, তাঁহাদের দক্ষিণা আর পৃথক্ দিতে হয় না। আমরা ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা করিয়া ভোগের নিমিত্ত পৃথক্ একটী টাকা দিয়াছিলাম। পাণ্ডা ঐ মূল্য হইতে স্বহস্তে পাক করিয়া রামেশ্বরদেবকে সেই অন্নভোগের মালসাটী উৎসর্গ করিলেন, তৎপরে প্রসাদস্বরূপ ঐ ভোগের মালসা আমাদের বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

এই ভগবান রামেশ্বরদেবের সেতুপতি প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি হইতে বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা আয় নির্দ্ধারিত আছে, অবশিষ্ট যাত্রী-দিগের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। দেবালয়টী সেতুপতির অধীন। রাজাই এখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা, তাঁহার প্রতিনিধির হুকুম ব্যতীত এখানে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। রামেশ্বর দ্বীপটী দৈর্ঘ্যে ২৪ মাইল, কিন্তু ইহার বিস্তৃতি কোথাও ছয় মাইলের অধিক নাই। পাম্বাবানই এই দ্বীপের প্রধান নগর, এই দ্বীপটী মাদুরা জেলার একটী সবডিভিসন মাত্র। এখানে একজন সবডিভিসনাল অফিসার থাকেন, তাঁহার নিমিত্ত একটী মুন্সেফ কোর্টও আছে। এই কোর্ট প্রভৃতি সমুদ্রের ধার হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। প্রত্যহ এই দেবালয় হইতে অতি কম পঞ্চাশ টাকা প্রণামী সংগৃহীত হয়, ইহার মধ্যে যাত্রী-সংখ্যা অধিক হইলে আয়ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শিবরাত্রির সময় এই স্থানে অত্যন্ত জনতা হয়। অবগত হইলাম, কেবল সেই এক রাত্রিতেই পাঁচ হাজার টাকার অধিক প্রণামী সংগৃহীত হয়। এখানে যতগুলি অধিবাসী আছেন, তন্মধ্যে অর্দ্ধেকগুলি ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণগুলি কেবল পাণ্ডাবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এইরূপ পাণ্ডা এখানে অন্যূন ছয় সহস্র আছেন।

রামেশ্বরদেবের মন্দিরের নিকটেই রামেশ্বরীদেবীর মন্দির বিরাজমান। এখানেও একটী সোণার তালগাছ আছে, মন্দিরাভ্যন্তরে জগজ্জননী চারি হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক নানাপ্রকার বহু মূল্য জরোয়া অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া ভক্তদিগকে দর্শনদানে উদ্ধার করিবার জন্য পুরী আলোকিত করিয়া আছেন। কি অপরূপ মাধুরী মূর্ত্তি, মা যেন হাস্য করিতেছেন। আমরা সকলেই ঐ অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তির শ্রীচরণে ভক্তিদান করিয়া অভিলাষিত বর প্রার্থনা করিলাম এবং মন্দিরটী প্রদক্ষিণ করিলাম। এই দেবীর অর্চ্চনার সময় কাশীধামে অন্নপূর্ণাদেবীর অর্চ্চনার ন্যায় শাঁখা, রুলি, সিন্দুর, সিন্দুর-চুমরী (বায়সাজ) লোহা, স্বর্ণের একটী নথ, লালপাড় সাড়ি সাধ্যমতে কিঞ্চিৎ মসলা, কর্পূর, থালা, গেলাস প্রভৃতি ও দক্ষিণাসহ মহাদেবীকে অর্চ্চনা করিয়া আপনাদিগকে ধন্য বোধ করিতে লাগিলাম।

রামেশ্বরদেবের ন্যায় দেবীরও প্রতি শুক্রবারে রাত্রিকালে মহাসমারোহে উৎসব সম্পন্ন হয়। ভক্তগণ ঐ দিবস উপবাস করিয়া থাকেন এবং মায়ের উৎসব সম্পন্ন হইলে পর সকলেই প্রসাদ লইয়া জল গ্রহণ করেন। এই উৎসবকালে বিবিধ প্রকার আলোকমালায় সজ্জিত ও হরেক রকম বাদ্যসহকারে মায়ের যে একটী ভোগ মূর্ত্তি আছে, সেই মূর্ত্তিটীকে সিংহাসনোপরি স্থাপিত করিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করান হয়। এই সময় মন্দিরের আশে-পাশে যে যে স্থানে অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই সেই স্থানে মায়ের ভোগ মূর্ত্তিটী স্থাপিত করিয়া আরতি করান হয় এবং চতুর্দ্দিকে পুষ্প বৃষ্টি করিতে করিতে চিরপ্রথানুসারে অতি সমারোহে এই শোভা যাত্রা সম্পন্ন হয়। প্রদক্ষিণের পর প্রাঙ্গণের মধ্য স্থলে ভোগ মূর্ত্তিটীকে স্থাপিত করিয়া পূজা করা হয়, এই সময় চারিদিকে সমস্বরে বেদ পাঠ হইতে থাকে,

বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য মহাবীর হনুমানকে গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিশল্যকরণী আনিতে উপদেশ দেন, তখন হনুমান পিতা পবনদেবের শরণাগত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার কৃপায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বিশল্যকরণীর কোন সন্ধান করিতে পারেন নাই, সুতরাং কি করিবেন, কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, বীরবর পর্ব্বতের যে অংশে বৃক্ষলতাদি জন্মিয়াছে দেখিলেন; গন্ধমাদনগিরির সেই অংশ অবলীলাক্রমে উৎপাটন করিয়া আপন মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক লঙ্কাপুরে আনয়ন করিলেন এবং ধর্ম্মাত্মা বিভীষণকে গিরিস্থিত বিশল্য-করণীর সন্ধান করিতে অনুরোধ করিলে বিভীষণ ঐ করণীর সাহায্যে লক্ষ্মণদেবকে অনায়াসে পুনর্জীবিত করিলেন, এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া বলিতে হয়, ভগবান জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীরামরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, কেন না যিনি স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম, যাঁহার ইঙ্গিতমাত্র সৃষ্টি স্থিতি-লয়প্রাপ্ত হয়, আজ কিনা সেই মহাপুরুষকে অনুজ লক্ষ্মণের জন্য হা লক্ষ্মণ! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া শোকাতুর হইতে হয়? যে লক্ষ্মণ পুরাণ মতে সাক্ষাৎ নারায়ণের চক্র, রামায়ণ মতে সাক্ষাৎ অনন্ত দেব, যিনি নারায়ণের অংশ, যাঁহার শরীর অভেদ্য, সেই দেবের আবার বিপদ কিসের? যে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম, তাঁহার হৃদয়ে কি শোক কখন স্থান পায়? আবার সেই রামচন্দ্রকে রাবণ বধের জন্য বানররাজ সুগ্রীবের কি সাহায্য লইতে হয়? যে সুগ্রীব তপনদেবের ঔরসে এই দুর্জ্জয় রাবণকে বিনাশ করিবার জন্যই বানররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন সেই নারায়ণ শ্রীরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সাহায্য না লইবেন কেন? যে সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী—যাঁর কটাক্ষমাত্র রাবণ ভস্ম হইতে পারিত, আজ কিনা সেই জনকনন্দিনী সীতাদেবীকে আজ্ঞাধীন হইয়া অশোকবনে অবরোধ থাকিয়া নানা প্রকার রাক্ষ

রূপধারিণী চেরীদিগের যন্ত্রণাভোগ সহ্য করিতে হয়? যে হনুমানের মরুৎ হইতে উৎপত্তি। যিনি পবন পুত্র নামে অবনীমাঝে পরিচিত, যে বীরের দেহ বজ্র অপেক্ষাও দুর্ভেদ্য ও যাহার গতি গরুড়ের ন্যায়। যিনি শঙ্করের আশীর্ব্বাদে পরাক্রমে শঙ্করসম। সেই হনুমানের কি কিছু অসাধ্য হইতে পারে? রাবণ অতিশয় ভক্তিমান ছিলেন, তিনি ব্রহ্মাকে ভক্তিডোরে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার কৃপায় তাঁহারই বলে বলীয়ান হইয়া যদিও অমর বর পান নাই, তথাপি প্রকারান্তে তিনি অজেয় হইয়াছিলেন, কিন্তু নর ও বানর রাক্ষসদিগের ভক্ষ্য বস্তু, উহাদের দ্বারা তাহার কোনরূপ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া ইহাদিগকে তাচ্ছল্য করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত নারায়ণ নররূপে অবতীর্ণ হইয়া বানরের সাহায্যে রাবণকে বিনাশপূর্ব্বক উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাই আবার বলি—সকলই দেবলীলা, তিনি লীলাখেলা প্রকাশ ছলে জীবদিগকে মহান শিক্ষা দিবার জন্যই এইরূপ লীলা করিয়া দেখাইতেছেন, যে মানবজন্ম ধারণ করিলে রোগ, শোক, মোহ ও কর্ম্মফল এই সমস্তের অধীনে থাকিতে হয়।

ভগবান্ নারায়ণ, রাজা দশরথের পুত্রত্ব স্বীকার করিলে "স্বয়ম্ভূ"-সুর সমূহকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দেবগণ! আমাদিগের হিতকারী সত্যসন্ধ মহাবীর বিষ্ণুর কামরূপী সহায় সকল সৃজন কর। উহারা মায়াবী, শূর, গমনে বায়ুবৎ, বুদ্ধিমান, পরাক্রান্ত, অবধ্য ও বিবিধ উপায়জ্ঞ, সর্ব্বগুণান্বিত ও অমৃতভোজীর ন্যায় যেন অমর হয়। সম্প্রতি তোমরা আমার উপদেশ মত গন্ধর্ব্বী, যক্ষী, অপ্সরা, বিদ্যাধরা, পন্নগী ও বানরীদিগের গর্ভে তুল্য ধনশালী বানর সকলের সৃষ্টি করিতে থাক। তখন দেবগণ ভগবানের আদেশপালনে কপিরূপধারী পুত্র সকল সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে তপনের ঔরসে সুগ্রীব, বৃহস্পতি

হইতে তার, ধনজ হইতে গন্ধমাদন, বিশ্বকর্ম্মা হইতে নল, হুতাসন হইতে নীল, বরুণ হইতে সুষেণ, পর্জ্জন্য হইতে শরভ এবং মরুৎ হইতে হনুমানের উৎপত্তি হইয়াছে এবং পূর্ব্বকালে স্বয়ং স্বয়ম্ভূ জাম্বুবানকে তাঁহার জৃম্ভণ সময়ে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই এক-একটী মহাবীর এবং নারায়ণের সাহায্যার্থেই ইহাদের উৎপত্তি, সুতরাং ভগবান শ্রীরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের সাহায্য লইয়াছিলেন।

লক্ষ্মণদেব পুনর্জীবিত হইলে বিভীষণ আজ্ঞায় হনুমান এই গন্ধমাদন খণ্ডখানি সাগরতীরে পাতিত করেন। ঐ পর্ব্বতের কিয়দংশ এখানে পতিত হইয়া শ্রীরামকার্য্য সাধনপূর্ব্বক তাঁহারই শ্রীচরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন, ইহার ফলস্বরূপ শ্রীরাম আশীর্ব্বাদে পর্ব্বত পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছেন। গিরিরাজ যে স্থানে পতিত হন, সেই দীর্ঘ প্রশস্ত পথ গমনাগমনের সুবিধার জন্য ইংরাজরাজের প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনীয়ারগণ ডিনামাইটের সাহায্যে শত হস্ত পরিমিত স্থান উড়াইয়া ছোট ছোট ষ্টীমার যাতায়াতের পথ নির্ম্মাণপূর্ব্বক সাধারণের কত উপকার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

যে স্থানে গন্ধমাদন পর্ব্বত পতিত হইয়াছিল, তাহার পরই প্রসিদ্ধ রামেশ্বরদ্বীপ শোভা পাইতেছে। এই স্থানে পিণ্ডদান করিবার প্রথা আছে। রামেশ্বরদ্বীপটী অন্যূন দৈর্ঘ্যে চব্বিশ মাইল। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় ঐ দ্বীপটী তদবধি একটী প্রধান তীর্থে পরিণত হইয়াছে। ভগবান রামেশ্বরদেবের মূলমন্দিরটী এই দ্বীপের উপরেই বিরাজমান।

দ্বীপটীর অধিকাংশ স্থানই বাবলা বৃক্ষ এবং বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ। সেতুর স্থানে স্থানে ভগ্ন থাকার কারণ পৌরাণিকমতে সীতাদেবীর উদ্ধারসাধন হইলে ভগবানের প্রত্যাবর্ত্তন সময় সাগর মূর্ত্তিমান হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিয়া তৎস্থানে প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো!

আমার বন্ধন মোচন করুন, নচেৎ শৃগাল, কুক্কুর প্রভৃতি হেয় জীবজন্তু পর্য্যন্ত অনায়াসে আমায় উল্লঙ্ঘন করিবে। সাগরের কাতর প্রার্থনায়, শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণদেব স্বীয় ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা অবলীলাক্রমে সেতুটী তিন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ইহার কতক স্থান পাতিত করেন। মান্নার দ্বীপের যে ভগ্নাংশ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা এই সেতুরই ভগ্নাংশ বলিয়া জানিবেন, এই হেতু ঐ স্থান ধনুষ্কোটী তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই তীর্থে অদ্যাপি বানর দেখিতে পাওয়া যায়।

স্থানীয় পাণ্ডাদের মতে ;—

শ্রীরামচন্দ্র কপি-সৈন্য সমভিব্যাহারে যখন সাগরের উপদেশ মত সেতুবন্ধনে প্রবৃত্ত হন, তখন রাবণের আদেশে বীর রাক্ষস সেনাপতিদিগের কৌশলে বারম্বার ঐ সেতু ভগ্ন হইতে থাকে, তদ্দর্শনে বিভীষণের মন্ত্রণায় শ্রীরামচন্দ্র ঐ সেতুর উপর মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, মহাদেবই রাবণের ইষ্টদেবতা ছিলেন ; তদবধি এই লিঙ্গ এখানে রামেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছেন। লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হইলে পর স্বয়ং মহাদেব মূর্ত্তিমান হইয়া এই সেতুটীকে রক্ষা করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে রাবণ চমৎকৃত হইয়া আসন্ন বিপদের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সসৈন্যে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া পুরী রক্ষার্থে মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র নির্ব্বিঘ্নে সেতু প্রস্তুত করাইয়া অনায়াসে সসৈন্যে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করতঃ স্ববংশে রাবণকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

রামেশ্বর দ্বীপ হইতে চতুষ্কোটী তীর্থ স্থানটী অন্যূন বার ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই স্থানে যাইতে হইলে নৌকাযোগে যাইতে হয়। এই

ধনুস্কোটীর মাহাত্ম্য এত অধিক যে, উহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এই তীর্থে শুদ্ধচিত্তে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ হয় এবং সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানের অশেষ গুণ, এমন কি ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যা, স্ত্রীহত্যা প্রভৃতি মহা পাপ যাহার কোন প্রায়শ্চিত্তের বিধান নাই, সেই সকল গুরুতর পাপের একমাত্র মুক্তিস্থল এই ধনুস্কোটী তীর্থ। কথিত আছে, এখানে পিতৃ-পুরুষদিগের উদ্ধার কামনা করিয়া পিণ্ডদান এবং ভক্তিসহকারে তর্পণ-পূর্ব্বক দক্ষিণাসহ একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে অন্তে পরম গতি লাভ হয়।

তীর্থ স্থানে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ বৃত্তান্ত

তীর্থতীরে পিণ্ডদান ও পুণ্যসলিলে তর্পণ করিলে কি ফললাভ হয়, এ বিষয় অনেকেরই অজানিত। এই নিমিত্ত তাঁহাদের অবগতির জন্য গুটিকতক বিষয় সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল। তর্পণের ভাব—এই এক শ্লোকে পরিষ্কাররূপে জানাইয়াছে, যথা—"পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমং তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥"

ইহার অর্থ—পিতাই আমাদের ধর্ম্ম, পিতাই আমাদের স্বর্গ, পিতাই আমাদের পরম তপ, এখানে তপ অর্থে ব্রত। অতএব একমাত্র সেই পূজনীয় পিতৃ-তুষ্টিসাধন করিতে পারিলে সকল দেবতাই তুষ্ট হইয়া থাকেন। এই কারণে তীর্থতীরে পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ ও তীর্থের পুণ্যসলিলে তর্পণের নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। বলাবাহুল্য, যে দেবী পক্ষের পূর্ব্বে

যে পক্ষ, তাহাকেই পিতৃপক্ষ বলে। এই সময় পুত্রগণ আপন আপন পিতৃ-উদ্দেশে তর্পণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, কারণ এই নির্দ্ধারিত সময়ে দেবগণ নিদ্রাবস্থায় থাকেন, আর পিতৃগণ জাগ্রত অবস্থায় থাকেন, সুতরাং এই পিতৃগণকে ঐ সময় স্মরণ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তীর্থতীরে ইহার কোন নিরূপিত সময় ধার্য্য নাই। ফলতঃ যিনি যে সময়েই এই তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইবেন, সেই সময়কেই ইহার উপযুক্ত সময় মনে করিতে হইবে। তুমি কে? কোন্ বংশজ বা কোন্ ধারা-সংশ্লিষ্ট? তোমার ক্ষমতাই বা কিরূপ? যদি কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন তখন হিন্দু নিশ্চয়ই উত্তর করিবেন যে, ব্যাস, বশিষ্ঠ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, কশ্যপ, অঙ্গিরা ও গৌতম প্রভৃতি মহাত্মাগণ সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যাঁহাদের প্রতিভা প্রভাবে বেদ-বেদান্ত আজ জগন্মান্য, যাঁহাদের তপস্যাপ্রভাবে সাধন তত্ত্বের নানাবিধ পথ আবিষ্কার হইয়াছে, আমি তাঁহাদেরই বংশধর ও গোত্র প্রবরভুক্ত। এই গোত্র আমাদের সমাজ-সমষ্টি রচিত হয়। কোন ব্যক্তির পরিচয় লইতে হইলে তাহার গোত্র-প্রবর ও পিতৃপুরুষের পরিচয় লইতে হয়, কারণ সে একা সমাজে কেহই নহে? সুতরাং বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়, মঙ্গলের নিদানস্বরূপ নান্দীমুখ করিতে হয়। বংশ-পরম্পরায় যে ব্যবহারের ধারা আসে, তাহা ছাড়িবার উপায় নাই, বস্তুতঃ ছাড়িতেও নাই। এই দেখ, আমার পিতৃ-পিতামহের ধারা, তাঁহারা সবাই দেশ-কাল-পাত্র অনুসারে জ্ঞানী ও কর্ম্মী ছিলেন। সুতরাং আমি তাঁহারই বংশজ হইয়া পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তি কামনা করিয়া পিতৃপক্ষে তীর্থের পবিত্র তীরে পিণ্ডদান ও পুণ্যসলিলে তাঁহাদেরই উদ্দেশে তর্পণ করিতেছি। দেবতাগণ এ বিষয় সাক্ষ্য থাকুন, আমি অতীত ইতিহাস ভুলি নাই। আমার অতীত গৌরবের শৃঙ্খলা

যাহাতে অনন্ত ও অজ্ঞেয় ভবিষ্যতে অক্ষুণ্ণভাবে সঞ্চারিত হইতে পারে, সে পক্ষে আমি বিশেষ চেষ্টা করিতেছি, আমার পুত্র ও পৌত্রগণ আমার কার্য্যকলাপ দেখিয়া যাহাতে আমারই অনুকরণ করিতে পারে, সে বিষয়ে আমি তাহাদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিব না।

উপরোক্ত শ্লোকে পিতৃশব্দ সমার্থের ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে পিতার দুইটী অর্থ, প্রথম পিতৃলোক, দ্বিতীয় বংশগত ও ভাগবত পিতা। সংস্কৃত ভাষায় পিতৃশব্দে কেবল জনক বুঝায় না। সপ্তপিতার মধ্যে জনক একজন পিতা। বংশগত পিতা আবার একটু মজার পাত্র তুল্য এবং তজ্জন্য এই দুই প্রকারের পুরুষ লইয়া বংশ তালিকার সৃষ্টি। পুত্র আমি, আমার জনকের সহিত, আমার জন্যই সম্পর্ক, কিন্তু পিতামহের সহিত তুল্য সম্পর্ক, তাই দাদা মহাশয়কে আবার প্রপিতামহ. আমার তুল্যসম্বন্ধীয় পিতামহের জন্য জনক সম্বন্ধে সংবদ্ধ বলিয়া আমার সহিত আমার প্রপিতামহের নিমিত্ত সম্পর্ক, ফলতঃ পিতৃপিতামহগণের মধ্যে ঐ এক পিতাপুত্রের সম্বন্ধ প্রকট আছে—তাই তর্পণ বা শ্রাদ্ধকালে তাঁহাদের নাম গোত্র উল্লেখ করিবার বিধি আছে। এক পিতৃতুষ্টিতে পিতৃগণের তুষ্টি অবশ্যম্ভাবী, এই পিতৃতুষ্টিতে পৈতৃকধারা রক্ষায় সিদ্ধ হইয়া থাকে। আমার বংশ, আমি যাহার, তাহা ও তাহার রক্ষা যাহারা করিতে পারিবে, তাহারাই আমার বংশধর। অর্থাৎ পিতার সন্তান হইয়া পিতার ন্যায় কর্ম্ম করিতে পারিলেই পিতৃধর্ম্মের বা বংশের ধারা-রক্ষা আপনা-আপনিই হইবে।

পিতাই আমার পক্ষে স্বর্গ। স্বর্গ—সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ। আমি যদি পৈতৃক ধর্ম্ম পালন করিতে পারি, তাহা হইলে পিতৃতুষ্টি, ঐ তুষ্টিতে তাঁহাদের কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে আমার জন্য স্বর্গের দ্বার নিশ্চয়ই উন্মুক্ত হইবে। অতি সুখভোগকেই স্বর্গভোগ বলা যায়। পিতাই আমার পরম

শ্রেয়াস্পদ তপস্যাস্বরূপ। যখন পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই স্বর্গ তখন পিতৃত্ব রক্ষাই আমার জীবনের একমাত্র তপস্যাস্থল, ইহকালে মানবজীবনে ইহাই একমাত্র মুক্তিব্রত ধরিতে হইবে।

আমার দেশ, আমার জাতি, আমার মনুষ্যত্ব—আমার আমিত্বের পরিস্ফুরণে নির্ভর করিতেছে। যখন আমার আমিত্বে আমার বংশের ধারার সহিত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ, তখন আমার পিতা নিশ্চয়ই আমার জীবনের একমাত্র তপস্যা বলিতে হইবে। এ হেন পূজনীয় পিতৃতুষ্টিতে আমার সকল সাধ্যসাধনায় দেবতার যে তুষ্টি হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? কেবল ইহাই নহে। ইহার উপর ঋষি তর্পণ, যম তর্পণ, রাম তর্পণ, লক্ষ্মণ তর্পণ আবার পতিতের তর্পণও আছে। পতিত তর্পণ অর্থাৎ আমার সমাজ, আমার জন্মভূমির ভূমিতে যাঁহারা জীবন অতিবাহন করিয়াছেন, কিন্তু কর্ম্মদোষে যাঁহারা বংশধর ও বংশের ধারা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, যাঁহারা দেশের মঙ্গলের জন্য দুর্গমে দেহত্যাগ করিয়াছেন, অথবা যাঁহারা সমাজের দোষে পাপপঙ্কে ডুবিয়া মহামারীর গ্রাসে সবংশে মরিয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা অন্য কোনও জ্ঞাত বা অজ্ঞাত উপায়ে অপঘাতে বা পাপে লিপ্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের তৃপ্তির জন্য যদি কেহ তর্পণ করিতে তাচ্ছল্য করেন, তাহা হইলে তিনি যাবতীয় তর্পণের কোন ফলই লাভ করিতে পারেন না। তাই বলিতে হয়; আমি, আমার পরিবার, আমার বংশ এবং সমধর্ম্মা সকলকে লইয়া, আমার আমিত্বের পুষ্টি ও বিস্তৃতি। আমার আত্মশক্তি এগুলিতে বিসর্পিত। আমার আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটাইতে হইলে এত গুলিকে সামলাইয়া তবে সে শক্তির উদ্বোধন করিতে পারা যায়।

রামেশ্বর দ্বীপের পরই ১৬ মাইল ভাঙ্গা সেতু। জোয়ারের সময়

ভগবানের অসীমসৃষ্টি স্থানের মধ্যে বাস করিয়া কেহ ঐশ্বর্য্য, কেহ ধর্ম্ম, কেহ মুক্তি, কেহ বা ততোতিক আর কিছু প্রাপ্তির আশায়, আবার কেহ বা বিলাসভোগ করিবার জন্য কামনা করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন। তাঁহাদের সেই কর্ম্মটী সম্পূর্ণ সম্পন্ন হইলে অবশ্যই করুণাময় কৃপা করিয়া তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। অতএব মুক্তি কামনাপূর্ব্বক সেই অগতির গতি একমাত্র পতিতপাবন বাঞ্ছাকল্পতরুর শ্রীচরণ ধ্যান করা কর্ত্তব্য।

রামঝড়ণার পরই সুন্দর কেল্লাযুক্ত ম্লান্নার নগর শোভা পাইতেছে। এই দ্বীপটীতে বহু লোকের বসতি আছে, ইহা ৮ ক্রোশ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাহার পরই প্রায় ক্রোশব্যাপী ভাঙ্গা স্থান দেখিতে পাইবেন। এই ভাঙ্গা সেতুর পরই রাবণ রাজার রাজধানী বা স্বর্ণপুরী লঙ্কা। এখানে এই স্থানের সেতুর দুই পার্শ্বেই জল কম দেখিতে পাইবেন, কারণ সেতুর ভগ্নাংশ এই স্থানে পতিত আছে, সুতরাং কেবলমাত্র ছোট নৌকার সাহায্যে সকলেই অক্লেশে গমনাগমন করিয়া থাকেন। রামেশ্বর দ্বীপ হইতে ধনুস্কোটী পর্য্যন্ত কত কষ্ট সহ্য করিয়া স্বর্ণপুরীর শোভা দেখিতে পাইব ভাবিয়া আসিলাম সত্য, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে বিভীষণের বাটী বা স্বর্ণপুরীর কোন চিহ্নই দেখিতে পাইলাম না, যে বিভীষণ ব্রহ্মার বরপ্রভাবে অমরত্ব লাভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় লঙ্কেশ্বর হইয়াছেন, সেই বিভীষণের বাসস্থানের কোন নিদর্শন পাণ্ডারা এখানে দেখাইতে পারিলেন না। পাণ্ডার নিকটে উপদেশ পাইলাম, উত্তর সিংহলে রাবণ রাজার বাটী ছিল, এক্ষণে ঐ সমস্ত পুরী সমুদ্রগর্ভে লীন হইয়াছে। তবে এই স্থানই যে লঙ্কাদ্বীপ তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কারণ তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিলাম, শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ভগবান রামেশ্বরদেব ও এই সেতু।

রামেশ্বর দ্বীপ হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত মোট চব্বিশটী প্রসিদ্ধ তীর্থ বর্ত্তমান আছে, এতদ্ভিন্ন বিস্তর উপতীর্থও আছে, যথানুক্রমে ঐ সকল তীর্থের নাম ও মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইল ;—

১। শিবতীর্থ

এই তীর্থ স্থানটী একটী মন্দিরমধ্যে শ্রীশ্রীরামেশ্বরীদেবীর দেবালয়ের সম্মুখভাগেই অবস্থিত আছে। স্বয়ং মহাদেব এই তীর্থটী খনন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম শিবতীর্থ হইয়াছে। ভক্তিপূর্ব্বক ইহাতে স্নান করিলে মহেশ্বরের কৃপায় সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

২। চক্রতীর্থ

পুরাকালে ধর্ম্ম যখন এই স্থানে মহেশ্বরের তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি স্নানার্থে এই পুষ্করিণীটী খনন করিয়া উহার নাম ধর্ম্ম পুষ্করিণী রাখেন। এই পুষ্করিণীর তীরে গালব মুনি নিরাহারে অযুত বর্ষ বিষ্ণুর তপস্যা করেন। একদা ভগবান বিষ্ণু তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া অভিলাষিত বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলে, মহামুনি গালব সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণের অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে এই নিবেদন করিলেন, "ভগবান! যদি সদয় হইয়া থাকেন, তাহা হইলে চিরদিন যেন আপনার শ্রীচরণে আমার অচলা ভক্তি থাকে, এই বর প্রদান করুন।"

শ্রীহরি তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বলিলেন, "মুনিবর! তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।"

তখন গালব অবনত মস্তকে সেই পরম পুরুষের শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন, "প্রভো! ব্রহ্মা যাঁহার জ্ঞানযোগ ব্যতীত দর্শন পান না, সেই শ্রীহরিকে আজ সৌভাগ্যক্রমে আমি স্বচক্ষে দর্শন করিলাম, ইহা অপেক্ষা "বর" আর কি হইতে পারে? আমার কোন বরের আবশ্যক নাই।"

নারায়ণ, মুনির উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া এই উপদেশ প্রদান করিলেন যে, "ঋষিবর! তুমি আমার আদেশ মত এই স্থানে থাকিয়া আমার তপস্যা কর, দেহান্তে আমার স্বরূপ্য লাভ করিবে। কিন্তু ইত্যবসারে যদি তোমার কোনরূপ বিপদ উপস্থিত হয়, আমায় স্মরণ করিলেই আমার চক্র তোমায় উদ্ধার করিবে। এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন। তদবধি গালব ঋষি এই ধর্ম্ম পুষ্করিণীর তীরে ভগবানের তপস্যায় রত ছিলেন। একদা দুর্দ্দম নামক এক রাক্ষস (শাপভ্রষ্ট বশিষ্ঠ) ক্ষুধায় কাতর হইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং গালব ঋষিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে ঋষি সহসা এই বিকট মূর্ত্তি ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষসকে সম্মুখে দেখিয়া প্রাণ ভয়ে বিষ্ণুর কৃপা প্রার্থনা করিবামাত্র, ভক্তবৎসল হরি ভক্তের ত্রাণের জন্য চক্র দ্বারা ঐ রাক্ষসকে সংহারপূর্ব্বক (বশিষ্ঠ-দেবকে) উদ্ধার করিলেন, যে স্থানে এই ঘটনা হয়, তদবধি সেই স্থান চক্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এই চক্রতীর্থের উত্তরভাগে দেবীপত্তন ও নবপাষাণ প্রতিষ্ঠিত আছে। মহীষাসুরের যুদ্ধে শঙ্করী যখন অসুরকে মুষ্টি প্রহার করেন, তখন অসুর ভীত হইয়া ক্রমশঃ দক্ষিণ সাগরের দিকে পলাইতে থাকে, দেবীও তৎপশ্চাৎ অনুসরণ করেন, তদ্দর্শনে মহীষ প্রাণ রক্ষার জন্য এই ধর্ম্ম পুষ্করিণীটি সম্মুখে পাইয়া ইহারই মধ্যে লুকাইত হইল। অশরিরী-বাণী এই বিষয় ভবানীদেবীকে জ্ঞাপন করিলে, দেবী মৃগেন্দ্রকে ঐ

পুষ্করিণীর জল নিঃশেষ করিয়া পান করিতে আজ্ঞা করেন, মৃগেন্দ্র দেবীর আজ্ঞা পালন করিলে অসুর দেবীর নেত্রপথে পতিত হইবামাত্র তিনি তাহাকে বিনাশ করিলেন এবং তদোপরি এই স্থানে একটী পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া আপন কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম দেবীপত্তন হইয়াছে, আর নবপাষাণ—সেতুর প্রথমেই শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক স্থাপিত আছে। এই পুণ্য স্থানে স্নানপূর্ব্বক পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া যথানিয়মে সাত খণ্ড প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে হয়।

৩। গন্ধমাদনপর্ব্বত

এই পর্ব্বত এক্ষণে রামেশ্বরদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্ব্বাদে এই পর্ব্বত এখানে পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে, এই হেতু গন্ধমাদনে পিণ্ডদান করিতে হয়। পিতৃপুরুষদিগের পক্ষে পিণ্ডদান করিবার জন্য এখানে একটী নির্দ্দিষ্ট স্থানও আছে। কথিত আছে, গন্ধমাদন পর্ব্বতের পবিত্র বায়ু অঙ্গে লাগিলে মহাপাতক নাশ হয়। এখান হইতে ধনুস্কোটী পর্য্যন্ত যাবতীয় চব্বিশটী প্রসিদ্ধ তীর্থই এই পর্ব্বতের উপর অবস্থিত আছে।

৪। বেতাল বরদ তীর্থ

গন্ধমাদনের উত্তরদিকে অবস্থিত, ইহাতে ভক্তিসহকারে স্নান করিলে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

তীর্থটীর কিম্বদন্তী এইরূপ ;—

মহামুনি গালবের "কান্তিমতী" নামে এক পরমাসুন্দরী যুবতী কন্যা ছিল, একদা তিনি পিতার পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিয়া আসিবার

সময় পথিমধ্যে "সুদর্শন ও সুকর্ণ" নামে দুই বিদ্যাধর কুমারদিগের নয়নপথে পতিত হন, তাঁহারা এই নবযৌবনসম্পন্না সুন্দরীর অপরূপ-রূপ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া নানাপ্রকার প্রলোভন বাক্যে বশীভূত করিবার প্রয়াস পান, কিন্তু কিছুতেই যুবতীর পবিত্র মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিলেন না, অবশেষে সুদর্শন ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া কামোন্মত্ত হইয়া তাঁহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক বিমানে উত্তোলন করিয়া আপন গন্তব্য স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ঐ সময় সুকর্ণ ইহাতে কোনরূপ বাধা প্রদান করেন নাই। কান্তিমতী এই বিদ্যাধর কুমার-দ্বয়ের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। এদিকে ঋষিবর, কান্তিমতীর বিলম্ব দেখিয়া ধ্যানযোগে সমস্ত অবগত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্নেহের পুত্তলী আপন কন্যাকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রস্তুত হই-লেন। ঋষিবর নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া এই কন্যার নিকট আদ্যো-পান্ত সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া সুদর্শনের গর্হিত আচরণে ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে এই বলিয়া অভিসম্পাৎ প্রদান করিলেন যে, "তুই যেমন কামান্ধচিত্তে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া এই কুকর্ম্মে রত হইয়াছিস। ইহার প্রতিফল স্বরূপ আমার বাক্যানুসারে মানবদেহ ধারণ করিয়া সংসার মাঝে নানাপ্রকার কষ্টভোগ কর এবং আমার বাক্যানুসারে সহসা বেতালত্ব প্রাপ্ত হইয়া মাংস ও শোণিত ভুক হ, আর সুকর্ণের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকেও দোষী সাব্যস্ত করিয়া বলিলেন, তুমি একটী বীরপুরুষ উপস্থিত থাকিয়াও যখন এই অত্যাচার নিবারণে কোনরূপ চেষ্টা পাও নাই, তখন আমার বিচারে তুমিও দোষী, অতএব ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তুমিও মানবদেহ ধারণ কর। কিন্তু বিদ্যা-ধর-বিজ্ঞপ্তি-কৌতুককে দর্শন করিলে আমার আশীর্ব্বাদে তুমি এই শাপ

হইতে মুক্তপাইবে। মুনির বাক্য অবসানে তৎক্ষণাৎ তাহারা এক ব্রাহ্মণের গৃহে বিজয়াশোক ও অশোকশর্ম্মা নামে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন। একদা জ্যেষ্ঠ বিজয়াশোক শ্মশানে চিতানল আনিতে যাইয়া শাপপ্রযুক্ত এক শবের কবলস্থ "বসা" পান করতঃ অতি ভয়ঙ্কর মহাকায় তীক্ষ্ণ দংষ্ট্র হইয়া বেতালত্ব প্রাপ্ত হইল। কিন্তু কনিষ্ঠ অশোক ঠিক্ ঐ সময় ঋষির কৃপায় বিজ্ঞপ্তি-কৌতুক নামক বিদ্যাধরের দর্শন লাভ করিয়া স্বরূপত্বপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার পূর্ব্ব শাপ বিষয় ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের বিকট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বেতালরূপী ভ্রাতাকে এই চক্রতীর্থের দক্ষিণ তীরে আনয়ন করিলেন, এইরূপে তথায় গন্ধমাদন পর্ব্বতের পবিত্র বায়ু তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র বিজয়াশোকের বেতালত্ব দূর হইল। যে স্থানে তিনি মুক্ত হইয়াছিলেন, তদবধি ঐ স্থানের নাম "বেতাল বরদ" তীর্থ হইয়াছে।

৫। সীতাসর তীর্থ

এই তীর্থটী গন্ধমাদন পর্ব্বতের এক অংশে অবস্থিত। ইহা দেখিলেই একটী পুষ্করিণী বলিয়া ভ্রম হয়। তীর্থটী পঞ্চ মহাপাতকনাশক বলিয়া স্বয়ং পঞ্চানন এই স্থানে সদাসর্ব্বদা অবস্থান করেন, এই নিমিত্ত মা জানকী এই তীর্থতীরে সর্ব্বজন সাক্ষাতে আপন সতীত্বপ্রভাবে অগ্নি পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক এই পঞ্চ মহাপাতকনাশিনী সলিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়াছিলেন। জনকনন্দিনী সীতার নাম চিরস্মরণীয়া রাখিবার জন্য সেই অবধি মহেশ্বরের আদেশে এই স্থানের নাম সীতাসর হইয়াছে।

৬। ব্রহ্মকুণ্ড

দ্বাপরযুগে একদা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু উভয়ে "জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা"কে—এই সূত্রে বিবাদ উপস্থিত হয়। ব্রহ্মা বলিলেন, "আমিই একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা"। বিষ্ণু বলিলেন, "আমার দ্বারাই এই বিশ্বজগৎ সৃজন হইয়াছে। এইরূপ তর্ক হইতেছে, এমন সময় সহসা সেই স্থানে এক জ্যোতিঃলিঙ্গের আবির্ভাব হইল, তখন তাঁহারা উভয়েই এই লিঙ্গকে মধ্যস্থ মানিলেন, বিবাদ মীমাংসার জন্য তিনি এক অদ্ভুত কৌশল বিস্তার করিয়া বলিলেন, "তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে কেহ "আদিত্য-সঙ্কাশ অনন্তাগ্নি সমপ্রভ" এই অনাদিলিঙ্গের আদ্যন্ত প্রথমে দর্শন করিতে পারিবে, তাহাকেই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া মানিব।"

তৎশ্রবণে ব্রহ্মা কালবিলম্ব না করিয়া আপন বাহন হংসের উপর উঠিয়া উর্দ্ধদিকে গমন করিতে লাগিলেন, আর বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ-পূর্ব্বক মূল লিঙ্গের সন্ধানের জন্য অধোদিকে গমন করিলেন।

কিছুকাল পর বিষ্ণু লিঙ্গের মূল দেখিতে না পাইয়া প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক তৎস্থানে প্রথমেই প্রকাশ করিলেন, আমি আদিলিঙ্গের মূল স্থান দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়াছি।"

ব্রহ্মা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিবেদন করিলেন, "আমি লিঙ্গের আদি অন্ত সমস্তই দেখিতে পাইয়াছি।"

তখন ঐ জ্যোতিঃলিঙ্গ রূপধারী সাক্ষাৎ ভগবান উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া মধুর বচনে হাস্য করিতে করিতে বলিলেন, "চতুরানন! তুমি আমার সাক্ষাতে অকুতোভয়ে মিথ্যা বাক্য কহিতেছ, অতএব আমার আদেশমত নরলোকে তোমায় কখন কেহ পূজা করিবে না। কিন্তু বিষ্ণুর প্রতি সদয় হইয়া বলিলেন, তুমি সত্য বাক্য বলিয়াছ, এই নিমিত্ত

আমার আশীর্ব্বাদে তুমি সর্ব্বত্রই পূজা পাইবে। ব্রহ্মা অকস্মাৎ এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া বিনীতভাবে আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহার স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। ভোলানাথ তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া পূর্ব্ব গুরুতর অপ-রাধ ভুলিয়া সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন,"ব্রাহ্মণ! আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার নয়, অতএব আমার উপদেশ মত তুমি গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাইয়া এই মিথ্যা দোষ প্রশান্তির জন্য তথায় একটী যজ্ঞাহুতি প্রদান কর, ঐ যজ্ঞপ্রভাবে তোমার পাপ নাশ হইবে এবং স্মার্ত্ত কর্ম্মে পূজা পাইবে। ভগবানের আদেশ মত ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া যজ্ঞারম্ভ করিলেন, যজ্ঞ সমাপনান্তে ভগবান যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং পুনরায় ঐ যজ্ঞকুণ্ডে লিঙ্গরূপে আবির্ভাব হইয়া বলিলেন, "চতুরানন! তুমি যে যজ্ঞ করিলে তাহার ফল স্বরূপ মিথ্যা দোষ হইতে মুক্ত হইলে, অতএব এই কুণ্ড সাক্ষীস্বরূপ তোমারই নামে খ্যাত হউক। এখানে যে কেহ ভক্তিসহকারে তোমার এই যজ্ঞকুণ্ডে স্নান করিবে, আমার বরপ্রভাবে তিনি মিথ্যা দোষ হইতে পরিত্রাণ পাইবে, এইরূপ বর প্রদান করিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন।" গ্রীষ্ম ঋতুতে এই কুণ্ডটী শুষ্ক হইলে তখন এক প্রকার ভস্ম, ইহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, যাত্রীগণ যত্নের সহিত ঐ ভস্ম সংগ্রহ করিয়া রাখেন। এই ব্রহ্মকুণ্ডের জল অতি সামান্য, তাহাও নীল বর্ণ, ইহা অপরাপর কুণ্ডের ন্যায় দেখিতে অপেক্ষাকৃত বড়। সরোবরটীর মধ্যভাগে একটী ক্ষুদ্র মণ্ডপ আছে এবং তীরের উপর একটী মন্দির দৃষ্ট হয়।

৭। অমৃতব্যাপীকা তীর্থ

এই তীর্থটী—গন্ধমাদন পর্ব্বতের রামনাথ নামক ক্ষেত্র মধ্যে অবস্থিত। এই ব্যাপীকাতে শুদ্ধচিত্তে স্নান করিলে শঙ্করের কৃপায় কোনরূপ কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই স্থানে বসিয়া শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণদেব, বিভীষণ, হনুমান ও সুগ্রীবর জাম্বুবানাদি রাবণ বধের জন্য মন্ত্রণা করিয়াছিলেন বলিয়া এই ক্ষেত্রটা "রামনাথ ক্ষেত্র" নামে খ্যাত হইয়াছে।

৮। মঙ্গল তীর্থ

এই তীর্থে—বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী সদাসর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্তে বাস করিয়া থাকেন। এমন তীর্থ আর কোথাও নাই, ইহাতে যথানিয়মে ভক্তিসহকারে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে মা লক্ষ্মীর কৃপায় সর্ব্ব অনর্থ বিনাশ হয়। ইহার এমনি মাহাত্ম্য যে, যিনি ভক্তিসহকারে শুদ্ধচিত্তে ইহাতে স্নান করেন, তিনি লক্ষ্মীবান হইয়া সংসারে আজীবন পরিবারবর্গকে লইয়া সুখে কালযাপন করিতে পারেন। এই তীর্থের মাহাত্ম্য অবগত হইয়া দেবতারাও মঙ্গল কামনা করিয়া স্বর্গ হইতে আপদ পরিহারের জন্য ইহাতে স্নান করিয়া থাকেন।

৯। রামতীর্থ

এই তীর্থের অনেকগুলি নাম আছে। কেহ রামকুণ্ড, কেহ রামসর, কেহ রঘুনাথ সর কহিয়া থাকেন, এই সকল নামে যে কোন তীর্থ পাইবেন, উহাকেই রামতীর্থ বলিয়া জানিতেন। এই তীর্থটী প্রস্তর মণ্ডিত একটী বৃহৎ পুষ্করিণীর ন্যায় দেখিতে, সন্নিকটে এক লিঙ্গ প্রতি-

ষ্ঠিত। ইহা অশেষ গুণে অলঙ্কৃত। কথিত আছে, লোকের দুঃখ হরণ করিবার জন্য স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র ইহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই তীর্থে সামান্যমাত্র যাহা দান করিবেন, শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্ব্বাদে উহা বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবান নরাকারে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া নানাবেশে লোকের মঙ্গল কামনা করিয়া ভক্তি ও মুক্তি ফলপ্রদ, মহাপাতকনাশক, নরক যন্ত্রণা নিবারক, সংসারচ্ছেদ কারণ এখানে এই মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই পুণ্যতীর্থে শুদ্ধচিত্তে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিয়া রামেশ্বরদেবকে দর্শন করিলে নরগণ অনায়াসে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে পরম গতি লাভ করিতে সমর্থ হন।

পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথন, গুরুজন নাশ এবং জ্ঞাতি ও বন্ধুবধজনিত মহাপাপ হইতে উদ্ধার মানসে যখন মহাত্মা বেদব্যাসের নিকট উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে এই তীর্থে যথানিয়ম সকল পালনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া স্নান, তর্পণাদি সম্পন্ন করিতে আদেশ করেন। ধর্ম্মরাজ তাঁহার আদেশ পালন করিয়া হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে গো, স্বর্ণ, ভূমি, তিল, বস্ত্রাদি দান করিয়া নিষ্পাপ হইয়াছিলেন। অতএব এই তীর্থে স্নান করিবার সময় সাধ্যমত দান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিলমিশ্রিত জলাঞ্জলিসহকারে তর্পণ করিতে হয়।

১০। লক্ষ্মণ তীর্থ

লক্ষ্মণ তীর্থে যথানিয়মে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিয়া ভক্তিসহকারে লক্ষ্মণদেব প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণেশ্বর নামক মহালিঙ্গকে অর্চ্চনা করিলে, দারিদ্র্য, দুঃখ, মনকষ্ট, রোগ, শোক প্রভৃতি এমন কি অনন্তদেবের কৃপায় ব্রহ্মহত্যা, গুরুহত্যাজনিত মহাপাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কোন ঋপুর্ব্বক এখানে পুত্র কামনা করিয়া একটী যজ্ঞ করিলে আয়ুষ্মান,

গুণবান ও দেবাদ্বিজে ভক্তিমান পুত্র নিঃসন্দেহে লাভ করিতে পারেন। শ্রীরামচন্দ্র রামেশ্বরদেবকে প্রতিষ্ঠিত করিলে শ্রীলক্ষ্মণেরও ঐরূপ একটী লোকহিতকর মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবার বাসনা হইল, তখন ভগবান মহেশ্বর এই স্থানে লিঙ্গরূপে আবির্ভাব হইয়া শ্রীলক্ষ্মণের বাসনা পূর্ণ করিলেন। এই পুণ্য তীর্থের মাহাত্ম্য একবার শ্রবণ করুন। দ্বাপর যুগে ভগবান রামকৃষ্ণ নামে অবনীতে অবতীর্ণ হইলে নৈমিষারণ্যে রাম, সুতকে বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে লিপ্ত হন, ঐ পাপ ক্ষয় জন্য তিনি এই তীর্থে স্নান, ব্রাহ্মণদিগকে বিত্ত, ধান্য, গো, স্বর্ণ ও ভূমি দান করিয়া উক্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ পুরাণে এ বিষয় স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশিত আছে। আহা! যিনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দ, তাঁহার হৃদয়ে পাপ কি কখন স্পর্শ করিতে পারে, কিন্তু লোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি এই প্রকার দান, ধ্যান করিয়াছিলেন। মানবগণ! এই সকল পুরাণোক্ত উপদেশগুলি হৃদয়ঙ্গমপূর্ব্বক শিক্ষা লাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে সকল বিষয়ে সুখী হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই।

১১। অগস্ত্য তীর্থ

মহামুনি অগস্ত্য দাক্ষিণাত্যের গন্ধমাদনের বৈভব অবগত হইয়া তথায় একটী পুণ্যতীর্থ খনন করেন। এই কারণ এই তীর্থের নাম অগস্ত্য তীর্থ হইয়াছে। ভক্তিপূর্ব্বক ইহাতে স্নান করিয়া এই তীর্থ-বারি অল্প পান করিলে মুনির কৃপায় মানবগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন এবং ইহলোকে সর্ব্বপ্রকার সুখী হইয়া অন্তে শিবলোকে স্থান প্রাপ্ত হন।

১২। হনুমৎ কুণ্ড

এই কুণ্ডে শুদ্ধচিত্তে স্নান করিলে মহাপাতক নাশ হয়। কোন পুত্রক ইহার তীরে পুত্রেষ্ঠি যজ্ঞ করিলে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তিনি ঃসন্দেহে সৎপুত্র লাভ করেন।

যে রাবণ ব্রহ্মবীজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, যাঁহার প্রতাপে বেতারা সতত ত্রাসিত হইতেন, যাঁহার পীড়নে দেব, যক্ষ, রাক্ষস ভৃতি সকলেই প্রপীড়িত হইয়া ঘন ঘন ভগবানের নিকট প্রতিকারের ন্য প্রার্থনা করিতেন, যাঁহাদের করুণ প্রার্থনায় সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-দ্মধারী নারায়ণ চারি অংশে বিভক্ত হইয়া শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও ক্রঘ্ন নামে ও সাক্ষাৎ শক্তিকে সীতা নামে পরিচিত করিয়া ঐ দুর্জ্জয় াবণকে বিনাশ করিবার জন্য নররূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, । রাবণ ব্রহ্মাকে ভক্তিডোরে বশীভূত করিয়া তাঁহার কৃপায় অবলীলা-মে সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। যে রাবণ দেবচক্র অবগত না ইয়া সেই শক্তিস্বরূপিণী সীতাদেবীর রূপে মুগ্ধ হইয়া মায়াপ্রভাবে াপন পুরে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই দুর্জ্জয় রাবণকে শ্রীরাম-দ্র সবংশে নিধনপূর্ব্বক সীতাদেবীকে উদ্ধার করিয়া যখন সদলবলে ন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রত্যাগমন করিলেন, সেই সময় তাঁহার ব্রহ্মবধজনিত াপ বিমোচনার্থ মুনি ঋষিগণের উপদেশ অনুসারে এই পবিত্র স্থানে কটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিতে মনস্থ করিলেন। তখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কৈলাস হইতে হনুমানকে একটী লিঙ্গ আনিতে আজ্ঞা করি-লেন। আজ্ঞাপ্রাপ্তে মারুতি পবন বেগে কৈলাসে গমন করিলেন, কিন্তু থায় মহাদেবের দর্শন না পাইয়া তাঁহার তপস্যায় রত হইলেন। হনু-ানের স্তবে তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ মত তাঁহাকে

এক লিঙ্গ প্রদান করিলেন। এদিকে রঘুনাথ হনুমানের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া জানকী কৃত "সৈকত লিঙ্গ" তৎস্থানে শুভলগ্নে প্রতিষ্ঠা করিলেন। হনুমান প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ ব্যবহার অবলোকন করিয়া রোষে ও ক্ষোভে নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। রঘুশ্রেষ্ঠ হনুমানের মন ভাব অবগত হইয়া বিধিপূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, পবননন্দন! তোমার আনীত লিঙ্গটী আমার বাক্যানুসারে দ্বাদশ মহালিঙ্গের মধ্যে অন্যতম হইবে, অতএব তুমি ক্ষোভ পরিত্যাগ কর।"

তৎশ্রবণে হনুমান আরও কুপিত হইয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে দর্পহারী রঘুবীর তাহার দর্প চূর্ণ করিবার জন্য পুনর্ব্বার মধুর বচনে বলিলেন, যদি আমার বাক্য মত তুমি সন্তুষ্ট না হও, তাহা হইলে আমার প্রতিষ্ঠিত এই লিঙ্গটী উঠাইয়া ঐ স্থানে তোমার আনীত লিঙ্গ স্থাপন কর। আমি ঐ স্থানে তোমারই লিঙ্গটী পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিব। তখন মারুতি সানন্দে শ্রীরাম প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গটী দুই হস্ত দ্বারা উঠাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ইহাতে কৃতকার্য্য না হওয়াতে আপন পুচ্ছ দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক প্রাণপণে যেমন উত্তোলন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, অমনি তথা হইতে এক ক্রোশ দূরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং তথায় তাহার মুখ ও নাসিকা হইতে অবিশ্রান্ত রক্তস্রাব হইতে হইতে এক কুণ্ডে পরিণত হইল। কিয়ৎকাল পরে যখন মারুতির চেতনা হইল, তখন আপন ধৃষ্টতা জানিতে পারিয়া যুক্তকরে শ্রীরামচরণ ধ্যান করিতে লাগিলেন। দর্পহারী এইরূপে হনুমানের দর্প চূর্ণ করিয়া ঐ রক্তকুণ্ডের তীরে তাহার আনীত লিঙ্গটী প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং ঐ কুণ্ডের নাম হনুমৎ কুণ্ড প্রচার করিলেন। ভগবান্ এই নিমিত্ত তোমার অপর একটী নাম দর্পহারী হইয়াছে, তুমি কখন কাহারও দর্প

রাখ না। লীলাময়! তোমার যে অনন্তলীলা। তুমি কি ভাবে কখন কি লীলা প্রকাশ কর, আমরা মূর্খ মানব হইয়া উহা কিরূপে তাহা ভেদ করিব প্রভু! এই শিবলিঙ্গটী মহাবীর হনুমান পুচ্ছে বেষ্টন করিয়া কৈলাস হইতে আনিয়াছিলেন বলিয়া লিঙ্গ গাত্রে অদ্যাপিও সেই পুচ্ছ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। হনুমৎ কুণ্ডের উপরিভাগে এক স্থানে একখানি শিলাতে হনুমানের পুচ্ছে বেষ্টিত লিঙ্গের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ হনুমান ভাবিয়াছিলেন, লাঙ্গুল বেষ্টন পরিত্যাগ করিলে পাছে স্বয়ম্ভুনাথ অন্তর্দ্ধান হন। মহাদেবও ভক্তের অনুরোধে মুক্ত হইবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাঁধা থাকিয়া ভক্তের মান বৃদ্ধি করিতেছেন। এই হনুমৎ কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত সোপানশ্রেণীতে শোভিত।

১৩। জটা তীর্থ

এই তীর্থে স্নান করিলে অন্তঃকরণের পাপরাশি ক্ষয় হইয়া শুদ্ধি হয়। এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক আপন জটা শোধন করিয়াছিলেন। শুকদেব, দুর্ব্বাসা ও ভৃগু ঋষি এই সকল মহাত্মাগণও এই তীর্থে স্নান করিয়া মনঃশুদ্ধি পাইয়া ব্রহ্মানন্দময় হইয়াছিলেন, অতএব এই তীর্থ চিত্তশুদ্ধির ও মুক্তিলাভের একমাত্র স্থল।

১৪। লক্ষ্মী তীর্থ ১৫। অগ্নি তীর্থ

যে কেহ কোন বাসনা করিয়া লক্ষ্মী তীর্থে স্নান করেন, মা লক্ষ্মীর কৃপায় তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। আর অগ্নি তীর্থ—এই স্থানে মা জানকী রঘুনাথের বাক্যে সর্ব্বজন সমক্ষে অগ্নি পরীক্ষা দিয়াছিলেন। এই দুই তীর্থে স্নান করিয়া পূর্ব্বে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও মানবগণ

সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সাযুজ্যলাভ করিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কলির প্রকোপে এক্ষণে এই দুইটী মহা তীর্থই সমুদ্রগর্ভে লীন হইয়াছে।

১৬। সুদর্শন চক্র তীর্থ

এই তীর্থ পূর্ব্বে মুনিতীর্থ নামে খ্যাত ছিল, ইহাতে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে ভূত, প্রেত ও পিশাচদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না। পুরাকালে মহামুনি "অগ্নিবধ্র" তপোবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগের ভয়ে সুদর্শন চক্রের আরাধনা করিয়া ঐ সকল রাক্ষসদিগকে এই স্থানে সমূলে বিনাশ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম সুদর্শন চক্র তীর্থ হইয়াছে।

১৭। শঙ্খ তীর্থ

শঙ্খ তীর্থে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে গুরুজনবর্গের অপমানকারক এবং কৃতঘ্ন ব্যক্তির মুক্তিলাভ হয়। ইহা শঙ্খমুনি গন্ধমাদনে বিষ্ণুর আরাধনার সময় স্নানের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সাধারণের হিতার্থে উক্ত তীর্থটী ব্যবহার হইতেছে।

১৮। মানস তীর্থ

এই তীর্থে শুদ্ধচিত্তে ভক্তিপূর্ব্বক স্নান করিলে সকল তীর্থেরই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই নিমিত্ত ইহার অপর নাম সর্ব্বতীর্থ হইয়াছে। পুরাকালে সুচরিত ঋষি বার্দ্ধক্যবশতঃ শক্তিহীন হইয়া পড়েন সুতরাং পুণ্যস্থান গন্ধমাদনে উপস্থিত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেবের তপস্যায় রত হন, একদা মহেশ্বর তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া অভিলাষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, সুচরিত ভগবানকে সম্মুখে পাইয়া এই প্রার্থনা করি-

লেন যে, আমার অভিলাষ মত যেন এই বরপ্রভাবে সকল তীর্থই এই স্থানে উপস্থিত হন, তাহা হইলে আপনার কৃপায় আমি সকল তীর্থ ফল প্রাপ্ত হইতে পারিব, আরও সাধারণের হিতার্থে যে কেহ ইহাতে স্নান করিবেন, আমার এই বরপ্রভাবে তাহারা সকলেই যেন সকল তীর্থের স্নান ফল প্রাপ্ত হন। মহেশ্বর ঋষির মন ভাব অবগত হইয়া তাঁহার সকল বাসনা পূরণ করিবার জন্য "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। এইরূপে সেই পরহিতকারী ঋষিবরের অনুগ্রহে যে কেহ ইহাতে স্নান করেন, তিনিই সকল তীর্থ ফল প্রাপ্ত হন।

১৯। সাধ্যামৃত তীর্থ

এই তীর্থে স্নান করিলে কাহাকে কখনও বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। ইহা সর্ব্বপাপ বিমোক্ষদ ও মুক্তিপদ। পুরাকালে মহারাজ পুরুরবা অভিশপ্ত হইয়া উর্ব্বশীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইলে, তিনি মনের দুঃখে এই স্থানে উপস্থিত হন এবং সাধ্যামৃত তীর্থে স্নান করিয়া পরিতৃপ্ত হন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তীর্থ বৈভববশতঃ তিনি শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পুনর্ব্বার সানন্দে উর্ব্বশীর সহিত মিলিত হইয়া অমরাবতীপুরে মনের সুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

২০। গঙ্গা তীর্থ ২১। যমুনা তীর্থ ২২। গয়া তীর্থ

এই তীর্থত্রয়ে শুদ্ধচিত্তে ভক্তিসহকারে স্নান করিলে দিব্য জ্ঞান লাভ হয়। "রৈবক" মুনি তপস্যা করিয়া তপোবলে দীর্ঘায়ুলাভ করেন, শেষে বৃদ্ধাবস্থায় পঙ্গু ও পাঁমা রোগে আক্রান্ত হন। তখন কোন উপায়ে এই গন্ধমাদনে উপস্থিত হইয়া এই তীর্থত্রয়ে স্নান করিবার অভিলাষ করিয়া যোগপ্রভাবে গঙ্গা, যমুনা ও গয়া তীর্থকে স্মরণ করি-

লেন। তাঁহার তপোন্নতি দর্শনে এই তীর্থত্রয় সন্তুষ্টচিত্তে মূর্ত্তিমান হইয়া মুনি ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মুনিবর! আমরা যখন মূর্ত্তিমান হইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তখন তুমি অনায়াসে আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া তীর্থ ফল লাভ কর এবং আমাদিগের নাম অনুসারে এই স্থান তীর্থ ভূমে পরিণত হউক। এইরূপ উপদেশ দিয়া তাঁহারা আপন আপন স্থানে অধিষ্ঠান হইলেন। অতঃপর যেঁ কেহ এই তীর্থে স্নান করিবেন, তাঁহারা উপরোক্ত তিন তীর্থেরই ফল লাভ করিবেন, বলাবাহুল্য এই তিনটী তীর্থই একটী কুণ্ডে আবির্ভাব হইয়া অবস্থান করিতেছেন।

২৩। ধনুস্কোটী তীর্থ

জনকনন্দিনী সীতাদেবী ভক্ত বিভীষণের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহার অভিলাষ মত নানা অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া স্বর্ণপুরী লঙ্কা হইতে যখন শ্রীরাম স্থানে আগমন করিলেন, তখন রঘুনাথ প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত তাঁহাকে শুদ্ধাচারিণী অবগত হইয়া ও অগ্নি পরীক্ষা দিতে আদেশ করিলেন। সাধ্বীসতী সীতাদেবী শ্রীরাম আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সর্ব্ব দেবতা ও সর্ব্বজন সমক্ষে আপন সতী প্রভাবে অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শ্রীরাম সনে মিলিতা হইলেন, সেই সময় সাগর এই যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রফুল্ল মনে শ্রীরাম রঘুবীরের নিকট করযোরে এই ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন যে, ভগবান! আমার চিরবন্ধন মোচন করুন, নচেৎ শৃগাল, কুক্কুর প্রভৃতি অবলীলাক্রমে আমায় উল্লঙ্ঘন করিবে। সাগরের কাতর প্রার্থনায় তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া অনুজ লক্ষ্মণকে এই সেতুর কিয়দংশ ভঙ্গ করিতে আদেশ করিলেন। তখন অনন্তদেব শ্রীরাম চরণ ধ্যান করিয়া স্বীয় বাহুবলে অব-

লীলাক্রমে ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা সেই সেতুটী তিন খণ্ডে বিভক্তপূর্ব্বক পাতিত করিয়া শ্রীরাম আজ্ঞাপালন করিলেন এবং ধরামাঝে আপন কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। এই নিমিত্ত এই ভগ্ন স্থানের নাম ধনুস্কোটী তীর্থ হইয়াছে।

এই তীর্থ স্থানটী রামেশ্বরদেবের মূলমন্দির হইতে অন্যূন বার ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ধনুস্কোটী নামক পুণ্যতীর্থে যাত্রা করিবার সময় রাত্রি তিনটার সময় নৌকাযোগে যাত্রা করিয়াছিলাম এবং পর দিবস প্রাতঃকালে তীর্থ স্থানে পৌছিয়া যথানিয়ম সকল পালনসহকারে প্রত্যাগমন করিতে সন্ধ্যা হইয়াছিল। বলাবাহুল্য, এই তীর্থ স্থানের উভয় পার্শ্বেই সমুদ্র বিরাজমান। সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকজনিত পাপের মোচন কোথাও হয় না; কিন্তু এই তীর্থে সঙ্কল্পপূর্ব্বক শুদ্ধচিত্তে স্নান করিলে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় উক্ত পাপ হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ইহার সমকক্ষ তীর্থ আর দ্বিতীয় নাই, আরও এই স্থানের মাহাত্ম্যগুণে অশ্বমেধ যজ্ঞ, চতুর্ব্বিধ মুক্তি এবং সহস্র গোদানের ফললাভ হইয়া থাকে।

২৪। কোটীলিঙ্গ

ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রামেশ্বর দ্বীপে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া অভিষেকের জন্য উপযুক্ত তীর্থবারি প্রাপ্ত না হইয়া ধনুস্কোটীর অগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবী ভেদপূর্ব্বক জাহ্নবীদেবীকে স্মরণ করেন। গঙ্গা শ্রীরামচন্দ্রের অভিলাষ মত সেই কোটী সংখ্যক বিবর দিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হন, তখন ঐ পবিত্র গঙ্গাবারিতে দেবের অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎপরে ঋষিদিগের উপদেশ মত তিনি স্বয়ং রাবণ বধজনিত ব্রহ্মবধ নামক মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য এই কোটী

তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন। এই স্নানহেতু তিনি পাপ হইতে মুক্তি পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার হস্তের একটী কাল দাগ মোচন হইল না। অবশেষ নানা তীর্থ পর্য্যটনের পর একদা তিনি নৈমিষারণ্যে স্নান করিবামাত্র সেই দাগের অবসান হয়। রঘুনাথ কোটি তীর্থে স্নান করিয়া সদলে অযোধ্যাপুরীতে যাত্রা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন সর্ব্বশেষে এই তীর্থে স্নানপূর্ব্বক স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন ভক্তগণ! এই স্থানে আসিয়া তীর্থ সকলের বিধিপূর্ব্বক সেবা সমাপনান্তে সর্ব্বশেষে ইহাতে একবার স্নান করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

উপরোক্ত ২৪টী প্রধান প্রসিদ্ধ তীর্থ ব্যতীত এখানে আরও অনেকগুলি উপতীর্থ বিদ্যমান আছে, যথা:—ক্ষীরসর, কপিতীর্থ, গয়াতীর্থ, সরস্বতী তীর্থ, ঋণমোচনতীর্থ, পাণ্ডবতীর্থ, দেবতীর্থ, সুগ্রীবতীর্থ, নলতীর্থ, নীল তীর্থ, গবাক্ষতীর্থ, অঙ্গদতীর্থ, গজগবয়-সরভকুমুদতীর্থ, বিভীষণতীর্থ, নাগবিল তীর্থ ইত্যাদি এই সকল তীর্থগুলি অধিকাংশই কূপের ন্যায়, আবার কোন কোনটীকে ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর ন্যায়ও দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলে যেরূপ চব্বিশটী প্রসিদ্ধ "বন" (লীলা স্থান) পরিক্রমণ করিয়া ভগবানের লীলা সকল স্বচক্ষে দর্শন না করিলে তথাকার সমস্ত তীর্থ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেইরূপ রামেশ্বরদ্বীপেও আসিয়া উপরোক্ত চব্বিশটী প্রধান তীর্থগুলির সেবা না করিলে এখানকার সমস্ত তীর্থ ফল পাওয়া যায় না। এই নিমিত্ত একটী প্রবাদ আছে, "যদি ব্রজমণ্ডলে আসি না করিলি বন, তবে এত নয় সেই বৃন্দাবন।"

বৃন্দাবনে যেরূপ সকল সময়, সকল ঋতুতেই ভক্তগণ গমন করতঃ ভগবানের দর্শন ও লীলা স্থান সকল নয়নগোচর করিয়া জীবন ও নয়ন

সার্থক বোধ করিয়া থাকেন, এখানেও সেইরূপ সকল সময় সকল ঋতুতেই যাত্রীদিগের সমাগম হইয়া থাকে। সকল কার্য্যেরই একটী সময় নিরুপিত আছে, বিশেষতঃ বৃন্দাবনে ঝুলন যাত্রা হইতে জন্মাষ্টমী পর্য্যন্ত আঠার দিনব্যাপী যে মহামারি মহোৎসব হয়, ঐ সময় কত লক্ষ লোকের সমাগম হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে, জন্মাষ্টমীর পর দশমী তিথির অপরাহ্নকালে বন পরিক্রমণের নির্দ্ধারিত সময় আছে, ঐ সময় ভিন্ন আর কখন বন পরিক্রমণের সুবিধা নাই। রামেশ্বরদ্বীপেও সেইরূপ ভাদ্র মাসের শেষ হইতে শীত ঋতুর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত যাত্রীদিগের অধিক সমাগম হইয়া থাকে, কারণ দাক্ষিণাত্য প্রদেশটী একে পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত, তাহার উপর রবি উত্তাপে গ্রীষ্ম ঋতুতে এই স্থান এক উগ্রভাব ধারণ করে, তজ্জন্য পীড়াক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। আবার শীত ঋতুতে এখানে এত বরফ পতিত হয় যে, শীতে লোকের হাত, পা অসার হইতে থাকে, ইহাতেও পীড়াগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা এবং গমনাগমনের পক্ষেও অসুবিধা হয়, বর্ষাকালে বৃষ্টির জন্য দেবদর্শনে ব্যাঘাত ঘটায়। ভাদ্র মাসের শেষে শুভ যাত্রা নিষেধ সুতরাং আশ্বিন হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত এই দুই মাসই রামেশ্বর তীর্থ দর্শনের শুভ সময়, ঐ সময় ভারতের নানা স্থান হইতে দলে দলে ভক্তগণের সমাগম হইয়া থাকে।

এ গ্রন্থে রামেশ্বরের সহিত বৃন্দাবনের তুলনা করিবার উদ্দেশ্য নহে, তবে রামেশ্বর দ্বীপে ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীরামরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া রাবণ বধপূর্ব্বক নরলোকদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন আর বৃন্দাবনে দ্বাপরযুগে সেই ভগবান রামকৃষ্ণরূপে কংসকে বিনাশপূর্ব্বক নানা বিষয় শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। এই দুই স্থানই ভগবানের লীলাভূমি, তজ্জন্য এই দুই স্থানে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়।

ভগবান যুগে যুগেই লক্ষ্মীসহ অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ত্রেতাযুগে সেই লক্ষ্মীস্বরূপিণী মা জানকী নারীরূপে সীতানাম গ্রহণ করিয়া ধরায় চিরকালই দুঃখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি মনদুঃখে নরলোকদিগকে উপদেশ দিয়াছেন যে, কেহ যেন কখন কোন নারীরত্নের নাম সীতা না রাখেন, সুতরাং সেই সাধ্বীসতী সীতাদেবীর উপদেশ মত কোন স্ত্রী সীতা নাম গ্রহণ করেন না।

বৃন্দাবনে যেরূপ চব্বিশটী বন পরিক্রমণ করিতে পনের দিবস সময়ের কম হয় না, সেইরূপ রামেশ্বরও এই সমস্ত চব্বিশটী প্রধান তীর্থগুলির সেবা করিতে এক সপ্তাহের কম হয় না। সে যাহা হউক, এই-রূপে এখানকার তীর্থ সকলের সেবা করিয়া মনের সুখে বাসা বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সেদিনকার মত বিশ্রাম এবং বন্ধুবান্ধবদিগের প্রীতির জন্য কতকগুলি সুরঞ্জিত এখানকার চিত্রমূর্ত্তি সংগ্রহ করিলাম। পর দিবস প্রত্যুষে সুফলের জন্য পাণ্ডা ঠাকুরকে অনুরোধ করিলাম, তখন পাণ্ডা আমাদিগকে স্বীয় আবাসে যাইবার জন্য প্রস্তুত দেখিয়া এক প্রকার এক থালা ভস্ম লইয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সুফল প্রদানপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া সুখী করিলেন পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আমাদের পাণ্ডার নাম গঙ্গাধর পিতাম্বররাম, তিনি অতি মিষ্টভাষী ও সদাশয় লোক, এখান হইতে তাঁহার যেরূপ সুনাম শুনিয়া তাঁহাকেই তীর্থগুরু মান্য করিয়াছিলাম, তথায় তাঁহার ব্যবহারে ততো-ধিক সন্তুষ্ট হইলাম। সুফল করিতে বসিয়া কেবল তিনি একবার মৃদু হাস্যসহকারে আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, যাহারা সুফল লইবেন, তাহারা এক-একখানি ১০৲ টাকার নোট হাতে লইয়া বসুন, তাঁহার আদেশমত আমাদের দল মধ্যে অধিকাংশই একে শূন্য

দশের পরিবর্ত্তে কেবল প্রথম একটী বজায় রাখিয়া তাঁহার মান্য রাখিবার চেষ্টা করিলেন, তাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট ভাব দেখাইলে আমাদের অনুরোধে আর কোনরূপ আপত্তি করিলেন না। বলাবাহুল্য, তখন আমাদের দলের মধ্যে যাহার যেরূপ অবস্থা, তিনি সেইরূপই প্রণামী দিয়া সুফল গ্রহণ করিলেন, কিন্তু যে তিনজন কর্ত্তারূপে ছিলাম, আমাদের মধ্যে সেই তিনজনের নিকট দশ টাকার কম সুফল দিলেন না। অগত্যা আমরা তাহাই প্রদানপূর্ব্বক সুফল লইয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলাম, কারণ এতাবৎকাল আমরা তাঁহার ব্যবহারে এত দূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম যে বিনা আপত্তিতে আমরাও কোনরূপ উচ্চ বাচ্য করিলাম না। শেষ আসিবার কালীন তিনি কেবলমাত্র এই উপরোধ করিলেন যে, বাবু! যখন আপনাদের কোন আত্মীয়স্বজন এখানে আসিবেন, তখন তাহাদিগকে আমার নাম শুনাইয়া আমারই নিকট পাঠাইবেন। তোমরা আমার লক্ষ্মীবান যজমান অধিক আর কোন অনুরোধ আমার নাই। যে গোমস্তাটী মান্দ্রাজ হইতে ক্রমান্বয়ে আমাদের সহায়তা করিতেছিলেন, তাঁহাকেও সকলে চাঁদা করিয়া কুড়ি টাকা দিলাম, ইহাতেই তিনি দুই হাত উত্তোলনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবান রামেশ্বরদেবের শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া এখানকার মায়া ত্যাগ করিলাম।

বদরীকাশ্রম

রামেশ্বরতীর্থ স্থান হইতে যাত্রীদিগের মধ্যে কেহ দ্বারকাপুরী, আবার কেহ বা উত্তর-পশ্চিম তীর্থ সকলের সেবা করিতে করিতে হরিদ্বারে উপস্থিত হন, তথা হইতে হৃষীকেশ লক্ষ্মণঝোলার পুণ্যভূমি দর্শন করিয়া লৌহ নির্ম্মিত সেতু পার হইয়া বরাবর শ্রীধাম বদরীকাশ্রমে যাত্রা করিয়া থাকেন। আমরা প্রথমে কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিমের তীর্থ সকল সেবা করিতে করিতে হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলাম, তথা হইতে পুণ্যধাম বদরীকাশ্রমে যাত্রা করি, সুতরাং এই পুস্তকে হরিদ্বার হইতে বদরীকাশ্রম যাত্রার বিষয়ই প্রকাশি[illegible] হইতেছে।

হরিদ্বার গঙ্গাতীরস্থ একটী পবিত্র তীর্থস্থান। [illegible]র দুইদিকে পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে ত্রিধারা হইয়া গঙ্গা প্রবাহিতা, ঐ ত্রিধারা কনখলে পৌঁছিয়াছে। এই সকল পর্ব্বতসমূহে বাস করিবার অনেকগুলি উপযুক্ত গুহা আছে, সাধু সন্ন্যাসীগণ ঐ সকল গুহায় বাস করিয়া থাকেন। হরিদ্বারে গাড়ী, ঘোড়া, এক্কা বা আহারীয় কোন দ্রব্য সামগ্রীর অভাব নাই। হরোদ্বার নামক ষ্টেশন হইতে তীর্থতীর অন্যূন দুই মাইল। শীত ঋতু ব্যতীত এখানে সকল সময়েই সুখে থাকা যায়। রাস্তা, ঘাট পরিষ্কার ও প্রশস্ত। হরিদ্বার সহরটী গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত

সুতরাং এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। মহামুনি কপিল এই স্থানে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া হরিদ্বারের অপর নাম কপিল স্থান, কিন্তু শৈব্য-সম্প্রদায় এই পুণ্যভূমিকে হরদ্বার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

হরিদ্বারে প্রতি বার বৎসর অন্তর একবার কুম্ভযোগ উপস্থিত হয়, ঐ সময় কত সাধু, কত সন্ন্যাসী ও কত সহস্র যাত্রীর সমাগম হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপে ঐ যোগের সময় এক মহা মেলায় পরিণত হয়। প্রতি বৎসরের শেষ চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে যে একটী মেলা হয়, সেই মেলার সময় বহু সংখ্যক অশ্ব, উঠ, হস্তী এখানে খরিদ বিক্রয় হইয়া থাকে। হরিদ্বারে অনেকগুলি মঠ আছে, কিন্তু কোন গৃহস্থকে এখানে বাস করিতে দেখিতে পাওয়া না। কথিত আছে, হরিদ্বার স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। কাশীর অবমুক্তক্ষেত্র যেরূপ বারাণসী সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়, হরিদ্বারে মা গঙ্গাদেবীর কৃপায় সেইরূপ সংজ্ঞালাভ হয়।

মহারাজ ভগীরথ তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণকে ব্রহ্মশাপ হইতে উদ্ধার-কামনা করিয়া ভাগীরথীর তপস্যায় মন প্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক গঙ্গাদেবীকে তুষ্ট করেন, তাহার প্রার্থনায় সেই পরম পবিত্র গঙ্গাদেবীকে পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ করতঃ হিমালয়ের সিয়ানিক পর্ব্বতের গোমুখী হইতে কুলকুল শব্দে ভারতের সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইয়াছে, এই স্রোতগামী গঙ্গার দৃশ্য অতি মনোহর। গঙ্গা-মাহাত্ম্যে স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশ আছে যে, হর, পার্ব্বতী ও গঙ্গা এই ত্রিশক্তিই একত্রে বিদ্যমান এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ যাবতীয় পুরুষার্থ সমস্তই সূক্ষ্মরূপে গঙ্গায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। বহিঃস্থিত জল যেমন নারিকেল ফলের অভ্যন্তরে অবস্থিত করে, সেইরূপ পরব্রহ্মরূপ জল ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যস্থ হইয়াও জাহ্নবীতে অধিষ্ঠান করিতেছে। কলিযুগে যাঁহাদের চিত্ত কলুষিত, যাহারা পর

দ্রব্য গ্রহণে রত এবং বিধিহীন ও ক্রিয়াবিহীন একমাত্র গঙ্গা ব্যতিরেকে তাহাদের আর উপায় নাই। "গঙ্গা" "গঙ্গা" এই পবিত্র নাম জপ করিলে কালফণী রাক্ষসীসদৃশী অলক্ষ্মী, দুঃস্বপ্ন ও দুশ্চিন্তা আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ভক্তানুসারে গঙ্গা ইহলোক ও পরলোক উভয়েরই ফলদাত্রী। কলিযুগে যজ্ঞ, দান, তপ, জপ, যোগ কিছুই গঙ্গা সেবার তুল্য নয়। সন্দিগ্ধ ব্যক্তিরাই মোহিত হইয়া এই গঙ্গাকে সামান্য নদীর তুল্য বিবেচনা করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হন।

হরিদ্বারে গঙ্গার দুইটী ধারা আছে, পশ্চিমধারার তীরে তীর্থ সকল বিদ্যমান আছেন। এখানে ব্রহ্মকুণ্ড ও কুশাবর্ত্ত নামে যে দুইটী বাঁধা ঘাট আছে, তথায় তীর্থপদ্ধতি অনুসারে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্নান করিলে ভাগীরথীর কৃপায় সকল পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। সর্ব্বপ্রথমে কৈলাসের হিমালয় পর্ব্বতের গোমুখী হইতে অবতরণপূর্ব্বক গঙ্গাদেবী এই স্থানে আসিয়া পতিত হন, এই নিমিত্ত এই স্থানটী ব্রহ্মকুণ্ড নামে খ্যাত হইয়াছে, এই ব্রহ্মকুণ্ডের অপর নাম স্বর্গদ্বার। এই তীর্থতীরে গোদান অন্নদান, স্বর্ণদান প্রভৃতি দানকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক দক্ষিণাসহ একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে ইহার ফলস্বরূপ তিনি বিষ্ণুলোকে স্থানপ্রাপ্ত হন। ব্রহ্মকুণ্ডের অনতিদূরেই কুশাবর্ত্ত ঘাট বিরাজিত। এখানে জনৈক ঋষি যোগসাধন করিতেছিলেন, সেই সময় গঙ্গাদেবী প্রফুল্ল মনে স্রোতগামিনী হইয়া তাঁহার কুশ ভাসাইয়া লইয়া যান, ধ্যানভঙ্গ মুনি আপন কুশ দেখিতে না পাইয়া ক্রোধে কুশসহ দেবীকে আকর্ষণ করেন, তখন ভাগীরথী হৃষ্টচিত্তে ঋষির নিকট তাঁহার মর্ত্ত্যে আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপনপূর্ব্বক ঋষির কুশ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া এই বর প্রদান করেন, যে কেহ এই ঘাটে শুদ্ধচিত্তে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও তর্পণ করিবে, আমার এই বরপ্রভাবে তিনি পিতৃগণের সহিত বিষ্ণুলোকে স্থানপ্রাপ্ত হইবে

দেবী যে স্থানে ঋষির কুশ প্রত্যার্পণ করেন, সেই স্থানের নাম "কুশাবর্ত্ত ঘাট" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

কুশাবর্ত্ত ঘাটে অত্যন্ত বড় বড় মৎস্য, কচ্ছপ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। তীর্থ স্থানের মৎস্য বলিয়া কেহ ইহাদিগের প্রতি অত্যাচার করেন না, বরং তাহাদিগকে খাদ্য সামগ্রী প্রদানপূর্ব্বক নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ অনুভব করিয়া থাকেন। হরিদ্বার সহরের মধ্যে বিস্তর বানর দেখিতে পাওয়া যায়।

কুশাবর্ত্ত ঘাট হইতে প্রথমেই শ্রীশ্রীসর্ব্বনাথদেবের মন্দির দর্শন পাওয়া যায়, মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবান সর্ব্বনাথ শিবের অষ্টবহু মূর্ত্তি এবং একটী নন্দীর প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই মন্দির বাহিরের প্রাঙ্গণে মহাবোধি বৃক্ষতলে মহাত্মা বুদ্ধদেবের একটী পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন পাইবেন, সেই প্রেমপূর্ণ শ্রীমূর্ত্তিটী দর্শনে মোহিত হইবেন, সন্দেহ নাই। ইহার পর ভৈরবদেবের মন্দির, তৎপরে মায়াদেবীর মন্দির। এই মহামায়া মায়াদেবীর মায়াপ্রভাবে জগৎ আচ্ছন্ন, মন্দির মধ্যে মায়াদেবীর ত্রিমস্তক চতুর্ভুজা করাল দুর্গা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মায়ের এক হস্তে ত্রিশূল, দ্বিতীয় হস্তে নরকপাল, তৃতীয় হস্তে চক্র এবং চতুর্থ হস্তে নৃমুণ্ড শোভা পাইতেছে। মায়াদেবীর এই অপরূপ করালমূর্ত্তি দর্শন করিলে শরীর লোমাঞ্চিত হইতে থাকে।

হরিদ্বারের চতুর্দ্দিকই গিরিপরিবেষ্টিত। এখানে ভীমগড় নামক স্থানে যথায় মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেনের শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে, সেই কুণ্ডেও বিস্তর মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্রোতগামী গঙ্গার সহিত এই কুণ্ড সংযুক্ত থাকায় গঙ্গার মৎস্যগণ অবাধে ইহাতে বিচরণপূর্ব্বক কেলিকৌতুকসহকারে দর্শকবৃন্দের আনন্দ উৎপাদন করিয়া থাকে; ইহার তীরের চতুর্দ্দিকে বিস্তর বানর উপস্থিত থাকিয়া যাত্রীদিগকে

বিরক্ত করিয়া তাহাদের খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে। এখানে যে রেল লাইন পাহাড়ের মধ্যপথ ভেদ করিয়া প্রশারিত হইয়াছে, সেই লাইনের স্থাপত্য কৌশল নয়নগোচর হইলে রেলওয়ে কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়ারগণের বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

ব্রহ্মকুণ্ডের অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে যে একটী মন্দির ও প্রশস্ত বাঁধা ঘাট দেখিতে পাইবেন, উহা গঙ্গাঘাট নামে প্রসিদ্ধ। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত সেই সুন্দর মনোমুগ্ধকর ঘাটের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল। তথায় বিষ্ণুপদচিহ্ন ও গঙ্গাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান, ভক্তিসহকারে তাঁহাদের অর্চ্চনা করিবেন। যোগের সময় ভক্তগণ সকলেই এই স্থানে প্রথমে স্নান করিবার অভিলাষী, সুতরাং অত্যন্ত হুড়াহুড়ি হয়, এমন কি উক্ত সময়ে অনেককে প্রাণও হারাইতে হয়, এই নিমিত্ত সদাশয় গবর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে এই প্রশস্ত ঘাটটী সাধারণের সুবিধার্থে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন।

চণ্ডীর পাহাড়—কুশাবর্ত্ত ঘাট হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে এক পর্ব্বতোপরিভাগে চণ্ডীদেবীর বিগ্রহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে জগজ্জননী চণ্ডীকাদেবী ভক্তদিগকে দর্শনদানে উদ্ধার করিতেছেন। এই পাহাড়ের শিখরদেশে উপস্থিত হইলে গঙ্গার নীলধারা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে।

হরিদ্বার হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে গঙ্গার তীরেই কনখল বিরাজিত। এই স্থানে যাইবার কালীন পথিমধ্যে হরিদ্বার সহরের বৃহৎ চক্ দেখিতে পাইবেন, এই চকে নানাবিধ মনোহারী, পসারী ও বিবিধ প্রকার দ্রব্য সামগ্রী আবশ্যক মত খরিদ করিতে পারেন, এমন কি এখানে তরিতরকারী পর্য্যন্ত পাওয়া যায়; কিন্তু গঙ্গাতীরের উপর যে বাজার আছে, তথায় প্রাতে ৬ হইতে বেলা ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত নানারূপ



হরিদ্বারস্থ গঙ্গাঘাটের মেলা সময়ের দৃশ্য

[১২৪ পৃষ্ঠা।]

তরিতরকারী সুবিধা দরে পাওয়া যায় এবং এই স্থানেই এদেশ নির্ম্মিত পিত্তলের বাসন এবং হরিদ্বারের পবিত্র তীর্থবারি স্বদেশে আনিবার জন্য টিনের ও পিত্তলের পাত্র খরিদ করিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মাত্মা বিদুর কনখলে যোগসাধন করিতেন। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন স্বর্গা-রোহণকালে তাঁহার দুর্জ্জয় গদা এই কনখলেই পরিত্যাগ করিয়া গিয়া-ছেন, প্রস্তরাকৃতি সেই প্রকাণ্ড গদা অদ্যাপি এখানে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

হরিদ্বারে গঙ্গাতীরের উপর কত ভক্ত যাত্রী, গাভীদিগের আস্বাদের জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সন্ধক লবণের স্তূপ পাতিত করিয়া রাখেন, আর বৃষ ও গাভীগণ অবাধে উহার আস্বাদ লইয়া পরিতৃপ্ত হয়। এই তীরের উপরিভাগে যে পাকা বাঁধা রাস্তা আছে, সেই রাস্তার সাহায্যে ইচ্ছা করিলে অশ্বযানে বা একায় চড়িয়া কনখলে যাইতে পারা যায়। কথিত আছে, পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষ রাজার এই কনখলই রাজধানী ছিল। এখানে অনেকগুলি দেবালয় বর্ত্তমান থাকিয়া সেই মহাবলপরাক্রান্ত দক্ষ রাজার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে; এই স্থানেই গঙ্গার ত্রিধারা সম্মিলিত হইয়াছে। সঙ্গম স্থানে জলের বিস্তার অত্যন্ত অধিক, সেই সঙ্গম স্থানে অবগাহন বা জল স্পর্শ করিলে পূর্ব্ব জন্মের সকল পাপনাশ এবং অন্তিম সময়ে ভাগীরথীর কৃপায় স্বর্গে স্থান পাওয়া যায়। এই সঙ্গম স্থলেই প্রজাপতি দক্ষরাজা শিবহীন যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং এই স্থানেই সতী পতি নিন্দা শ্রবণ করিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, শূলপাণি রোষভরে তাঁহার সেই যজ্ঞ নাশ করেন।

কনখলে উপস্থিত হইয়া ইহার দক্ষিণদিকে দক্ষিণেশ্বর নামে মহাদেব এবং সতীকুণ্ড নামে যে কুণ্ড আছে, এই দুই স্থানই দর্শন করা কর্ত্তব্য।

পর্ব্বতের উপরে বেদী মধ্যে এক প্রকাণ্ড ত্রিশূল অদ্যাপি প্রোথিত আছে। কথিত আছে, এই ত্রিশূলের সাহায্যে "নন্দী" দক্ষরাজার যজ্ঞ নাশ করিয়াছিল। এখানে আরও অনেকগুলি দেবালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। কনখল স্থানটী নির্জ্জন এবং অতি পবিত্র বলিয়া অনুমান হয়। ধর্ম্মপুত্র বিদুর এই স্থানেই তপস্যা করিয়াছিলেন।

যে সকল যাত্রী হৃষীকেশ ও লক্ষ্মণঝোলার পবিত্র স্থান দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা হরিদ্বার হইতে কনখল ও হৃষীকেশ দর্শনের যাওয়া-আসার ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া চুক্তি করিবেন। চারি-পাঁচজন লোক অনায়াসে যাইতে পারে, এরূপ একখানি ঘোড়ার গাড়ীর ভাড়া অভাব পক্ষে ৫৲ টাকার কম হয় না। আমরা যাঁহাদের সহিত এই তীর্থস্থানে গমন করিয়াছিলাম, তাঁহাদের এখানকার সকল তীর্থস্থানের পথ জানা না থাকায়, কত কষ্ট, কত বাজে খরচ সহ্য করিয়া যৎকিঞ্চিৎ দর্শন করিয়াছি, উহাই প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুঃখেই এই পুস্তকের সৃষ্টি, এই নিমিত্ত দ্বিতীয়বার যখন হরিদ্বার হইতে বদরীকাশ্রম পর্য্যন্ত যাত্রা করি, তখন পুরাতন বিজ্ঞ সেতুয়া সঙ্গে লইয়াছিলাম, তাহারই চেষ্টায় এখানকার অনেক দ্রষ্টব্য স্থান যাহা দর্শন করিয়াছি, তাহা এই দ্বিতীয় খণ্ডে সাধ্যমত প্রকাশ করিলাম। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সঙ্গে থাকিলে সাধারণের কত উপকার হইবে, তখন বুঝিতে পারিবেন।

কনখলে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম

পুণ্যস্থান হরিদ্বার একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান অবগত হইয়া বৎসরের সর্ব্বসময়ে ভারতবর্ষের সকল স্থান হইতে বহু সংখ্যক ভক্তগণ দলে দলে এই স্থানে আসিয়া থাকেন। তদ্ব্যতীত কত সাধু, কত সন্ন্যাসী, কত মাধুকারী ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া সাধন ও ভজনের জন্য এই পুণ্যময় স্থানে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের শারীরিক অসুস্থতার সময় আশ্রয় দান এবং সেবা করিবার জন্য মহাত্মা বিবেকানন্দ স্বামীর উৎসাহে ও রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী সেবকের উদ্যোগে এই স্থানে একটী সেবাশ্রম স্থাপিত করিয়া কত লোকের কত উপকার করিয়াছেন, উহা বর্ণনাতীত।

হরিদ্বারের দুই ক্রোশ উত্তরে সপ্তস্রোত (সপ্তধারা)। ইহার নয় ক্রোশ উত্তরে পর্ব্বতের উপরিভাগে "হৃষীকেশ তীর্থ" বিরাজমান। এখানে স্রোতগামী গঙ্গাদেবী কলকল রবে তরঙ্গ উচ্ছলিত করিয়া পাহাড় হইতে নামিতেছেন, ঐ দৃশ্য অতি মনোহর। এখানে এই স্রোতগামী গঙ্গায় স্নান, তর্পণ সম্পাদনপূর্ব্বক সাধ্যানুসারে গো, স্বর্ণ দানসহকারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়।

হৃষীকেশে যে সকল মঠ ও ধর্ম্মশালা আছে, তাহাদের নিয়ম এই যে, যদি কোন আগন্তুক এই সকল ধর্ম্মশালা বা মঠে উপস্থিত হন, এবং এই অপরিচিত স্থানে কোনরূপ আহারীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ধর্ম্মশালা বা মঠের নিয়মানুসারে তিনি বিনা আপত্তিতে একটী লোকের আহার্য্য উপযুক্ত আটা, কাষ্ঠ ও ভেলিগুড় প্রাপ্ত হন, এইরূপে যে কোন মঠে উপস্থিত হইবেন, সেইখানেই তিনি এইরূপ খাদ্য-দ্রব্য প্রাপ্ত হইবেন, আরও আহার্য্য দ্রব্য-সামগ্রী যথায়

পাওয়া যায়, তাঁহারা উহা নির্দ্দেশ করিয়া দেন। এদেশবাসীদিগের উদ্দেশ্য এই যে, কোন ভক্ত ভগবান হৃষিকেশের দর্শন বাসনা করিয়া এই পর্ব্বতবেষ্টিত অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হইয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর না হন। এখানে এই তীর্থে সপ্তঋষিমণ্ডলীর তপস্যা স্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া সেই মহাত্মাদিগের মহিমা প্রকাশ করিতেছে।

হৃষিকেশের তিন ক্রোশ উত্তরে লক্ষ্মণঝোলা (অনন্তদেবের তপস্যা স্থান)। ইহার সন্নিকটে গঙ্গায় যে সেতু আছে, সেই সেতুর উপর দিয়া বদরীকাশ্রমে যাইতে হয়। পূর্ব্বে এই স্থানে গঙ্গার উপর দড়ির সাহায্যে অতি কষ্টে প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া ভগবান বদরীনারায়ণ স্বামীর শ্রীচরণ ধ্যান করিয়া পার হইতে হইত, সম্প্রতি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী সুরতমল ঝুন ঝুনওয়ালা যাত্রীদিগের পার হওয়ার এই ভয়াবহ দৃশ্য একদা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন, এবং এই দুঃখ দূরীকরণার্থে বহু অর্থ ব্যয়সহকারে এই স্থানে একটী লৌহ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া সাধারণের কত উপকার করিয়াছেন এবং কত পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন, উহা লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না।

হরিদ্বার হইতে পনের দিবস ক্রমান্বয়ে পর্ব্বতময় স্থান সকল লঙ্ঘনপূর্ব্বক অতি কষ্টে বদরীকাশ্রমে যাইতে হয়। এখানে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তিতে স্বয়ং শ্রীহরি বিরাজ করিতেছেন। কার্ত্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত দুঃসহ শীত ও তুষার রাশির প্রভাবে উক্ত স্থানে কেহ যাইতে পারেন না। এই দুর্গম তীর্থে যাইবার সময় অসংখ্য পান্থনিবাস দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রীদিগের বিশ্রামহেতু এই সকল পান্থশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। হরিদ্বার হইতে বদরীকাশ্রম পর্য্যন্ত যে সকল তীর্থ স্থান বর্ত্তমান আছে, সেই সকল স্থান দর্শন করিবার জন্য হরিদ্বারে শিবিকা ভাড়া পাওয়া যায়, একখানি ছাদহীন শিবিকায় (ঝাঁপান) একটী লোক

যাওয়া যায়, এইরূপ শিবিকার ভাড়া একখানি এক শত টাকা, কিন্তু যদ্যপি রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইতে চান, তাহা হইলে ছতরীওলা ঝোলা বা ঝাপান ভাড়া করিবেন, এই ছতরীর জন্য পৃথক ২৫৲ টাকা অধিক ভাড়া দিতে হয়। যাঁহারা হাঁটাপথে যাত্রা করিবেন, তাঁহারা অধিক আমোদ অনুভব করিতে পারিবেন, কারণ পথশ্রমে যে কষ্ট হইবে, উহা এই দুর্গম পথের মন্থরগামী দুই দল যাত্রীর পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে—বিশেষতঃ কেহ কাহাকে ক্লান্তিযুক্ত দেখিলেই চিরপ্রথানুসারে "জয় বদরীবিশাল লালা কি জয়", "জয় কেদারনাথ স্বামী কি জয়", "জয় গরুড় ভগবান কি জয়", এইরূপ জয়ধ্বনি উত্থিত করিতে থাকেন; বাস্তবিক ইহাতে মনে বল ও ভরসা উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে প্রায় সকল যাত্রীদের পায়ে জুতা দেখিতে পাইবেন, কিন্তু কাহারও মাথায় ছাতা দেখিতে পাইবেন না। কারণ কথিত আছে, "রবির খর কিরণ সহ্য হয়, তথাপি সূর্য্যাতপ তপ্ত ধূলিরাশি নিতান্ত অসহ্য।" হরিদ্বার হইতে বদরীকাশ্রম্ পর্য্যন্ত এই বহু দূরগামী দুর্গম পথে গমনকালীন অসংখ্য চটিতে অসংখ্য দেবদেবী মূর্ত্তি এবং লীলাময়ের অনন্তলীলা সকল দর্শন করিয়া কত আনন্দ অনুভব করিবেন, তাহা বর্ণনাতীত। যাঁহারা হাঁটাপথে যাইবেন, এই সকল তাঁহাদের উপরিলাভ আর যাঁহারা ঝাঁপানে যাইবেন, তাঁহারাও স্থানে স্থানে চটিতে লীলাময়ের লীলা সকল দর্শন পাইবেন, সন্দেহ নাই—কিন্তু হাঁটাপথের যাত্রী অপেক্ষা কম লীলা স্থান সকল দর্শন পাইবেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ঝাঁপান চালকেরা দ্রুতগামী—তাহারা সোজা পথ ধরিয়া গমন করিয়া থাকে, ভক্তগণের একে এই স্থান অপরিচিত, অর্থাৎ কোন্ পথে যাইলে কোথায় কিরূপ লীলাখেলা আছে, তাহা জানা নাই, তাহাতে আবার পথ দুর্গম, সুতরাং ঝাঁপানে চড়িয়া পুত্তলিকাবৎ থাকিতে হয়। বলা-

বাহুল্য যে, এই চালকদিগকে যথায় থামিতে বলিবেন, তথায় তাহারা থামিতে অবাধ্য হয় না। প্রথমে যখন লক্ষ্মণঝোলা হইতে বদরীনারায়ণ স্বামীর আশ্রমপথে হাঁটাপটে উপস্থিত হইবেন, তখন এই পার্ব্বত্যময় দুর্গম পথ কিরূপে অতিক্রম করিবেন, উহাই ভাবনা হয়, কিন্তু যখন এই পথ অতিক্রম করিতে করিতে অভ্যস্ত হইবেন,তখন আর কোনরূপ কষ্ট বোধ হইবে না। পবিত্রধাম বদরীকাশ্রমে যাত্রাকালীন পথিমধ্যে গুপ্তকাশী নামে এক মোক্ষদায়ক তীর্থ আছে, উহার দর্শন এবং সেবা করিতে অবহেলা করিবেন না। উত্তরাখণ্ডে পঞ্চপ্রয়াগের মধ্যে দেব-প্রয়াগই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়, তাই এখানে মস্তক "মুণ্ডণ" অবশ্য কর্ত্তব্য। দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ও বিষ্ণুপ্রয়াগ, এই পঞ্চপ্রয়াগ বিরাজিত। প্রয়াগের ঘাটে পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধার কামনাপূর্ব্বক পিণ্ডদান, তর্পণ এবং সতৈজস জল, অন্ন, বস্ত্রাদি প্রভৃতি দান করিতে হয়। সামর্থবান যাত্রী পাইলে পাণ্ডারা এখানে গোদান পর্য্যন্ত সম্পাদন করাইয়া লন। এই গোদান' ব্যাপার এক আশ্চর্য্য কাণ্ড। যাহারা স্বেচ্ছায় গোদান করেন, তাহাদের কোন কথাই নাই, আর যাহারা ইহা দান করিতে অনিচ্ছুক,তাহাদের অতর্কিতে পূজারীরা একটু গোবর হাতে দিয়া প্রয়াগ ঘাটের উপর সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করাইবার সময় গোদানের সঙ্কল্প করান, তার পর যজমানের নিকট তন্মূল্য আদায়ের জন্য উৎপীড়ন করিতে থাকেন, এ রহস্য মন্দ নয়। এই দেবপ্রয়াগের পাণ্ডারাই বদরীনাথের পূজারী। এখান হইতে কেদারনাথের পথ অত্যন্ত অপ্রশস্ত সুতরাং ছাগল বা ভেড়ার পিঠে মাল বোঝাই করিয়া যাত্রীগণ বহন করাইয়া লইয়া যায়। ঘোড়া বা গরু এই অপ্রশস্ত রাস্তায় যাইতে পারে না, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে মাল বহনে নিযুক্ত করা হয় না। বলাবাহুল্য, এখানকার এক-একটী

বকরী যেন এক-একটী বলদ, তাহারা অক্লেশে দশ-পনের সের বোঝা বহন করিতে পারে। এই পথে অগস্ত্য মুনির আশ্রম স্থানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত বলিয়া অনুমান হয়, আবার এখানে অনেকগুলি মণিহারী ও নানাপ্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্যের দোকান সকল সজ্জীকৃত, অধিকন্তু পরিশ্রান্ত যাত্রীদিগের বিশ্রাম করিবার স্থানও আছে। পথিমধ্যে যতগুলি চটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে এক-একটী চটির এক-একটী পৃথক্ নাম আছে। এইরূপে চটির পর চটি অতিক্রম করিবার পর চন্দ্রাপুরী নামক চটিতে যাইবার সময় সামান্য একটী ঝরণার ন্যায় নদী দুই খণ্ড কাষ্ঠের উপর দিয়া পার হইতে হয় এবং স্থানে স্থানে খেয়ারও সাহায্য লইতে হয়, এই সময় পাণ্ডাদার পয়সার জন্য অত্যন্ত জুলুম করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, এই অপ্রশস্ত পার্ব্বত্যপথের শোভা অতি সুন্দর। এই সকল পথের নানাপ্রকার নয়নানন্দদায়ক অপূর্ব্ব চিত্র সকল দর্শন করিতে করিতে মনের সুখে শোণিতপুরে উপস্থিত হইবেন। এই শোণিতপুরেই "গুপ্তকাশী" বিরাজিত। এখানকার জনপাদের মধ্যে "বামসু" নামক যে বিখ্যাত স্থান আছে, বাণ রাজার কন্যা "উষা" ঐ স্থানে দেবতারাধনা করিতেন, সেই রাজকন্যার নামানুসারে উষামঠ নামে একটী মঠ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার একতম মন্দিরে উষা, অনিরুদ্ধ, চিত্ররেখা এবং কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি সকল অদ্যাপি দর্শন করিয়া নয়ন চরিতার্থ করিবেন।

মহারাজ বাণ শিবভক্ত ছিলেন। তিনি ভগবান মহেশ্বরকে স্তবে তুষ্টসহকারে কাশীর অবিমুক্ত ক্ষেত্রের ন্যায় আপন রাজধানী মধ্যে একটী মোক্ষদায়ক তীর্থ স্থাপন করিবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে "গুপ্তকাশী" নামে এই তীর্থ স্থাপন করতঃ ভক্তের আশা পূরণ করিয়াছেন।

মহারাজ বাণ প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাচীন পঞ্চবক্ত্র-মহাদেবের মূর্ত্তি অদ্যাপি এখানে দেদীপ্যমান থাকিয়া ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতেছেন। মন্দির মধ্যে মহেশ্বরের অর্চ্চনাপূর্ব্বক ভক্তিদান করিবেন। এই মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত গুপ্তকাশী সহর মধ্যে মোক্ষদায়ক অবিমুক্ত ক্ষেত্রের ন্যায় সমস্তই দর্শন পাওয়া যায়, অর্থাৎ এখানেও বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণাদেবী, গঙ্গা, মায় মণিকর্ণিকা সমস্তই বর্ত্তমান আছেন। এখানকার এই পুণ্যভূমিতে কোন জীব দেহত্যাগ করিলে মহেশ্বর গুপ্তভাবে তাহাকে সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ করেন, এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম গুপ্তকাশী হইয়াছে। গুপ্তকাশীতে একটী প্রস্রবনের দুইটী মুখ দেখিতে পাওয়া যায়, একটী গজাকার, অপরটী বৃষভাকার। গজাকার মুখ হইতে যে ধারা পতিত হইতেছে, উহার নাম যমুনা, আর বৃষভাকার মুখ হইতে যে ধারা পতিত হইতেছে, উহার নাম গঙ্গা। এই গঙ্গা ও যমুনার ধারা যেখানে একত্র মিলিত হইয়া পতিত হইতেছে, ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানই মণিকর্ণিকা নামে খ্যাত হইয়াছে। মণিকর্ণিকা নামক কুণ্ডের নিকটেই এক বৃহৎ মন্দির বিরাজমান, তদভ্যন্তরে বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা এবং অন্যান্য কতিপয় দেবতাদিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, দর্শনে জীবন সার্থক বোধ হয়। ইহার সন্নিকটে পার্ব্বতীদেবীর মন্দির এবং পঞ্চপাণ্ডবদিগের মন্দির বিরাজিত। গুপ্তকাশীতে গুপ্তদান করিবার প্রথা আছে, অর্থাৎ একটী নারিকেলের খোলের মধ্যে সোণা, রূপা, টাকা, পয়সায় পূর্ণ করিয়া সেই পূর্ণ খোলটী মন্ত্রপূতসহকারে উৎসর্গপূর্ব্বক আপন পাণ্ডাকে দান করিতে হয়, ইহার ফলে জন্মজন্মান্তরে প্রচুর গুপ্তধন পাওয়া যায়। শোণিতপুর বা গুপ্তকাশী একটী ক্ষুদ্র নগরের ন্যায় দেখিতে, কিন্তু ইহা বসতিপূর্ণ। গুপ্তকাশীতে কেদারনাথ স্বামীর পাণ্ডাদের অধিকার যেরূপ—দেবপ্রয়াগে

বদরীনাথের পাণ্ডাদের আধিপত্যও ঠিক্ সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার নিয়ম অতি আনন্দদায়ক, কেন না দুই দল যাত্রী পরস্পরের সহিত একত্র দেখা বা নিকটবর্ত্তী হইলেই তাহাদিগকে "জয় বদরীনারায়ণ স্বামী কি জয়", "জয় কেদারবিশাল লালা কি জয়", এইরূপ বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে হয়। এই সহরটী পার হইলেই নারায়ণ চটি নামে আবার একটি চটি পাইবেন, তথায় দুইটী দেবতার দর্শন পাওয়া যায়। এই চটির কাছ দিয়া একটী প্রবাহিতা ঝরণা আছে, তাহার সন্নিকটে মিল বসাইয়া ঘূর্ণিত যন্ত্রের সাহায্যে অসভ্য পাহাড়ীয়া অতি সুন্দরভাবে পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন কাষ্ঠের ঘর, বাড়ী ও নানাবিধ খেলনা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে, তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, কারণ এই নিভৃত পর্ব্বতমালার মধ্যে এই সকল মূর্খ অসভ্য জাতিরা কিরূপে কাহার শিক্ষাবলে এইরূপ সুন্দর সুশ্রী কারুকার্য্য শিক্ষালাভ করিয়াছে, সে বিষয় একবার চিন্তা করিলে আনন্দে অধীর হইতে হয়। নারায়ণ চটির পর তিন মাইল পথ অতিক্রম করিলেই জগজ্জননী মহিষমর্দ্দিনীর বিখ্যাত মন্দির দর্শন পাইবেন, এই দেবালয়ের এক দেশে একটী দোলনা আছে, যাত্রীগণ চিরপ্রথানুসারে পয়সা দেয় এবং ঐ দোলায় উঠিয়া দোল খায়। ইহার কারণ কিছুই জানিতে পারিলাম না।

এই জগজ্জননী মহিষমর্দ্দিনী কেবল তিনটী দিনের জন্য অবোধ সন্তানদিগকে মহান্ শিক্ষাদান করিতে বৎসরান্তে একবার ভারতভূমে পদার্পণ করেন। সে শিক্ষা কি—তাহা জানিতে ইচ্ছা হয় কি? অসিপাশ মেখলা, রত্নোজ্জ্বল-কিরিটিনী, আনন্দময়ী মা আমার সাক্ষাৎ "দেবশক্তি", তাঁর পদতলে "পশুশক্তি"। দয়া-ধর্ম্মাদি দেবশক্তির দ্বারা কাম, ক্রোধাদি পশুকে পদদলিত করিতে হইবে, ইহাই ত মায়ের শিক্ষা !!

মহিষমর্দ্দিনীর দক্ষিণে—রাজরাজেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী বিরাজ করিতে থাকেন, বামে—বিজ্ঞান-বিদ্যাদায়িনী সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী দেদীপ্যমান হন, ইহাতেই জ্ঞানদান করিতেছেন যে, শুধু শক্তিতে কার্য্যোদ্ধার হয় না, শক্তির সহিত ধন ও বিদ্যা না থাকিলে কোন বিষয়ই সফল হয় না। শক্তি, ধন ও বিদ্যা এই তিনটীর সংযোগে জগতে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয়—তাই মার সঙ্গে সিদ্ধিদাতা গণেশমূর্ত্তি থাকেন, কিন্তু শক্তি, ধন ও বিদ্যা এই তিনটীর বলে যদি কেহ উচ্ছৃঙ্খল হন, এই নিমিত্ত তাহাকে শাসন করিবার জন্য পুষ্পিতশর দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় উপস্থিত থাকেন।

ধন ব্যতীত কখন কাহারও উন্নতি হয় না, এ রহস্য যিনি একবার বুঝিয়াছেন, তিনিই মোহ নিদ্রা হইতে জাগিয়াছেন। স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন। ভারত-শান্তির "নিকুঞ্জ-কানন"। এখানে খাদ্যখাদকে কখন বিরোধ হয় না—তাই ভগবতীর সহিত সর্প, ময়ূর ও মূষিক একত্র অবস্থান করিয়া নরলোকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই আসিয়া থাকে। মাতৃপ্রদত্ত মহান্ শিক্ষা আমরা সকলে বুঝিতে না পারিয়া নানাপ্রকার চিন্তা করিতে থাকি। মায়ের বিশ্বব্যাপিনী বিরাট প্রতিমাখানির বিষয় একবার মনোযোগপূর্ব্বক চিন্তা করিলেই সমস্ত বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি সদলে এই শিক্ষাপ্রদান করিতেই আসিয়া থাকেন। বলাবাহুল্য, এই আদ্যাশক্তির করুণা ভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, অতএব মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া অভাব পক্ষে জীবনের মধ্যে একবার এই পবিত্র স্থানে আসিয়া এখানকার করুণাময়ী "মহিষমর্দ্দিনী"র অপরূপরূপমাধুরী একবার দর্শন করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন। নারায়ণ চটির পরই "ফাটা" নামক চটিতে উপস্থিত হওয়া যায়, তথায় নানাবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিবেন, অর্থাৎ পথিমধ্যে ভিখারীগণ সুইতাগা চাহিবে, উহা এই স্থানে খরিদ করিয়া সঙ্গে রাখি-

বেন এবং তাম্রের এক প্রকার বলয় ও বিল্বপত্র আরও দেবতাদিগকে স্নান করিবার কাপড় আবশ্যক বিবেচনা করিলে এই স্থানেই খরিদ করিয়া লইবেন; কেন না, এখানে হইতে তীর্থধাম পর্য্যন্ত এই সকল সামগ্রী আর কোথাও সংগ্রহ করা দুর্ঘট। এই চটি হইতে ১৩ মাইল দূরে ত্রিযুগী নারায়ণের দেবালয় দর্শন পাইবেন। ফাটা চটি হইতে রামপুর নামে যে চটি পাইবেন, তথায় সুন্দর বিশ্রামাগার আছে, অতএব এই স্থানে বিশ্রামপূর্ব্বক আহারাদি সম্পন্ন করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া দেশের শোভা দর্শন করিবার সময় স্থানীয় দোকান হইতে এ দেশের চিহ্নস্বরূপ সামান্য সামান্য দ্রব্য সামগ্রী খরিদ করিবেন।

রামপুর চটিটী কেদারনাথ এবং বদরীনাথের মন্দিরের সঙ্গমপথে অবস্থিত; এই নিমিত্ত এই চটিটীতে সদাসর্ব্বদা যাত্রী পূর্ণ থাকে। কথিত আছে, এই তীর্থের এমনি মাহাত্ম্য যে, সংসারের মায়া ছিন্ন করিয়া শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণের দর্শন আশে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া যদি কোন ভক্ত এই দুর্গম পথে দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলে ভগবান বদরীনারায়ণের কৃপায় তিনি সশরীরে কৈলাসে বা বৈকুণ্ঠপুরীতে স্থান প্রাপ্ত হন। হরিদ্বার হইতে বদরীনারায়ণজীউর মূলমন্দির পর্য্যন্ত অসংখ্য চটি আছে, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ চটিগুলির নাম উল্লিখিত হইল। এতদ্ভিন্ন বহুবিধ চটি ও দেবালয় দর্শন পাওয়া যায়।

ভগবান্ বদরীনারায়ণের পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইতে ভক্তগণকে যত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে যত তীর্থ স্থান আছে—বোধ হয়, অপর কোন তীর্থ স্থানে যাইতে এরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। এই হেতু একটী প্রবাদ আছে যে, "কষ্ট না করিলে কৃষ্ণ দর্শন হয় না"। এই সারগর্ভ বাক্যটী প্রভু বদরীনারায়ণজীউর পথের কষ্ট অনুভব করিয়াই উৎপন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বলাবাহুল্য,

যাহারা পদব্রজে এই দুর্গম পথে গমন করেন, তাহাদের পদতলের অর্দ্ধেক চামড়া প্রায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে চটির পর চটি অতিক্রম করিয়া রামপুর চটিটী পার হইলেই একটী কাষ্ঠের নির্ম্মিত সেতু পাইবেন, এই স্থান হইতে দুইদিকে দুইটী রাস্তা গিয়াছে—একটী কেদারনাথ যাইবার, অপরটী ত্রিযুগী নারায়ণজীউর দর্শন পথ। আমরা এই স্থান দিয়া প্রথমে ত্রিযুগী নারায়ণজীকে দর্শন করিবার জন্য ত্রিযুগীর পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম। এই দোমাথা স্থান হইতে ১॥০ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলে পর ত্রিযুগী নারায়ণজীউর দর্শন পাওয়া যায়। এখানকার পথ অত্যন্ত চড়াই। এই স্থান হইতে একটী উচ্চ চড়ায়ের উপর উঠিয়া মধ্যপথে "শাকম্ভরী" (দুর্গা মূর্ত্তির রূপান্তর) দেবীর মন্দির, মন্দিরাভ্যন্তরে কর্ত্তব্যবোধে দেবীর দর্শন করিবেন। এই তীর্থ স্থানের নিয়ম বিচিত্র, কেন না—যে কেহ এই দেবীকে পূজা প্রদান করিবেন, তাঁহাকে এখানকার নিয়মানুসারে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রের এক টুক্‌রা ছিঁড়িয়া দেবী স্থানে উপহার দিতে হয়। এইরূপে, দেবী শাকম্ভরীর অপরূপরূপ দর্শনপূর্ব্বক ত্রিযুগী নারায়ণজীউর দর্শন করিয়া এই দুর্গম পথে আসিতে যত দুঃখ, যত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলাম, তাহার অবসান এবং নয়ন ও জীবন সার্থক করিলাম। ভগবান ত্রিযুগী নারায়ণ যে স্থানে বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থানের চতুর্দ্দিকে অনেক ঘর পাণ্ডার বাস আছে। কথিত আছে, এই স্থানে হরপার্ব্বতীর শুভ বিবাহ হইয়াছিল, সেই দেবদেবীর উদ্বাহকালে যে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, ত্রিযুগী নারায়ণের মন্দির সম্মুখে একটী কুণ্ড মধ্যে উহা অদ্যাপি যত্নের সহিত ইন্ধন দ্বারা পরিরক্ষিত হইতেছে। এই নারায়ণ-সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে বর্ত্তমান থাকিয়া ইহার সত্যাসত্য সাক্ষীস্বরূপ বিরাজ করিয়া শেষে কলির প্রকোপে অন্তর্হিত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত এই দেবের

ত্রিযুগী নারায়ণ নাম হইয়াছে। এক্ষণে যে মূর্ত্তি আমাদের নয়নগোচর হয়, উহা স্থানীয় পাণ্ডাদিগের দ্বারা কলিকালে স্থাপিত হইয়া ভগবানের পূর্ব্ব গৌরব ঘোষণা করাইবার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ত্রিযুগী নারায়ণ মূর্ত্তিটী ধাতুনির্ম্মিত—দক্ষিণে লক্ষ্মীদেবীর প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান। লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি বামে স্থাপিত না হইয়া দক্ষিণে হইল কেন? এ বিষয়ের উত্তর কাহারও নিকট না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, কারণ কত পণ্ডিত, কত পাণ্ডা, কত পূজারী, যাঁহারা সকলেই এক-একটী অধ্যাপক বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদের নিকট এই সামান্য তর্কের সঠিক্ উত্তর পাইলাম না। মন্দিরের বাহিরে ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু ও সরস্বতী নামক চারিটী কুণ্ড আছে। ব্রহ্মা ও রুদ্র কুণ্ডে স্নান, বিষ্ণুকুণ্ডে মার্জ্জন এবং সরস্বতীকুণ্ডে তর্পণ করিবার নিয়ম দেখিলাম। এই তীর্থে সরস্বতীকুণ্ডের উপরিভাগে যে এক খণ্ড প্রশস্ত শিলা আছে, পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগকে তথায় ঐ শিলার উপর বসাইয়া গোদান করাইবার জন্য নানাপ্রকার উপদেশ দেন। এখানে পাঁচ টাকার কম একটী গোদান হয় না, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাদের উপদেশ সত্ত্বেও গোদান করিতে ইচ্ছা করেন না, পাণ্ডারা সেই নির্ব্বোধ যাত্রীর নিকট বিধিমতে শ্লোক উচ্চারণ করিয়া আপন পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া অভাব পক্ষে সেই যাত্রীর নিকট গাভীর মূল্য ও উৎসর্গের দক্ষিণা সমেত মোট এক টাকা চারি আনা আদায় করিয়া ভক্তের স্বর্গের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন। আহা! এমন স্থান, এমন উপদেশ কি আর কোথাও পাইবেন? যদিও কোথাও উপদেশ পাইতে পারেন, কিন্তু এরূপ প্রকার জবরদস্তিপূর্ব্বক স্বর্গের দ্বার প্রশস্ত করিবার নিয়ম আর কোথাও দেখিতে পাইবেন না। সে যাহা হউক, এখানকার পাণ্ডা অতি দয়ালু, কেন না, জোর করিয়া ভক্তদিগকে গোদান করাইয়া স্বর্গে পাঠান, কি সুন্দর

নিয়ম, তৎপরে মন্দিরাভ্যন্তরে হোমকুণ্ডে কিছু দ্রব্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করাইয়া ললাটে ঐ হোমের ভস্ম রেখা গ্রহণ করান, আর সেই হোমকুণ্ড জ্বালাইবার নিমিত্ত যাত্রীদিগের নিকট কিছু অর্থ আদায় করিতেও কুণ্ঠিত হন না। সে যাহা হউক, এইরূপে এই স্থানের কার্য্য সম্পন্ন পূর্ব্বক গৌরীকুণ্ডে যাইতে হয়। হোমকুণ্ড হইতে ক্রমশঃ পাহাড়ে আরোহণ করিয়া নিম্নে ভিন্ন পথে সোমপ্রয়াগ দর্শন পাইবেন। সোম-প্রয়াগে সোমগঙ্গা ও মন্দাকিনী এই দুই নদী ভিন্ন দিক্ হইতে প্রবাহিতা হইয়া এই স্থানে মিলিতা হইয়াছেন, সুতরাং এই সঙ্গম স্থলে যাত্রীগণ ভক্তিসহকারে মুক্তি কামনা করিয়া স্নান ও তর্পণ করিয়া থাকেন। সঙ্গম স্থানের জল অত্যন্ত শীতল, এমন কি স্নানের সময় হাত, পা শীতে জড়ীভূত হইয়া যায়। ইহার দেড় মাইল উর্দ্ধে গৌরীকুণ্ড বিরাজিত। কথিত আছে, গৌরীকুণ্ডে স্বয়ং পার্ব্বতীদেবী স্নান করিতেন,এই নিমিত্ত এই কুণ্ডের নাম গৌরীকুণ্ড হইয়াছে, আর এই স্থানেই শ্রীগণেশজীউ ভূমিষ্ট হইলে যখন সমস্ত দেবগণ ঐ চাঁদ মুখ দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে উপস্থিত হন, তখন গণেশ মাতুল "শনিঠাকুরের" শুভ দৃষ্টিতে তাঁহাকে মস্তকহীন হইতে হয়, তাহার পর দেবগণের উপদেশ মতে ঐরাবতের মুণ্ড আনিয়া গণেশের স্কন্ধে স্থাপন করা হইয়াছিল। গৌরীকুণ্ড এক অদ্ভুত ব্যাপার! এই কুণ্ডের পাশাপাশি শীতল ও তপ্ত নামে দুইটী কুণ্ড আছে, সেই শীতল কুণ্ডে স্নান করিবার সময় সর্ব্বশরীর যেন শীতে অব-সন্ন হইয়া যায়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তপ্তকুণ্ডটী ঠিক্ ইহার পার্শ্বেই অবস্থিত, অথচ ইহার জল এত গরম যে, হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়; আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যখন এই তপ্তকুণ্ড মধ্যে সাহসপূর্ব্বক স্নান করিতে নামা যায়, তখন উপর হইতে যেরূপ উত্তাপ অনুভব হয়,তৎকালীন আর সেরূপ গরম বোধ হয় না; এই তীর্থস্থানের

ইহাই মাহাত্ম্য, চাক্ষুস দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার তীর্থে উপস্থিত হইলে প্রথমে এই দুই কুণ্ডে স্নান করিয়া শুদ্ধকলেবরে হরপার্ব্বতীর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেব দর্শন করিতে হয়। তীর্থ স্থান হইতে কেদারনাথ স্বামীর মন্দির, কেবল ৮ মাইল ব্যবধানমাত্র। এখানকার পথ সকল ক্রমশঃ খারাপ দেখিতে পাওয়া যায়, দেড় হাত মাত্র পরিসর, এমন কি কোন কোন স্থান সমতলভূমি হইতে ঠিক্ খাড়া উঠিতে হয়, সুতরাং এই ৮ মাইল পথের মধ্যে কেদারবদরীর রামবাড়ী নামক রাস্তার ন্যায় দুর্গম পথ আর দ্বিতীয় নাই, বলা যাইতে পারে। এই স্থানে ঝাঁপানওয়ালারাও আরোহীদিগকে নামাইয়া হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে বাধ্য হয়।

শ্রীশ্রীবদরীকেদার স্বামীজীউ

এইরূপে এই সকল চটির দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া যখন সমতলক্ষেত্রে উপস্থিত হইবেন, তখন দূর হইতে শ্রীশ্রীকেদারনাথের মন্দির নয়নপথে পতিত হইতে থাকিবে। স্থানমাহাত্ম্যগুণে সেই সময় কোথা হইতে মনে বল ও ভরসা আসিয়া ভক্তদিগকে আরও উৎসাহিত করিতে থাকে, তৎপরে এই স্থান হইতে মন্দাকিনী নদীর সেতু পার হইলেই কেদারনাথের পুরীমধ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। পুরীটী আয়তনে ছোট হইলেও ভগবান্ কেদারনাথের কি মহিমা, যে সেই অসংখ্য ভক্তদিগের একত্র সম্মিলনের জয়ধ্বনি এবং মন্দাকিনী ও দুগ্ধবতী গঙ্গার গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিলে একদিকে কর্ণ বধির, অপরদিকে কেদার স্বামীর প্রেমে পুলকিত হইয়া তাঁহারই শ্রীচরণে ভক্তিদান করিতে ইচ্ছা হয়। আহা! স্বামীজীউর কি মাহাত্ম্য! ধন্য প্রভু, ধন্য তোমার মহিমা!!

আর ধন্য যিনি তোমার কৃপায় তোমার স্থানে নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া তোমার শ্রীচরণ বন্দনা করিতে পারেন। কোন নূতন যাত্রী এখানে উপস্থিত হইলে তৎক্ষণাৎ পাণ্ডার গোমস্তা আসিয়া তাহার তত্ত্বাবধানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ইহাই এখানকার নিয়ম।

পবিত্রধাম স্বামীজীউর স্থানে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে মন্দাকিনী নদীতে স্নান, তর্পণ ও পার্ব্বণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পুরীর উত্তরপ্রান্তে ভগবান কেদারনাথের বিশাল মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে অন্তরের বাসনা মানত করিয়া সকলেই অবাধে স্বহস্তে মনের সাধে প্রভুকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, ইহাতেই পরম সৌভাগ্য মনে হয়; কেন না, ভক্তগণ এই দুর্গম পথে আসিতে যে সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়া থাকেন, এখানে স্বহস্তে ভগবানকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন করিয়া সেই সমস্ত দুঃখের অবসান করতঃ চরিতার্থ হন, এবং জীবন সার্থক বোধ করিতে থাকেন। মূলমন্দির মধ্যে প্রবেশকালে দ্বাররক্ষককে সাধ্যমত কিছু দান করিতে হয়। এখানকার নিয়ম অনুসারে পূজান্তে স্বামীজীউকে নেংটী উপহার দিবার প্রথা আছে। এই নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ফাটা চটি হইতে যে বিল্ব পত্র ও কাপড় সংগ্রহ করিতে বলিয়াছিলাম, উহাই ভগবচ্চরণে উপহার দিবেন, কারণ এই দুইটী দ্রব্যই অর্থাৎ কাপড় বা বিল্ব পত্র এখানে দুষ্প্রাপ্য।

কেদারনাথ স্বামী নামক লিঙ্গরাজ মহাদেবের আকৃতি আমরা সচরাচর যেরূপ শিবলিঙ্গ দর্শন পাইয়া থাকি, এই পবিত্র মূর্ত্তি সেরূপ নয়—লিঙ্গটী প্রায় ২॥০ হস্ত উচ্চ, সূক্ষ্মাগ্র একটী প্রকাণ্ড প্রস্তর বিশিষ্ট। উত্তর-দক্ষিণে প্রায় চারি হস্ত লম্বা, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বেধ প্রায় এক হস্ত প্রমাণ হইবে, ইহার চারিদিকেই বাঁধান আছে এবং মন্দিরের দুই দিকে নালা কাটা আছে। ঘৃত দ্বারা স্বহস্তে এই লিঙ্গ গাত্রে

লেপনসহকারে ভক্তগণ, আপন বক্ষঃস্থল সংস্পর্শে ভগবানকে হৃদয়ের সহিত আলিঙ্গন করিয়া, জীবন সার্থক বোধ করিয়া ক্ষণেকের নিমিত্ত এই জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসারের মায়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে সক্ষম হন।

পুরীর পশ্চিমে পুণ্যতুয়া মন্দাকিনী নদী প্রবাহিতা, উত্তরে ও পূর্ব্বে বরফময় পর্ব্বতশৃঙ্গ, আবার এইদিকেই পাহাড়ের সন্নিকটে স্বর্গারোহণ পথ, উহা ভৃগুপথ নামে খ্যাত হইয়াছে। ভৃগুপথে তুষারের নিমিত্ত কেহ সাহসপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে পারেন না। ইহার দক্ষিণদিকে কেবল পতিত জমি বা ময়দান দেখিতে পাওয়া যায়।

স্থানীয় পূজারীদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, এই বিশাল পবিত্র মন্দিরটী দ্বাপরযুগে পঞ্চপাণ্ডব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া অদ্যাপি তাঁহাদের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহা সংস্কার অভাবে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেবালয়ের আশে পাশে নানাবিধ দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া মূলমন্দিরটী প্রদক্ষিণ করিতে হয়।

কেদারনাথ স্বামীর পুরীমধ্যে অমৃতকুণ্ড, উদককুণ্ড, হংসকুণ্ড ও রেতঃকুণ্ড নামে চারিটী পবিত্র কুণ্ড আছে, তথায় ভক্তিসহকারে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিধিমতে আচমন করিতে হয়। ভক্তগণ তাঁবার বা লোহার অনন্তের মত এক প্রকার বলয়, ফাটা চটি বা পথিমধ্যে অপর কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া ভগবান কেদারনাথ স্বামীর শ্রীঅঙ্গে স্পর্শ করাইয়া স্বীয় বাহু মধ্যে ধারণ করতঃ চরিতার্থ হন। প্রবাদ এইরূপ, এই বলয় ধারণের ফলস্বরূপ সহজে কোনরূপ উৎকট ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না। এইরূপে এখানকার তীর্থের যাবতীয় নিয়ম সকল পালনপূর্ব্বক সাধ্যমত ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদিগকে দক্ষিণাসহ ভোজন করাইয়া তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করতঃ আপন পাণ্ডার নিকট সুফল লইতে হয়। বলাবাহুল্য যে, এখানে একটী ব্রাহ্মণ বা

সন্ন্যাসীকে হালুইকরের দোকান হইতে সমস্ত আহারীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিতে অভাব পক্ষে আট আনা খরচের কমে হয় না।

আমাদের এখানে ৺তারকেশ্বর মহাদেবের মোহন্তের উপাধি যেরূপ গিরি, ৺বদরীনারায়ণ ও ৺কেদারনাথের মোহন্তের উপাধি সেইরূপ "রাওলসাহেব"। তাঁহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা, এই দুই স্থানে কোন নূতন মোহন্ত নিয়োগ সময় তিহরীর রাজা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া থাকে। বদরীনারায়ণের রাওয়াল সাহেবের আবাস স্থান জোশী মঠে, আর কেদারনাথের রওয়াল সাহেবের বাস ভবন উখী মঠে। এই দুই মঠেই তাঁহাদের অধীনে বহু লোক বাস করিয়া থাকেন, আর এইজন্যই জোশী ও উখী মঠ এখানকার যাবতীয় তীর্থগুলির "হেড কোয়াটার" হইয়াছে; ফলতঃ পোষ্টাফিস, হাঁসপাতাল, কাছারী, পুলিস ও নানা ধরণের নানাবিধ দোকান সকল সজ্জীকৃত থাকিয়া গ্রামদ্বয়ের শোভা বর্দ্ধিত করিতেছে; এ সকল দোকানে আবশ্যক মত সকল দ্রব্যই খরিদ করিতে পাওয়া যায়।

কেদারনাথ স্বামী ও বদরীনারায়ণ স্বামীর শ্রীমন্দিরদ্বয়, শীত ঋতুতে ভয়ানক তুষার পাতের জন্য ছয় মাসকাল বন্ধ থাকে। ঐ সময় মোহন্তেরা নিজালয়ে দেবতার পূজার্চ্চনা করিতে থাকেন, কারণ সেখানে তাঁহাদের পূজা গ্রহণের "প্রতিনিধি" বিগ্রহ মূর্ত্তি বিরাজ করিতে থাকেন, আবার চিরপ্রথানুসারে মোহন্তেরা গ্রীষ্মারম্ভে অর্থাৎ বৈশাখ মাসের অক্ষয়তৃতীয়ার শুভতিথিতে মহাসমারোহে ভগবান বদরীনারায়ণের শ্রীমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করাইয়া ঐ দিবস হইতে যাত্রীদিগের পূজা সেই মূলমন্দিরেই গ্রহণ করিতে থাকেন এবং ভক্তগণকে ভগবানের দর্শনদান করাইবার নিমিত্ত উক্ত ছয় মাসকাল তথায় বাস করিতে থাকেন। কেদারনাথজীউর মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটনের কোন নির্দ্দিষ্ট

তারিখ নাই—তবে বৈশাখ মাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কৃষ্ণদ্বাদশী তিথির মধ্যেই মোহন্ত মহারাজ বদরীনারায়ণ স্বামীজীউর ন্যায় মহাসমারোহে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভগবানের পুনঃপ্রবেশের সংবাদ সাধারণের নিকট ঘোষণা করিয়া থাকেন।

এখানে এক প্রকার ঝোলা সাধারণে যাহাকে কান্তি বলিয়া থাকেন, সেই কান্তী যাত্রীবহনের নিমিত্ত সদাসর্ব্বদা ভাড়া দিবার জন্য প্রস্তুত থাকে। এই কান্তিতে চড়িয়া গমনাগমন করা এক বিড়ম্বনামাত্র। কান্তির উপরের সীমা, গ্রীবার নীচে রাখিয়া পা দুখানি কুঞ্চিতপূর্ব্বক ইহার পা-দানিতে রাখিতে হয়। আরোহীদিগকে স্থান বিশেষ চড়াইয়ে উঠিবার সময় কখন কখন এই কান্তির সহিত রজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইতে হয়, নচেৎ সেই উচ্চ চড়াইয়ে উঠিবার সময় কান্তি হইতে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। সেই ভয়াবহ দৃশ্য দর্শন করিলে কান্তি চড়ার ইচ্ছা আদৌ হইবে না। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যদ্যপি কখন কেহ এই তীর্থে যাত্রা করেন, তাহা হইলে ঝাপান বা কান্তি একখানি ভাড়া করিয়া সঙ্গে রাখিবেন এবং স্বাধীনভাবে চলা-বসা করিয়া যাইবেন, ইহাতে বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইবে, কিন্তু নিতান্ত যখন অক্ষম হইবেন, তখন এক-একবার ঝাপানে উঠিবার সুখ অনুভব করিয়া জীবন সার্থক করিবেন, ইহার ফলে জীবনের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত কান্তি চড়ার সুখ স্মরণ থাকিবে।

পূর্ব্বে যেরূপ পঞ্চপ্রয়াগ প্রকাশিত হইয়াছে, সেইরূপ পঞ্চকেদার ও পঞ্চবদরীনারায়ণও প্রতিষ্ঠিত আছে। যথা—১। স্বয়ং কেদারনাথ, ২। মধ্যমেশ্বর, ৩। তুঙ্গনাথ, ৪। রুদ্রনাথ, ৫। কল্পেশ্বরনাথ। এই পঞ্চদেব এখানে পঞ্চকেদার নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

তুঙ্গনাথের নিকেতনে অন্যান্য কেদারগণের প্রতিনিধির পবিত্র মূর্ত্তি

দর্শন পাইবেন। মন্দির অভ্যন্তরে ছত্বর মধ্যে গণেশ, ভৈরব, পার্ব্বতী প্রভৃতি আরও নানাবিধ দেব মূর্ত্তি এবং মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের ও ব্যাসদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল দেবালয়ে দর্শনাদি সম্পাদনপূর্ব্বক আপন পাণ্ডার নিকট সুফল লওয়ার নিয়ম আছে। তুঙ্গনাথের উতুঙ্গ নামক পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতরণ ব্যাপার আরোহণ অপেক্ষা অতিশয় কঠিন, এই খাড়া উৎরাহ অতি সাবধানে নামিতে হয়। তথাকার অধিবাসীগণ সাধারণকে তুঙ্গনাথের নিকেতন দর্শন করিতে যাইবার উপদেশ কখন দেন না, সুতরাং এখানে যাত্রীসমাগম অতি অল্পই হইয়া থাকে, কিন্তু তুঙ্গনাথের পাণ্ডাগণের ঐকান্তিক যত্নে কোন কোন যাত্রী বাধ্য হইয়া ঐ দুর্গম পথে দেবদর্শন করিতে যান। এখানে এই দেবের পাণ্ডাদের একখানি ভিজিট বহি আছে—সেই পুস্তকখানিতে যে সকল যাত্রী ইংরাজী বা বাঙ্গালা অভিজ্ঞ, তাহাদের নিকট হইতে এই উৎরাহ পর্ব্বতশৃঙ্গে উঠিতে বা নামিতে যে অধিক কষ্টকর নহে, সে বিষয় তোষামোদ করিয়া সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে থাকেন, আর ঐ সার্টিফিকেট দেখাইয়া যাত্রীদিগকে তথায় ভুলাইয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হন। এখানকার পর্ব্বতশৃঙ্গ যে কিরূপ ভয়াবহ, উহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরকে জ্ঞাত করা দুঃসাধ্য।

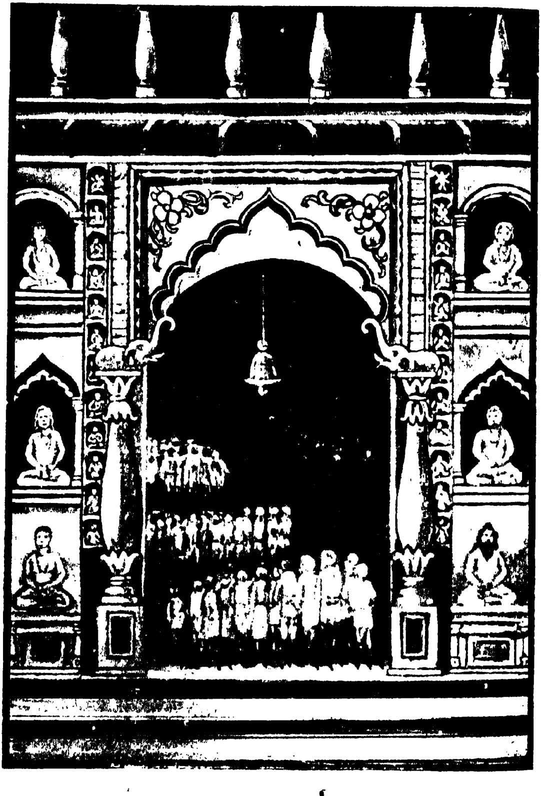
পঞ্চকেদারের ন্যায় এখানে পঞ্চবদরীও প্রতিষ্ঠিত আছেন। যথা—১। স্বয়ং বদরীনারায়ণজীউ, ২। পাণ্ডুকেশ্বর, ৩। নৃসিংহবদরী, ৪। বৃদ্ধবদরী, ৫। আদিবদরী। কেহ কেহ আদিবদরীকে ভবিষ্যবদরী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই পঞ্চদেব এখানে পঞ্চবদরী নামে খ্যাত আছেন।

এই তীর্থ স্থানে কোন ভাগ্যবান পুরুষ উপস্থিত হইলে স্থানীয় দোকানী ও ভিক্ষাজীবিগণ তাঁহাকে শেঠজী উপাধিতে ভূষিত করিয়া স্থান দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন, কারণ তাহাদের

বিশ্বাস যে, কোন সম্ভ্রান্ত বা শেঠজী যাহার দোকানে পদার্পণ করিবেন, তথাকার নিয়ম অনুযায়ী তাঁহাকে সেই দোকানীর নিকট হইতে চাউল, আটা, ঘৃত, কাষ্ঠ প্রভৃতি খরিদ করিয়া কাঙ্গালী, সাধু ও সন্ন্যাসীদিগকে ভোজন করাইবার যে প্রথা আছে, উহাই সম্পাদন করিতে হয়। এইরূপে তাহার বিস্তর মাল কাটতি হইবে এবং তৎসঙ্গে দুই পয়সা উপার্জ্জনও হইবে। বলাবাহুল্য যে, এখানে কোন শেঠজীর অনুকম্পা ব্যতীত কোন সাধু সন্ন্যাসী বা নিঃস্ব যাত্রীদিগের চর্ব্বচোষ্যরূপে উদর পূরণ হয় না, সুতরাং তাহারা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ভদ্রবেশধারী যাত্রী দেখিতে পাইলেই শেঠজী বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন, এতদ্ভিন্ন নিঃস্ব যাত্রীরাও তাঁহাদের নিকট কিছু সাহায্য পাইয়া থাকে, আরও কত প্রকার অল্প বয়স্ক ভিক্ষুক কত ছলে ভিক্ষা করিবার জন্য যাত্রীদিগের আগমনের প্রতিক্ষা করিয়া গ্রামের বাহিরে পথিপার্শ্বে বসিয়া থাকে, কোন ভাগ্যমান পুরুষকে দেখিতে পাইলেই এই সকল ছেলেমেয়েরা পয়সা ও সুহতাগা (সূচী ও সূতা) দান করিতে অনুরোধ করিতে থাকে, তাহাদের অভাব পূরণ করিবার জন্য কাটা চটি হইতে পূর্ব্বে এই সুহত্যাগা খরিদ করিতে উল্লেখ করিয়াছিলাম, অনেকে পাই, আদলা, পয়সা পূর্ব হইতে দানার্থ সংগ্রহপূর্ব্বক লইয়া আসেন। বদরীনারায়ণজীউর মন্দিরে যাইবার কালীন পথিমধ্যে যে পঞ্চপ্রয়াগ দর্শন পাইবেন, সেই সঙ্গম স্থলে অতি সন্তর্পণে স্নানার্থ নামিতে হয়, কারণ এই সঙ্গম স্থলে স্রোতাবেগ অতি ভয়ানক, আবার বিষ্ণুপ্রয়াগের স্রোত ভীষণ হইতেও যেন প্রলয়মূর্ত্তি, দর্শনে প্রাণে আতঙ্ক হয়। ইহার একদিক্ দিয়া বিষ্ণুগঙ্গা, অপরদিক্ দিয়া অলকানন্দা নদী, উভয় নদীই পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যস্থ সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় আসিয়া আছাড় খাইতেছে। এই স্রোতস্বিনীর সংঘর্ষণে যে কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে,

যিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন, লেখনীর দ্বারা উহা বর্ণনা করা কঠিন; সেই গম্ভীর স্রোতগর্জ্জন শ্রবণ করিলে কর্ণবধির হইতে থাকে। ভীরু যাত্রী, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা এই সঙ্গম স্রোতের নিকট যাইতেও সাহস করিতে পারেন না, অথচ তীর্থ স্থানের স্নান ফল আকিঞ্চন করিয়া প্রায়শঃ ঘাটী দিয়া কোনরূপে বর্ত্তনের সাহায্যে তীর্থ-বারি সংগ্রহপূর্ব্বক স্নান করিয়া থাকেন। পাণ্ডা ঠাকুর যিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন, তিনি অলকানন্দার সেই দুই পর্ব্বত যথায় বর্ত্তমান আছে, সেই স্থানটীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, এই দুই পর্ব্বত যাহা দেখিতেছেন, কলির পূর্ণ প্রকোপের সময় উহা জোড়া লাগিয়া ভগবান বদরীনাথের দর্শন পথ বন্ধ করিবে। এইরূপ নানাপ্রকার গালগল্প শুনিতে শুনিতে লীলাময়ের অপূর্ব্ব লীলা সকল নয়নগোচর করিয়া আনন্দিতমনে অলকানন্দার তীরে পাণ্ডুকেশ্বর নামে যে একটী চটি পাইলাম, তথায় বিশ্রামপূর্ব্বক সেদিনকার মত তৃপ্তিলাভ করিলাম।

পাণ্ডুকেশ্বরের অপর নাম যোগবদরী। এই মন্দিরমধ্যে একখানি তাম্রশাসন দর্শন পাওয়া যায়, ইহার চারিখানি ফলক আছে, মুখপাতের ফলকখানির উপরিভাগে একটী বৃষমূর্ত্তি অঙ্কিত থাকায় উহা মন্দিরাভ্যন্তর হইতে বাহিরে নীত হইয়া প্রাঙ্গণ মধ্যেই চন্দন লিপ্ত হয়, তৎপরে ভক্তদিগকে সেই নন্দী মূর্ত্তিটীকে দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু তাহারা আবার কিঞ্চিৎ পৃথক্ দক্ষিণা পাইলে সন্তুষ্ট হইয়া প্রভুর স্বরূপ আদিমূর্ত্তি দর্শন দান করাইয়া চরিতার্থ করিয়া থাকেন। স্থানীয় পূজক-ব্রাহ্মণদিগের নিকট উপদেশ পাইলাম, মন্দিরটী মহারাজ পাণ্ডুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং তাম্রশাসনখানিও তাঁহার রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছে। কথিত আছে, এই স্থানে মহারাজ পাণ্ডু মৃগরূপী ঋষির দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া মনের শান্তির নিমিত্ত তাঁহার আরাধ্যদেবকে প্রতিষ্ঠা করেন এবং আপন



শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণ জীউর পূর্ব্বদিকস্থ প্রবেশ দ্বারের দৃশ্য

[২১৭ পৃষ্ঠা।]

নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য দেবতা ও স্থানের নাম তাঁহারই নামানুসারে প্রচার করেন, এই হেতু প্রভু পাণ্ডুকেশ্বর অদ্যাপিও এই স্থানে বিরাজমান থাকিয়া ভক্তের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এখানে যে চারিখানা ফলক আছে, তন্মধ্যে বৃষ মার্কাখানিই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

বদরীনাথের পল্লীমধ্যে যাত্রীদিগের বাস করিবার উপযুক্ত বাসাবাটী ভাড়া পাওয়া যায়। এই পল্লীটী ছোট হইলেও তথায় ঘন বসতি এবং বিবিধ প্রকারের অনেক দোকান সজ্জিত আছে। এখানে ভগবানের সন্ধ্যা আরতি দর্শন করিলে প্রাণ ভক্তিপ্রেমে মাতিতে থাকে। এই পুরীমধ্যে তপ্তকুণ্ড নামে একটী কুণ্ড আছে, শীতপ্রধান দেশবশতঃ ঐ তপ্তকুণ্ডের জল অত্যন্ত আরামদায়ক। কুণ্ডটী বদরীর মন্দির ও অলকনন্দার মধ্যপথে অবস্থিত। ইহার দুই ধার হইতে দুইটী তপ্ত সলিলধারা আসিয়া এক সঙ্গে পতিত হইতেছে, আবার অপরদিক্ দিয়া সেই জলস্রোত নিঃসৃতও হইতেছে, সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দর্শন করিলে আনন্দে অধীর হইতে হয়। কুণ্ডটীর গভীরতা অন্যূন ২॥০ হস্ত পরিমাণ হইবে। ইহার অনতিদূরে কতকগুলি সোপানশ্রেণী পার হইলেই মূলমন্দিরের তোরণদ্বারে উপস্থিত হইতে পারা যায়। এই তোরণদ্বারের মধ্য পথ দিয়া নারায়ণের মন্দিরপ্রাঙ্গণে যাওয়া যায়। এতাবৎকাল হরিদ্বারের প্রশস্ত পথ হইতে বহির্গত হইয়া কত ক্লেশ, কত বিঘ্ন, কত পর্ব্বত, কত চড়াই অতিক্রম করিতে করিতে কৃপাময় ভগবান বদরীনারায়ণের অপার করুণায় আজ শুভক্ষণে সেই পবিত্র পুরীতে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলাম। মূলমন্দিরে প্রবেশের দুইটী দ্বার আছে, একটী পূর্ব্বদিকে অপরটী দক্ষিণদিকে অবস্থিত। উভয় দ্বার দিয়াই ভক্তগণ অবাধে প্রবেশ করিয়া থাকেন। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত পূর্ব্বদিকের প্রবেশ দ্বারের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

সর্ব্বপ্রথমেই এখানে তপ্ত কুণ্ডে স্নান ও পিতৃপুরুষদিগের মুক্তি কামনায় পিতৃতর্পণ ও ঋষিতর্পণ করিতে হয়, তৎপরে তীর্থ ফল প্রাপ্তির আশায় কেদারনাথের নিয়মের ন্যায় পার্ব্বণাকল্প ভোজ্যদান প্রভৃতি দান কার্য্য সম্পন্ন করিয়া এখানকার নিয়ম সকল পালন করিতে হয়। এই পুণ্যভূমিতে উপস্থিত হইলে প্রথমে শ্রীশ্রীকেদারনাথ স্বামীর অর্চ্চনা, তৎপরে ভগবান বদরীনারায়ণজীউর পূজা করিতে হয়, নচেৎ কেদার স্বামী রাগত হইয়া ভক্তের সকল তীর্থ ফলই হরণ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত চিরপ্রথানুসারে ভক্তগণ প্রথমে কেদারনাথ স্বামীর দর্শন করিয়া তাহার পর বদরীনাথ স্বামীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

প্রত্যহ প্রাতে ৯ ঘটিকার মধ্যে ভগবান বদরীনারায়ণ স্বামীর স্নানোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে, অতএব এই স্থানে উপস্থিত হইলে সকল কর্ম্ম পণ্ড করিয়া যথাসময়ে এই উৎসব দর্শন করিবেন। স্নানোৎসব দর্শন, এক মহামারী ব্যাপার, কেন না এই উৎসব দর্শনের নিমিত্ত প্রত্যহ সকাল হইতে দলে দলে ভক্তগণ দেবালয়ে উপস্থিত হইতে থাকেন এবং মনের আনন্দে কেহ হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করেন, কেহ নাটমন্দির প্রাঙ্গণে হরি নাম করিতে করিতে, হরি চরণে মতি রাখিয়া লুটিপাটি খান, আবার কেহ বা হরি নাম উচ্চারণ করিতে করিতে হরির লুট দিয়া মনের বাসনা পূর্ণ করিতে থাকেন। আহা! সেই দৃশ্য কি মধুর! এই দৃশ্য দর্শন করিলে পাষাণ প্রাণেও ভক্তির উদ্রেক হয়। প্রাঙ্গণ মধ্যে কোথাও বা লীলাময় অগতির গতি একমাত্র সেই বদরীনাথের আদি বৃত্তান্ত শাস্ত্র পাঠ শ্রবণ করিতে করিতে প্রেমভরে অচৈতন্য হইয়া জয় জয় রব তুলিতেছেন। এই সকল প্রেমপূর্ণ দৃশ্য দর্শন করিলে আনন্দে অধীর হইতে হয়। তাহার পর স্নান উৎসবের নিরূপিত সময়ে দেবালয়টী লোকে লোকারণ্য হইয়া থাকে। ঐ সময়

সেই বৃহৎ প্রাঙ্গণ মধ্যে তিলমাত্র স্থান থাকে না। দূর হইতে ভগবান বদরীনারায়ণের পবিত্র মূর্ত্তিটীর সমস্ত অবয়ব স্পষ্ট দর্শন হয় না—তবে দেহ সংস্থান যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত ও এক হস্ত পরিমিত উচ্চ, উহা সুস্পষ্ট দর্শন লাভ হয়। পাঠকবর্গের প্রীতির নিমিত্ত স্থানীয় তাম্র-ফলকের প্রতিমূর্ত্তির একটী চিত্র প্রদত্ত হইল। স্নান উৎসবের সময় স্বয়ং রাওলসাহেব পায়জামা আচকানটোপ প্রভৃতি পরিধান করিয়া উক্ত মূর্ত্তির উপর সর্ব্বসমক্ষে জল ঢালিতে থাকেন এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই সময় হরিধ্বনি হইতে থাকে। বলাবাহুল্য যে বদরী-নারায়ণের প্রধান পাণ্ডাই এই রাওলসাহেব, আবার তিনিই স্বয়ং মোহন্ত, তিনিই এখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা; তাঁহার হুকুম ব্যতীত এখানে কোন কর্ম্মই সম্পন্ন হয় না, আর এই রাওল সাহেব ভিন্ন অপর কেহ নারায়ণ মূর্ত্তিকে স্পর্শও করিতে পান না। বদরীনারায়ণের শ্রীমন্দিরের আশে-পাশে যতগুলি দেবমূর্ত্তি সজ্জিত আছে, উহার দৃশ্য অস্পষ্ট।

এই দেবালয়ের দুইটী প্রবেশ দ্বার ব্যতীত আলো বা বাতাস যাওয়া-আসার অন্য কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই। এই প্রবেশদ্বারের মধ্য পথ দিয়া জগমোহনে উপস্থিত হইতে হয়, এইরূপে পশ্চিমাভিমুখে নারা-য়ণের পোর্টিকোর ভিতর ঢুকিয়া উহার দ্বারদেশ পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। দেবের স্নান উৎসব ও পূজাদি সম্পন্ন হইলে ঐ পোর্টিকোরের দ্বার বন্ধ হয়, কিন্তু জগমোহনের দক্ষিণদিকের প্রবেশ পথটি সদাসর্ব্বদা খোলা থাকে। ভগবানের দর্শনের সময় যাত্রীদিগের যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য পাহারার সুব্যবস্থা থাকে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে অথবা পরে পুনরায় এই দেবালয়ের প্রবেশ দ্বার খোলা হয়, কিন্তু সন্ধ্যা আরতির পর ভোগ হইলেই দ্বারটী বন্ধ হয়. তখন

ভগবান বদরীনাথ স্বামী শয়ন করেন। এই ধামে তুলসী পত্র পাওয়া যায় না, আবার তুলসী পত্র না দিলেও নারায়ণের শ্রীচরণ শোভা পায় না, অতএব পথিমধ্যে ফাটা চটি হইতে এই তুলসী পত্র মনোযোগের সহিত স্মরণপূর্ব্বক সংগ্রহ করিতে অবহেলা করিবেন না। বদরী লালা জীউর যে স্থানের এত মাহাত্ম্য, যে পুরী ভারতের চারিধামের মধ্যে একটী অন্যতম প্রসিদ্ধ ধাম, সে ধামে অভাব পক্ষে ত্রিরাত্রি শুদ্ধচিত্তে বাস করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিবেন।

এই মূল দেবালয়ের সন্নিকটে, উপর চড়াইয়ে উঠিয়া অলকানন্দার তীরে পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে ভক্তগণ পিণ্ডদানার্থে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মকপাল নামক স্থানে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। বলাবাহুল্য, যে পুরোহিত এই পিণ্ডদান কার্য্য সম্পন্ন করান, তাঁহাকে যথোচিত দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক অলকানন্দার ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও তর্পণ করিতে হয়, আরও এই পুণ্য স্থানের এক যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি প্রদান করিয়া এখানকার উপর চড়াইয়ের তীর্থ সকলের সেবা শেষ করিতে হয়। এইরূপে এখানকার তীর্থ কার্য্য সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া সাধ্যানুসারে তত্রস্থ ফকির, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও আপন পাণ্ডা এবং স্থানীয় কাঙ্গালীদিগকে সাধ্যমতে ভোজন করাইয়া তৎপরে স্বীয় তীর্থ গুরু পাণ্ডার নিকট সুফল গ্রহণ করতঃ এই স্থান হইতে অপর কোন গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিতে হয়। আমি দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এখানে সুফলের সময় যাত্রীদিগের নিকট অধিক হারে টাকা আদায়ের নিমিত্ত পাণ্ডার নিকট নানাপ্রকার শ্লোক ও কুটতর্ক শুনিতে শুনিতে অনেক সময় নষ্ট করিতে হয়, এমন কি তাঁহাদের তাড়ণায় বাধ্য হইয়া, অনেকে পুরীতীর্থের ন্যায় টাকা না দিতে পারিয়া খৎ লিখিয়া দিয়া, সেই সময়ের জন্য পরিত্রাণ পান সত্য, কিন্তু পরে ঐ পাণ্ডার গোমস্তা

তাহার নিজালয়ে আসিয়া উক্ত খতের টাকা কিছু কিছু আদায় করিতে থাকেন, আরও এই ধামে শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় আট্‌কে বাঁধার প্রথা আছে। বদরীনারায়ণের পুরীমধ্যে তপ্তকুণ্ড ব্যতীত ঋষিগঙ্গা, কূর্ম্মধারা, প্রহ্লাদ-ধারা, নারদধারা, সূর্য্যকুণ্ড প্রভৃতিতে স্নান করিবার নিয়ম আছে এবং পুরীর বাহিরে কুবের শিলা, নারদ শিলা, বরাহ শিলা, নরসিংহ শিলা, গরুড় শিলা, মার্কণ্ডেয় শিলা প্রভৃতি কতকগুলি পুণ্য শিলা আছে, সাধ্যমতে এই সকল শিলার সেবা করিতে হয়।

প্রত্যাগমনকালে গরুড়গঙ্গা নামে যে একটী পবিত্র তীর্থ দর্শন পাইবেন, তথায় স্নান করিবার সময় আপন হাতের দিকে দৃষ্টি না করিয়া এক মুষ্টি শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিতে হয়, সেই শিলাখণ্ডগুলির নাম গরুড়শিলা। এই গরুড় শিলাগুলি লইয়া প্রথমে তপ্তকুণ্ডে, তৎপরে নারদ কুণ্ডাদিতে প্রক্ষালন করিয়া পুনরায় গরুড়গঙ্গাতে ধৌত করিতে হয়, তাহার পর বদরীনাথের মূলমন্দিরে উহাদিগকে স্পর্শ করাইয়া আনিতে হয়। কথিত আছে যে, এইরূপ সংশোধিত শিলাখণ্ড একখানি গৃহস্থের বাটীতে থাকিলে সর্প বা বৃশ্চিক দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট হয় না।

গরুড়গঙ্গা নামক তীর্থে স্নান করিবার সময়ে সাধ্যমত "দান" উৎসর্গ করিবার নিয়ম আছে, এই উৎসর্গে পিত্তলের থালা, গেলাস প্রভৃতি তৈজস পাত্রসহ দান করিতে হয়। এই সকল নিয়মগুলি পালনসহকারে স্নান তর্পণাদি সম্পন্ন হইলে পাণ্ডার গোমস্তাকে গুপ্তকাশীর ন্যায় গুপ্তভাবে একখানি মিষ্টান্নপূর্ণ পিত্তলের থালা উপহার দিতে হয়, সেই উপহার সামগ্রীগুলি বদরীনাথের যে পাণ্ডাকে তীর্থগুরু বলিয়া মান্য করা হয়, উহা তাঁহারই প্রাপ্য। তাহার পর কয়েকটি ক্ষুদ্র চটি অতিক্রম পূর্ব্বক অলকনন্দার পুলটী পার হইলেই লালসাঙ্গায় উপস্থিত হইবেন। এখানে যে একটী প্রশস্ত পথ আছে, উহা বরাবর হরিদ্বারে মিলিত

হইয়াছে। এই স্থানের পাহাড়ের পথগুলি মার্ব্বেলের ন্যায় সুদৃশ্য। লালসাঙ্গা পার হইলেই বদরীনারায়ণজীউর ফেরৎ যাত্রীদিগের সহিত হরিদ্বারে যাইবার জন্য দেখিতে পাইবেন। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এখান হইতে কোনরূপে নিকটস্থ কোন রেলষ্টেশনে উপস্থিত হইব, তাহা হইলে এই দুর্গম পথের কষ্ট ভোগ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব, সুতরাং কুলিদিগকে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া এখান হইতে নিকটস্থ যে কোন রেলষ্টেশনে যাইতে অনুরোধ করিলাম, তখন তাহারাও আমাদিগকে আশ্বাসপ্রদানপূর্ব্বক গমন করিতে লাগিল। এই যাত্রাকালীন পথিমধ্যে যে কোন তীর্থ স্থান সম্মুখে পাই-লাম, তাহাও দর্শন করিতে লাগিলাম। এইরূপ প্রকারে তাহাদের সহিত নানারূপ গালগল্প করিতে করিতে পিপুলকুঠী ও লাল সাঙ্গার অর্দ্ধ পথে বিরহীগঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থলে স্নান করিলে বহু পুণ্য সঞ্চয় হয়। এমন কি, এই সঙ্গমস্থলে স্নান করিলে, স্নান ফলহেতু ইহ-জন্মে কখন তাহাকে বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; এইরূপ উপ-দেশ পাইয়া কিছুতেই এই তীর্থফল প্রাপ্তির লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সদলবলে তীর্থতীরে উপস্থিত হইলাম। এখানে যাত্রীদিগের থাকিবার বেশ ভাল পাকা বাসাবাটী ভাড়া পাওয়া যায়। এই তীর্থ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, দক্ষালয়ে সতী পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া মনের দুঃখে দেহত্যাগ করিলে, সতীশোকে কাতর মহাদেব উন্মাদের ন্যায় সেই মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকেন, তদ্দর্শনে বিষ্ণু, মহেশ্বরের অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য আপন চক্র দ্বারা ঐ মৃত সতীদেহ ৫১ খণ্ডে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতের দশদিকে পাতিত করেন, এইরূপে সতীবিরহী-শোকসন্তপ্ত মহেশ্বর, "হায়! সতী আমার কোথা গেল" বলিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে এই সঙ্গম

তীরে উপস্থিত হইয়া তপস্যায় রত হইয়াছিলেন, তদবধি এই স্থানটী "বিরহী" তীর্থ নামে খ্যাত হইয়াছে।

বিরহী তীর্থ হইতে আবার কতকগুলি চটি পার হইয়া যখন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইলাম, তখন "পেনী" নামক একটী ক্ষুদ্র চটিতে বিশ্রাম করিলাম। এই চটির সম্মুখে দুইদিকে দুইটী পথ আছে, একটী উপর হইতে নীচের দিকে প্রসারিত হইয়া বিষ্ণুপ্রয়াগে গিয়াছে, অপরটী রাজপথ জোশীমঠের দিকে গিয়া নীতিপাসের সহিত মিলিত হইয়াছে। সাধু সন্ন্যাসীরা এই পথ দিয়া তিব্বত, মানসসরোবর ও কৈলাস পর্ব্বতে হরগৌরীর পবিত্র স্থানে গমন করতঃ তাঁহাদের অর্চ্চনা করিয়া চরিতার্থ হন। এই সকল পুণ্যস্থানের নাম কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে তথায় যাইবার জন্য মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, কিন্তু এই দুর্গম পথ-গুলির কষ্ট একবার চিন্তা করিলে তৎক্ষণাৎ উহা পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

জোশীমঠটী মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল, সুতরাং ভারতবর্ষের চারিপ্রান্তে প্রসিদ্ধ চারি ধামে আপন কীর্ত্তি-স্তম্ভস্বরূপ চারিটী মঠ স্থাপিত করিয়া অধীনস্থ দশনামী সন্ন্যাসী-দিগকে বিভাগ করিয়া দেন। উত্তরে—বদরীকায় এই জোশীমঠ, পশ্চিমে দ্বারকায় সারদামঠ, দক্ষিণে সেতুবন্ধে শৃঙ্গগিরি আর পূর্ব্বে অর্থাৎ জগন্নাথক্ষেত্রে বা পুরীধামে গোবর্দ্ধনমঠ সংস্থাপিত করেন, কিন্তু বদরীকাশ্রমের মঠটীর সত্ত্ব এক্ষণে সেই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তে মোহন্ত রাওয়াল সাহেবের সম্পূর্ণ অধিকারে আছে। জোশীমঠে অনেক-গুলি দেবমন্দির দর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ হেন নগর যাহা রাজধানী নামে খ্যাত, যথায় স্বয়ং রাওয়াল সাহেব বাস করেন, তথায় মন্দিরগুলি বে-মেরামতি অবস্থায় থাকিয়া ধ্বংস হইতেছে, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। যে মন্দিরে নৃসিংহ

বদরী, রামসীতা, উদ্ধবকুবের প্রভৃতি অবস্থিত হইয়া শীত ঋতুর ছয় মাসকাল ভগবান বদরীনারায়ণের প্রতিনিধিরূপে ভক্তদিগের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই গৃহটী একটী সামান্য দেবালয়মাত্র, এই দেবালয়ের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিলাম, কারণ যে দেবের প্রত্যহ কত সহস্র মুদ্রা বাঁধা আয় নিরূপিত আছে, সেই দেবের প্রতিনিধি মূর্ত্তির মন্দিরের অবস্থা দেখিলে কাহার না প্রাণে ক্ষোভ হয়। এখানে বাসুদেবের যে প্রাচীন মন্দির আছে, উহাও ভগ্নপ্রায়। এই বাসুদেবের মন্দির প্রাঙ্গণের চারিদিকেই অনেকগুলি দেবদেবীর প্রতি-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, আরও একটী শিবালয় বিরাজ করিতেছে।

এখানে একটী বাঁধান প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রস্রবণে একটী গোমুখাকৃতি চিহ্ন আছে, ঐ গোমুখ দিয়া অবিরত বারিধারা এক কুণ্ডে পতিত হইতেছে। বলাবাহুল্য, পরিশ্রান্ত যাত্রীরা ইহাতে স্নান-পূর্ব্বক তৃপ্ত লাভ করিয়া থাকেন।

বদরীনারায়ণজীউর দর্শন পথে কত তীর্থ, কত দেবালয়, কত লীলা স্থান ও কত মঠ, আরও কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্য সামগ্রী দেখিবার আছে, উহা আমার ন্যায় অল্প সময়ের ভ্রমণকারী যাত্রীর নিকট সমস্ত সমাচার পাওয়া দুরূহ। হরিদ্বার হইতে বদরীনারায়ণজীউর পবিত্র পুরী পর্য্যন্ত একে একে সমস্ত তীর্থগুলি দর্শন করিতে অভাবপক্ষে ছয় মাসকাল সময় লাগে, কিন্তু এই ভয়ানক দুর্গম স্থানে অধিকদিন থাকিতে সাহস হয় না, কারণ এই অপরিচিত স্থানে পীড়াক্রান্ত হইলে কে এখানে শুশ্রূষা করিবে? এই পথে যথায় বরফের ময়দান আছে, তথায় শীতের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক। কোন অপরিচিত যাত্রী এই দুর্গম স্থানে পথভ্রষ্ট হইলে স্থানে স্থানে যে সকল সন্ন্যাসীরা অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদের প্রজ্জ্বলিত ধুনির অগ্নি উত্তাপের সাহায্যে সময়ে

সময়ে যাত্রীদিগের কত উপকার হয়, আরও ঐ সকল মহাত্মারা প্রাণ-পণে সেই বিপন্ন যাত্রীর উপকার করিতে পরাঙ্মুখ হন না। তাঁহাদের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া কেহ গাঁজা, কেহ পয়সা দিয়া ঐ সকল সন্ন্যাসী-দিগকে তুষ্ট করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, বদরীনারায়ণের কৃপায় কোনরূপে এই অজানিত ভয়ানক স্থান হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অতি কষ্টে আমরা বসুধারা নামক তীর্থ স্থানে উপস্থিত হইলাম, কারণ পূর্ব্বেই উপদেশ পাইয়াছিলাম যে, এই বসুধারার তীর্থবারি পাপীদিগের উপর কখনই বর্ষে না, এই নিমিত্ত অধিকাংশ যাত্রীই প্রথমে শ্রীশ্রীকেদার-স্বামী ও শ্রীশ্রীবদরীনাথ স্বামীজীউকে দর্শনপূর্ব্বক নিষ্পাপ শরীরে এই তীর্থবারিতে স্নান করিয়া থাকেন, যে পর্ব্বত পৃষ্ঠ হইতে এই বসুধারার তীর্থবারি নিঃসৃত হইতেছে ; প্রবাদ এইরূপ, তথায় কুবেরের ভাণ্ডার আছে, আর উহার পশ্চিমদিকস্থিত পাহাড়টী গন্ধমাদন নামে খ্যাত হইয়াছে।

এখান হইতে আরও কতকগুলি চটি পার হইলেই মধ্যপথে ভাটোনি নামক চটিতে ভগবান আদবদরীনাথের দর্শন পাইবেন। এই আদবদরীনাথের মন্দিরটী, পথের কিনারায় এবং চটিটীর সংলগ্ন থাকায় কোন যাত্রীকে কখন কোনরূপ ক্লেশভোগ করিতে হয় না। সে যাহা হউক, এই দেব পঞ্চবদরীর অন্যতম এক বদরীনাথ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। আদবদরীনাথ স্বামীর মন্দির কর্ণপ্রয়াগ তীর্থ স্থান হইতে ১১ মাইল দূরে অবস্থিত। শ্রীশ্রীবদরীনারায়ণের মূল শ্রীমূর্ত্তি অপেক্ষা এই আদিবদরীনাথের মূর্ত্তিটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। দেবমূর্ত্তির উপরের দক্ষিণ হস্ত হইতে নীচের বাম হস্ত পর্য্যন্ত চারি হস্তই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মে শোভিত, দর্শনে জীবন সার্থক হইবে। এই আদবদরীর মন্দিরের আশে-পাশে অনেকগুলি দেবালয় আছে, তন্মধ্যে জানকীদেবী, হনুমান,

গরুড়, অন্নপূর্ণাদেবী ও মহিষমর্দ্দিনীদেবীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলে ভক্তির উদ্রেক হইতে থাকে। আমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও ভাগ্যক্রমে এই আদবদরীনাথের দর্শন লাভ হইল, কারণ বহু দিবসাবধি প্রবাসে থাকিয়া এত ক্লান্ত হইয়াছিলাম যে, কোন প্রকারে একটী রেলষ্টেশনে পৌছিতে পারিলেই বাটী প্রত্যাগমনপূর্ব্বক যেন নবজীবন প্রাপ্ত হই। মনে মনে বিরক্ত হইয়াও অগত্যা বাধ্য হইয়া হতাশপ্রাণে চটির পর চটিগুলি অতিক্রম করিতে লাগিলাম। এক-একটি চটি ২।৩ ক্রোশ দূর অতিক্রম করিতেছি, এমন সময়ে কুলীরা একত্রে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "বাবুজি! আব উতলা হইবেন না, এইবার রামনগরের নূতন সরক পাইয়াছি, এই সরক ধরিয়া আমরা নির্ব্বিঘ্নে চৌথুটী নামক স্থানে উপস্থিত হইব। এই নগরের অনতিদূরে যে রেলষ্টেশন আছে, তথায় আপনাদিগকে পৌছিয়া দিয়াই আমরা পুরস্কার লইব।" তাহাদের নিকট এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা সকলে আনন্দে অধীর হইলাম, অধিকন্তু সেই সময় যেন জীবনে নব বলসঞ্চার করিয়া নবোদ্যমে এই অপরিচিত পথটিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, কারণ ক্রমান্বয়ে এক মাসকাল এই সকল দুর্গম পথ হাঁটিতে হাঁটিতে এবং অনিয়মিত আহারে এত দুর্ব্বল হইয়াছিলাম যে,কিরূপে নির্ব্বিঘ্নে স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, উহাই একমাত্র চিন্তার বিষয় হইয়াছিল; যদিও দেবদর্শন, তীর্থ সেবা এবং নূতন নূতন স্থানের লোকদিগের আচার-ব্যবহার দেখিয়া কতপ্রকার শিক্ষালাভ করিতেছিলাম, তথাপি যে সকল অনিয়ম হইতেছে, তাহার ফল শীঘ্রই একদিন-না-একদিন ভোগ করিতে হইবে, ইহাই চিন্তার প্রধান কারণ হইয়াছিল, কিন্তু ভগবান বদরীনারায়ণের কৃপায় এবং বিশ্বেশ্বরজীউর আশীর্ব্বাদে আমরা সকল বিঘ্ন হইতেই উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। যাহা হউক, সুধীবৃন্দ আমার লেখনীর অভাব

পাঠ করিয়া বোধ হয়, কেহ এই দুর্গম পথে যাত্রা করিতে সাহস করিবেন না, এই নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা এই যে, তাঁহাদের স্থির জানা উচিত, ভক্তিসহকারে যাত্রা করিলে সেই পরম পুরুষ শ্রীশ্রীবদরী ও কেদারনাথ স্বামীর কৃপায় সকল প্রকার বিঘ্ন হইতেই উদ্ধার হইতে পারিবেন, সন্দেহ নাই; আরও তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত আপনি চেষ্টা করিলেও সফলকাম হইতে পারিবেন না। উপসংহারে আমার যতটুকু জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাহাতে এইমাত্র বলিতে পারি যে, ধন বল বা আপন সামর্থ্য বল ব্যতিরেকে যেন কখন কেহ এই দুর্গম তীর্থে যাত্রা না করেন। এ তীর্থে শুভ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সাধ্যমত কিছু শীত বস্ত্র, স্বর্ণের বিল্বপত্র ও তুলসী সংগ্রহ করিবেন।

যে রামনগরের পরিচয় পাইয়া পূর্ব্বে বলসঞ্চয় করিয়াছিলাম, সেই দেশের কিছু পরিচয় ও নগরের সৌন্দর্য্য দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইল, সুতরাং সকলে পরামর্শ করিয়া সম্মুখস্থ এক শস্যশ্যামলা সমতলভূমি দেখিয়া সেইদিকেই গমন করিতে লাগিলাম। এইরূপে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর স্থানীয় একটী বৃদ্ধ লোকের সহিত আলাপ হইল, লোকটী অতি সদাশয়, মিষ্টভাষী ও বিজ্ঞ এবং জাতিতে গোয়ালা। তাহার সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়া এদেশের অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে লাগিলাম, আমাদিগকে বিদেশী দেখিয়া এবং এই স্থানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে, তিনিও আগ্রহের সহিত এই দেশের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিতে লাগিলেন। অনেক কথাবার্ত্তার পর তাঁহার নিকট উপদেশ পাইলাম যে, এই সহরটী পূর্ব্বে মহাবীর ধর্ম্মাত্মা বিরাট রাজার রাজধানী ছিল, আর যে মাঠের উপর দিয়া আমরা গমন করিতেছিলাম, এই স্থানে তাঁহার গাভী সকল থাকিত। ইহার অনতিদূরে যথায় পাণ্ডবগণ এক বৎসরকাল অজ্ঞাতবাস করিবার সময় ছদ্ম-

বেশে ছিলেন, মহাবীর ভীমসেন যেখানে বল্লব নামে পরিচিত হইয়া মহাবাহু মহাপরাক্রান্ত বিরাট সেনাপতি কীচককে অবলীলাক্রমে বধ করিয়া পাণ্ডবমহিষী লক্ষ্মীস্বরূপিণী দ্রৌপদীকে সুখী করিয়াছিলেন, সেই স্থানটীও দেখিলাম। বৈভবন ও কাম্যবন ইহার সন্নিকটেই বিরাজিত। এই স্থানটী অতি নির্জ্জন ও রমণীয়।' ইহার কিঞ্চিৎ দূরে যথায় জয়দ্রথ গুপ্তভাবে পাঞ্চালী (দ্রৌপদীকে) হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন, আবার ভীমবাহু ভীমসেন যথায় তাহার দর্প চূর্ণ করিয়া সেই দ্রৌপদীকে জয়দ্রথের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই স্থানটীও দেখিলাম।

বীরবর কীচকের মৃত্যু সংবাদ প্রচার হইলে, কুরুরাজ দুর্য্যোধন সুযোগ বুঝিয়া স্বীয় অজেয় অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে ইহার কিছু দক্ষিণে যথায় সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া বিরাটপতির সুন্দর গাভীগুলি বলপূর্ব্বক হরণ করিতেছিলেন, ঐ সময় বিরাটপতি স্বয়ং গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকাতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উপদেশ মত মহাধনুর্দ্ধর "পার্থ" যিনি ছদ্মবেশে এখানে বৃহন্নলা নামে পরিচিত থাকিয়া রাজকুমারী উত্তরাকে সঙ্গীতবিদ্যা শিখাইতেছিলেন, সেই বৃহন্নলা ঐ সকল মহাবল কুরুবীর-গণকে একমাত্র বিরাট পুত্র উত্তরকে সঙ্গে লইয়া অনায়াসে যথায় তাঁহা-দিগকে যুদ্ধে পরাস্থ করিয়াছিলেন, সেই রণক্ষেত্র দর্শন করিলাম। কিন্তু হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! সেই প্রাচীন বিরাটপতির স্বর্গ-তুল্য সাধের রাজধানী, এক্ষণে সামান্য নগরে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এইরূপে এখানকার দ্রষ্টব্য স্থান সকল নয়নগোচর করিয়া মনের সুখে নির্ব্বিঘ্নে রামনগরের রেলষ্টেশনে উপ-স্থিত হইলাম। তথা হইতে যে রেলগাড়ীখানি বরাবর মোরাদাবাদ যায়, সেই রেলগাড়ীতে উঠিয়া পাবাসৌ নামক জংশন ষ্টেশনে অবতরণ-পূর্ব্বক নৈমিষারণ্যতীর্থ স্থান দর্শন করিবার জন্য তথায় যাত্রা করিলাম।

নৈমিষারণ্য তীর্থ

পামামৌ জংশন ষ্টেশন হইতে প্রায় ১॥০ ক্রোশ পথ গো-যানে বা মানুষ টানা গাড়ীর সাহায্যে অক্লেশে তীর্থস্থানে পৌছান যায়, তথায় দধিচী মুনির আশ্রম আছে। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের পর বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবল হইলে বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও মোক্ষধর্ম্মে অধিকার নাই, এই সিদ্ধান্তের স্থলে পরমার্থতত্ত্বে "মানবমাত্রেই সমাধিকার" এই মীমাংসা স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সময় চন্দ্র ও সূর্য্য রাজবংশ বিলুপ্ত-প্রায় হইলে নিরাশ্রয় ম্রিয়মাণ ঋষিগণ নির্জ্জন নৈমিষারণ্যক্ষেত্রে বাস করিবার উপযুক্ত স্থান স্থির করিয়া তথায় গমন করতঃ শাস্ত্রালোচনায় কালযাপন করিতেছিলেন। বৈষ্ণবগণ সেই সময়ে সুতবংশীয় বৈষ্ণব-প্রধান লোমহর্ষণ নামক পণ্ডিতকে উচ্চাসন প্রদান করিয়া নৈমিষারণ্য-বাসী ঋষিগণকে তাঁহারই দ্বারা লক্ষশ্লোকপূর্ণ ভারত কথামালা শ্রবণ করান। মহাত্মা ব্যাসদেব যে মহাভারতের আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে উহা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া লোমহর্ষণ দ্বারাই লক্ষ-শ্লোকপূর্ণ হইয়াছিল। কথিত আছে, কলির প্রারম্ভে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গেই ভারতে সহমরণ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়। বেদব্যাসের পরবর্ত্তী জন্মেজয় প্রভৃতি রাজগণের বিবরণ, মনু-সংহিতার উল্লেখ, রামায়ণের ইতিহাস এবং বৌদ্ধমত, এই সময়ে মহা-ভারতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যাওয়া যায় যে, বৃত্রাসুর সংহার সময় দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণসহ এখানে মহাত্মা দধিচীর নিকট বজ্রনির্ম্মাণ কারণ, তাঁহার দেহস্থ অস্থি প্রার্থনা করিলে মুনিবর তাঁহাকে বলিলেন, "হে দেবরাজ! আমি আপন অস্থি তোমার উপকারার্থে প্রদান করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কিন্তু কিছু-

দিনের জন্য আমায় অবসর প্রদান করিতে হইবে, এই সময়ের মধ্যে আমি একবার তীর্থ সকল পর্য্যটন করিব—কারণ অদ্যাপি আমার সকল তীর্থ পর্য্যটন শেষ হয় নাই।” তখন-দেবরাজ বৃত্রাসুরের সেই প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধের পরাভব একবার চিন্তা করিয়া অতিশয় কাতর হইলেন, এবং বিনীতভাবে দেবর্ষিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, “ঋষিবর! তীর্থপর্য্যটনই যদ্যপি আপনার এক মাত্র আপত্তি হয়, তাহা হইলে বৃথা সময় নষ্ট করিয়া দেবগণকে সেই অসুর হস্তে আর লাঞ্ছিত করিবেন না, আমি এই স্থানে পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ সকলকে উপস্থিত করিতেছি।” এই কথা বলিয়া দেবরাজ তীর্থ সমূহকে এই স্থানে আনয়ন করিলেন। তদবধি দেবরাজের কৃপায় নৈমিষারণ্যে সকল তীর্থ ই বিরাজিত। এহেন স্থানে মানবজীবন ধারণ করতঃ একবার সেবা করা কর্ত্তব্য, কারণ এখানে ব্রহ্মকুণ্ড নামে একটী কুণ্ড আছে, ঐ কুণ্ডের জল স্পর্শ করিলে জন্মজন্মান্তরের সকল পাপ নাশ হয়। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধজনিত ব্রহ্মহত্যাপাপ বশতঃ তাঁহার হস্তের কাল দাগ কিছুতেই উঠাইতে পারেন নাই, অবশেষে তিনি এই কুণ্ডে উপস্থিত হইয়া আপন হস্ত প্রক্ষালন করিবামাত্র উহা একেবারে উঠিয়া যায়। তখন তিনি সন্তুষ্টচিত্তে এই কুণ্ডের নাম “পাপহরণ” রাখিয়া বর প্রদান করিলেন যে, অতঃপর যে কোন মহাপাপী এই কুণ্ডে স্নান বা প্রক্ষালন করিবে, আমার বরপ্রভাবে তাহার সর্ব্বপাপ মোচন হইবে।

এই নৈমিষারণ্যে মহাবীর গরুড়, গজকচ্ছপকে লইয়া আসিয়া উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, যে স্থানে বসিয়া তিনি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের চিহ্ন অদ্যাপি এখানে বর্ত্তমান আছে, আরও এই স্থান একান্ন পীঠস্থানের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ পীঠ স্থান বলিয়া খ্যাত। জগজ্জননী ললীতাদেবী নামে এই স্থানে পুরী

আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন। সাধ্যমতে এই দেবীর পূজা করিতে অবহেলা করিবেন না। যাঁহারা এই নৈমিষারণ্য হইতে অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম স্থানের লীলা সকল এবং রাজধানীর শোভা দর্শন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা এই স্থান হইতে গো-শকটের সাহায্যে সাত ক্রোশ পথ অতিক্রম করিলেই অযোধ্যার তীর্থ তীরে পৌঁছিতে পারিবেন। আমার ভ্রমণ-কাহিনীর প্রথম খণ্ডে অযোধ্যার বিষয় পাঠ করিলেই সমস্ত অবগত হইবেন, এবার আমরা এখান হইতে অযোধ্যা নগরে না যাইয়া আউদ রহিল খণ্ড রেলযোগেই এই লাইনের শেষ সীমা এলাহাবাদ জংশন নামক ই, আই, রেলের একটী প্রধান ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছিলাম।

এলাহাবাদ

এলাহাবাদ অতি প্রাচীন ও বৃহৎ নগর। এখানে হিন্দু রাজা ও মুসলমান বাদসাহদিগের অনেক কীর্ত্তি দেখিবার আছে। যদিও আমরা সকলেই এই সহর হইতে প্রয়াগ তীর্থের সেবা দুইবার করিয়াছিলাম, তথাপি বদরীনারায়ণের পথে যে পঞ্চপ্রয়াগ দর্শন করিয়াছিলাম, তৎসঙ্গে এলাহাবাদের সন্নিকটস্থ প্রয়াগ তীর্থের সেবা করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম, কারণ বদরীনারায়ণের পথ হইতে বরাবর আমাদের কলিকাতা আসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিধির বিপাকে যখন সেই প্রাচীন তীর্থ এলাহাবাদেই উপস্থিত হইলাম, তখন এই সঙ্গে প্রয়াগ তীর্থের সেবা না করি কেন? আমার প্রথম ও দ্বিতীয়বারের প্রয়াগ ভ্রমণ-কাহিনী প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত আছে, এবার তৃতীয়বারের কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে।

এই নগরে বাদসাহীমণ্ডাই, রাণীমণ্ডাই, সাগঞ্জ, কীটগঞ্জ, মটগঞ্জ

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলকে প্রয়াগ বা ত্রিবেণী বলে। এই সঙ্গম স্থলে ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া সাধ্যমত দান করিলে অধিক ফললাভ হয়। এই সঙ্গমস্থানের উপরিভাগে এলাহাবাদ দুর্গ বিরাজমান।

রেলগাড়ী হইতে যমুনার এপার, এলাহাবাদের দৃশ্য অতি মনোহর। সহরের দক্ষিণে যমুনা, পশ্চিমে, উত্তরে ও পূর্ব্বে গঙ্গা বিরাজিত। এলাহাবাদ, আগ্রা, অযোধ্যা প্রভৃতি যুক্তপ্রদেশের রাজধানী। এই নিমিত্ত ছোটলাটের প্রধান আড্ডা এই সহরে, ফলতঃ অফিস, আদালত সমস্তই এখানে বিদ্যমান। এখানকার প্রধান ভাষা হিন্দী, তৎপরে উর্দ্দু, তাহার পর সর্ব্বশেষ বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত।

এলাহাবাদের দক্ষিণ অংশে সহরের প্রধান বাজার "রাজার চক্।" ইহার আশে-পাশে খুব ঘন বসতি। যতগুলি পল্লী এখানে আছে, তন্মধ্যে শাহাগঞ্জ, বাদসাহী মণ্ডাই ও আতরসুইয়া নামক পল্লীতে বহু বাঙ্গালী বাস করিয়া থাকেন। উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ার মধ্যে প্রায় দুই মাইল ব্যবধানমাত্র। এই স্থানে সহরের প্রধান স্কুল, কলেজ ও উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে। পশ্চিমদিকে দেশী লোকদিগের বসতি নাই, তথায় কেবল অফিস, আদালত, ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতেই সুসজ্জিত—আর ঐ দিকেই সাহেবগণ বসবাস করিয়া থাকেন।

সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে এই সহরের নাম ইলাহিবাস অর্থাৎ ঈশ্বরের আবাস ছিল; এক্ষণে ঐ নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া ইংরাজদিগের নিকটে এলাহাবাদ হইয়াছে।

প্রয়াগে বুদ্ধদেব তাঁহার পুণ্য পদধূলি প্রদান করিয়া তীর্থটীকে পবিত্রতর করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব পঞ্চ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সিদ্ধার্থ নামে জনসমাজে পরিচিত হইয়া "বিশ্বামিত্র" নামক এক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের

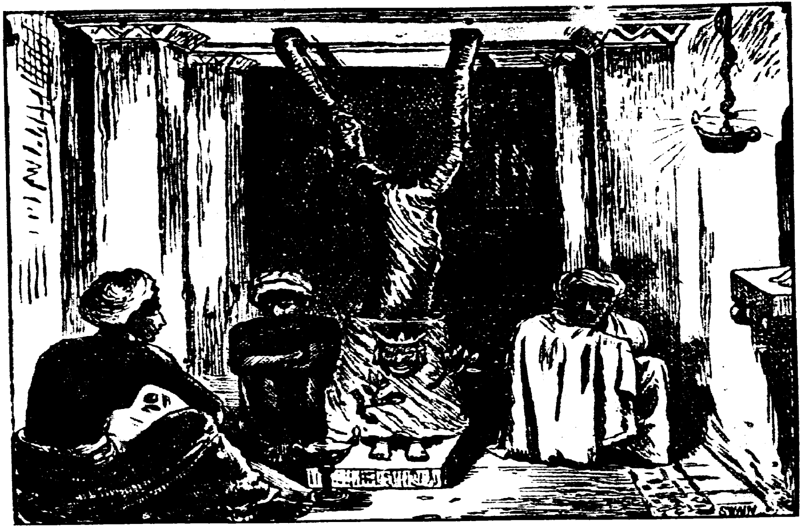
নিকট প্রথম বিদ্যা শিক্ষা করিবার সময় গুরু যখন তাঁহাকে "অ" বলিতে বলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার শ্রীমুখ হইতে 'অনিত্যঃ সর্ব্বসংসার স্কন্ধঃ' উচ্চারিত হইয়াছিল, তৎপরে যখন গুরু তাঁহাকে "আ" বলিতে শিক্ষা দিলেন, তখন আবার তাঁহার শ্রীমুখ হইতে "আত্মপরহিতঃ কার্য্যঃ" উচ্চারিত হইয়াছিল, পঞ্চম বর্ষীয়-বালকের মুখে এইরূপ জ্ঞানগর্ভ বচন শ্রবণ করিয়া গুরুকে তাঁহার নিকটে হার মানিতে হইয়াছিল। সিদ্ধার্থ যৌবনকালে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সারথি ছন্দকের নিকট উপদেশ পাইয়া উজ্জ্বল আলোকে তাঁহার কামনাময় ইন্দ্রধনু জন্মের মত মুছিয়া ফেলিয়াছিল, অর্থাৎ সেই সময় হইতে তিনি জীবনপথে অগ্রসর হইবার অবসর খুঁজিয়াছিলেন। অর্থাৎ আপন সহধর্ম্মিণী গোপাকে ও আনন্দময় ঔরসজাত শিশুপুত্র এবং অতুলনীয় রাজ্য-সুখ ধূলিমুষ্টির মত পরিত্যাগ করিয়া গভীর নিশীথে ধীরে ধীরে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইয়া "বুদ্ধত্ব" লাভ করিয়াছিলেন।

রামায়ণ ও মহাভারত সঙ্কলনের পরে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের চরণপ্রান্তে, নেপালের নিকটবর্ত্তী কপিলাবস্তু নগরে খৃষ্টজন্মের ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়রাজকুলে শাক্য-মুনি জন্মগ্রহণ করেন। সেই মহাত্মাই বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক। কথিত আছে যে, এতাদৃশ পবিত্র ধর্ম্ম জগতে আর কখন প্রকাশ হয় নাই; "বোধিসত্ত্বস্য পূর্ব্বমশ্রুতেষু ধর্ম্মেষু।" সেই মহাত্মা বুদ্ধদেবের দশ আজ্ঞা অত্যন্ত সার ও নীতিগর্ভ।

যথা ;—

"জীবহিংসা, চুরি, পরদার গ্রহণ, মিথ্যাকথন, মদকদ্রব্য সেবন,

এইরূপ যুক্তি করিয়া যবনদিগের শ্রেষ্ঠ হইবার মানসে তিনি ভক্তিসহকারে এই স্থানে এই শিবারাধনাপূর্ব্বক বটবৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করেন, তাহারই ফলে পরজন্মে তিনি আকবর নামে জন্মগ্রহণ করিয়া যবনদিগের শ্রেষ্ঠ, সম্রাটরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। একদা এই সম্রাট যোগবল অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্ব বৃত্তান্ত এবং আপন অবস্থার বিষয় সমস্ত অবগত হইলেন, তখন পাছে অপর কেহ তাঁহার মত পরজন্মে সুবিধা করিয়া লয়, এইরূপ চিন্তা করিয়া এই অক্ষয়বট ও শিবমূর্ত্তিটী যত্নের সহিত হিন্দুদিগের প্রাচীন কেল্লার মধ্যে রাখিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে গড় নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে সৈন্যদিগের প্রধান আড্ডা সংস্থাপন করাইলেন। বলাবাহুল্য,এই প্রাচীন বটবৃক্ষটী পূর্ব্ব হইতে হিন্দুদিগের কেল্লার সন্নিকটে ছিল। বাদসা আরও ব্যবস্থা করিলেন যাহাতে কোনরূপে অপর কেহ এই বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিতে না পারেন, এবং আত্মহত্যা যে কি মহাপাপ তাহাও সাধারণকে বিশেষরূপে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, এইরূপে তাঁহার উপদেশ মত এবং সুব্যবস্থার গুণে এই বৃক্ষের উপর হইতে পতিত হইয়া আত্মহত্যা প্রথা অন্তহিত হইল। তাঁহার রাজত্বকাল হইতে এইরূপে এই পবিত্র বৃক্ষটী কেল্লার মধ্যে যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছে। কালক্রমে ইংরাজ বাহাদুর এই কেল্লা দখল করেন, তাঁহারা এই বৃক্ষ ও শিবমূর্ত্তির পৌরাণিক ইতিহাস অবগত হইয়া হিন্দুদিগের পবিত্র শিবমূর্ত্তি ও বটবৃক্ষটীকে অদ্যাপি যত্নের সহিত রাখিয়া পূর্ব্বপ্রথানুসারে স্থানীয় পাণ্ডাদিগের জিম্মায় রক্ষিত করিয়া ইংরাজরাজের মহিমা প্রকাশ করিতেছেন, সুতরাং কোন হিন্দু নরনারী এই পবিত্র বৃক্ষ ও শিবমূর্ত্তিটীকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে পাণ্ডারা তাহাকে অবাধে কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দর্শনদান করান।



কেল্লা মধ্যস্থ সেই প্রাচীন অক্ষয় বটের দৃশ্য। [২৪১ পৃষ্ঠা।]

নামে বিরাজ করিতেছেন। আলোপীদেবীর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণগণ সুমধুর স্বরে বেদ পাঠ করিয়া থাকেন, মন্দিরাভ্যন্তরে এক বৃহৎ তাম্রসিংহাসনোপরি "দেবী" বিরাজমান থাকিয়া পুরী আলোকিত করিয়া আছেন।

আলোপীদেবীর মন্দিরের কিয়দ্দূরে রামঘাট ও শিখাকুণ্ড ঘাট দৃষ্টিগোচর হয়, ইহার সন্নিকটেই রাজা বাসকীর ঘাট। এই ঘাটটী ভোগবতীর ঘাট নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বাসকীর ঘাট—এই নগরের মধ্যে প্রধান দর্শনীয় স্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। "রাজা বাসকী" মূর্ত্তি একটী বাঁধা ঘাটের উপর মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, ঐ মন্দিরটী একটী বৃহদাকার সর্পের দ্বারা বেষ্টিত আছে।

বাসকীঘাটের নিকটেই শিবকোট দেখিতে পাইবেন। কথিত আছে, পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালন সময়ে বনবাসকালীন ঘাটের উপর এই শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। এই লিঙ্গরাজকে ভক্তিসহকারে পূজা করিলে কোটি শিবপূজায় ফললাভ হয়, এই নিমিত্ত এই দেবের শিবকোট নাম হইয়াছে।

ঝুঁশী (প্রতিষ্ঠিত প্রয়াগ) কম্বলা, শ্বশুর ও ভোগবতীর মধ্যস্থলে প্রজাপতির বেদী অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্থানে দেবগণ, ঋষিগণ ও নৃপতিগণ ভূরি ভূরি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত ইহার নাম প্রয়াগ হইয়াছে। ঝুঁশীর গঙ্গাতীরস্থ পাড়গুলি, পাহাড়ের মত উচ্চ, এই উন্নত পাহাড়ের উপর ঠিক্ গঙ্গার ধারে একটী পরম রমণীয় পান্থাশ্রম আছে, সেখানে বহু সাধু, সন্ন্যাসী কৃত্রিম গুহার মধ্যে বাস করিয়া থাকেন। শতাধিক সোপান অতিক্রম করিয়া এই আশ্রমে উঠিতে হয়। অতিথি কিম্বা যাত্রীদিগের বিশ্রামের জন্য এখানে পাকা বাড়ী আছে। এই পবিত্র স্থানটী দেখিলেই বোধ হয়, যেন পূর্ব্বকালে



ঝুঁশী প্রতিষ্ঠিত প্রয়াগ ঘাটের দৃশ্য। [২৪৭ পৃষ্ঠা]

ইহা বৌদ্ধ ভিক্ষুকদিগের বিহার স্থান ছিল—তাই এক্ষণে বৈষ্ণব ও সাধুদিগের সাধনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। পুণ্যভূমি প্রয়াগ তীর্থে উপস্থিত হইলেই এই আশ্রমটী কর্ত্তব্যবোধে দর্শন করিবেন। পাঠক-বর্গের প্রীতির নিমিত্ত ঝুঁশী প্রতিষ্ঠিত প্রয়াগ তীর্থস্থানের একটী চিত্র প্রদত্ত হইল।

এই স্থানের কিয়দ্দূর উত্তর-পশ্চিমে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমপথে শ্রীশ্রীবেণীমাধবজীউর মন্দির বিরাজমান। মন্দিরাভ্যন্তরে ভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও জীবন চরিতার্থ করিবেন। এই বেণী-মাধবজীউর নামানুসারে তীর্থ-ঘাটটীর নাম বেণীঘাট হইয়াছে।

বেণীঘাটের উপরিভাগে যে প্রয়াগ তীর্থ বিরাজিত, যে স্থান ঝুঁশী প্রতিষ্ঠিত প্রয়াগ নামে খ্যাত; ত্রেতাযুগে পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র বনবাস-কালীন যথায় কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই তাঁহার মিতা গুহক চণ্ডালের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করেন, সেই স্থানটীও পরম রমণীয় এবং তীর্থ স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

যে চণ্ডাল অস্পৃশ্য বলিয়া কথিত, সেই চণ্ডালের সহিত পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের কিরূপে মিত্রতা জন্মিয়াছিল, পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত এই স্থানে সেই গুহক চণ্ডালের কিছু পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সংক্ষেপে প্রকাশিত করিলাম।

গুহক পূর্ব্বজন্মে সূর্য্যকুল পুরোহিত বশিষ্ঠ মুনির পুত্র ছিলেন। মহারাজ দশরথ মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুকে ভুলক্রমে মৃগবোধে হত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্তবিধানহেতু যখন বশিষ্ঠ গৃহে গমন করেন, তৎকালে পুরোহিত বশিষ্ঠদেব আশ্রমে না থাকায় রাজা তাঁহার প্রিয়পুত্র বামদেবকে সম্মুখে দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ প্রকাশপূর্ব্বক করুণবচনে তাঁহারই নিকট প্রায়শ্চিত্ত-

বিধান জিজ্ঞাসা করেন। বামদেব সমাগত রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার দুঃখে কাতর হইয়া এই ব্রহ্মবধজনিত পাপ হইতে উদ্ধারের জন্য "ভক্তিসহকারে সঙ্কল্পপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তিনবার তাঁহাকে রামনাম জপ করিবার বিধান প্রদান করিলেন।"

মহারাজ দশরথ পুরোহিত পুত্র বামদেবের বিধান অনুসারে এই মহাপাপ হইতে উদ্ধার কামনা করিয়া সঙ্কল্পপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তিনবার "রামনাম" জপ করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেব আশ্রমের অনতিদূরে অকস্মাৎ দশরথের মুখে রামনাম উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আপন আশ্রমে উপস্থিত হইয়াই বামদেবকে তাহার তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞাপ্রাপ্তে বামদেব পিতার নিকট যুক্তকরে সবিনয়ে নিবেদন করিলেন যে, মহারাজ দশরথ ব্রহ্মহত্যা করিয়া প্রায়শ্চিত্তবিধানহেতু আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হন, কিন্তু আপনার অদর্শনে তিনি আমার নিকট বিধান জিজ্ঞাসা করাতে আমি সঙ্কল্পপূর্ব্বক তিনবার উচ্চৈঃস্বরে রামনাম জপ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। তজ্জন্যই আপনি তাঁহার মুখে রামনাম শ্রবণ করিয়াছেন।

বশিষ্ঠদেব, পুত্রের নিকট এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া কোপান্বিত-কলেবরে বামদেবকে ভৎর্সনাসহকারে বলিলেন, "ব্রহ্মহত্যা মহা পাপ-ক্ষয় করিবার জন্য তুমি যে সামান্য ব্যবস্থা দান করিয়াছ, উহা অস্পৃশ্য চণ্ডালের ন্যায় হইয়াছে, অতএব তুমি অচিরাৎ চণ্ডাল হও।" তখন বামদেব হতাশপ্রাণে ক্রুদ্ধ পিতার শ্রীচরণপ্রান্তে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। স্নেহের পুত্তলি বামদেবের কাতর প্রার্থনায় বশিষ্ঠদেব কৃপাপরবশ হইয়া এই আশীর্ব্বাদ করিলেন যে, ত্রেতাযুগে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া

যখন দশরথ গৃহে বিরাজ করিবেন, বাল্যকালে তাঁহার লীলার সময় তুমি সেই পরম ব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্রের মিত্র হইতে পারিবে এবং আমার আশীর্ব্বাদে সেই প্রেমময় শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় তাঁহার লীলাবসানে তুমিও নির্ব্বিঘ্নে বৈকুণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইবে। সেই বশিষ্ঠ পুত্র বামদেব শাপ-ভ্রষ্ট হইয়া গুহক চণ্ডালরূপে ধরায় আবির্ভাব হইয়া ভগবান্ শ্রীরাম-চন্দ্রের মিত্র হইয়াছিলেন।

প্রয়াগতীর্থ—প্রতিপদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলদান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে শুদ্ধচিত্তে প্রয়াগ দর্শন, স্পর্শন বা সঙ্গমস্থলে স্নান করেন, তিনি নিষ্পাপী হইয়া সুখে দিনাতিপাত করিতে পারেন। কেন না, যে স্থানে নিয়ত ব্রহ্মাদি দেবগণ, দিক্-দিকপালগণ, লোক-পালগণ, সাধ্যগণ, ব্রহ্মঋষিগণ, নাগগণ, সুপর্ণকগণ, সিদ্ধিসগরগণ, অপ্সরাগণ ও স্বয়ং ভগবান্ এবং প্রজাপতি অবস্থিত, সেই পবিত্র স্থানের মাহাত্ম্য লেখনীর দ্বারা প্রকাশ কিরূপে হইতে পারে ?

এই তীর্থে তিনটী অগ্নিকুণ্ড আছে, তন্মধ্য দিয়া সরিদ্বরা গঙ্গাযোগ প্রবাহিতা হইয়াছে, ইহাকেই ঋষিগণ প্রয়াগতীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই স্থানে দেব ও যজ্ঞ মূর্ত্তিমান হইয়া ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছেন, এই নিমিত্ত প্রয়াগ ত্রিলোকপূজ্য, পুণ্যত্তমরূপে বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ। এই তীর্থতীরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন অথবা গাত্রে গঙ্গা-মৃত্তিকা লেপন করিলে সকল পাপ মোচন হইয়া থাকে। মনুষ্যমাত্রেই এই তীর্থের সেবা করা উচিত।

এলাহাবাদের যমুনাতীরে যে লৌহনির্ম্মিত সেতু আছে, উহার শিল্পকার্য্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই সেতুটী তিন ভাগে বিভক্ত। ইহার উপর দিয়া রেলগাড়ী যাতায়াত করিতেছে, মধ্যে মনুষ্য-গণ এবং নিম্নভাগে জলযান সকল গমনাগমন করিতেছে, সুতরাং ইহার

নির্ম্মাণকারীর প্রশংসা করিতে ইচ্ছা হয়। বিশ্রামবেদী—এই প্রস্তর নির্ম্মিত বেদীটী নির্ম্মাণ করিতে নীলকমল মিত্র নামক জনৈক হিন্দু অকাতরে কত টাকাই ব্যয় করিয়াছেন, উহা বর্ণনাতীত। বেদীর নিকটেই থর্ণহিলস্ মেমোরিয়াল, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে কি সুন্দর প্রণালীতে এবং কত বহু মূল্য দ্রব্য সামগ্রীতে ইহা সজ্জিত, তদ্দর্শনে চমৎকৃত হইতে হয়। এই মেমোরিয়াল হইতে আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলেই খসরু বাগ ও যুমামস্জিদ দেখিতে পাইবেন। খসরু বাঘ নামক উদ্যানের চতুর্দ্দিকেই অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আছে। কথিত আছে, এলাহাবাদের কেল্লা প্রস্তুত হইলে পর যে সমস্ত মাল মসলা অবিশিষ্ট থাকে, সম্রাট পুত্র খসরুর আজ্ঞানুসারে ঐ অবশিষ্ট মসলাগুলিতে তাঁহার পছন্দানুযায়ী এই উদ্যানটী প্রস্তুত হইয়া তাঁহারই নাম অনুসারে এই সুন্দর কারুকার্য্যে শোভিত উদ্যানটীর নাম খসরুবাগ হইয়াছে। এই মনোমুগ্ধকর বাগানটীতে প্রবেশ করিতে হইলে মধ্যস্থলে যে একটী প্রকাণ্ড ফটক আছে, উহারই ভিতর দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। বাগিচার মধ্যে প্রবেশ করিলে কোনটী রাখিয়া কোনটীর সৌন্দর্য্য দেখিব, এইরূপই মনে হইতে থাকে। এই সকল সুন্দর সুশোভিত কারুকার্য্য নয়নগোচর হইলে মনে হইতে থাকিবে, আমাদের দেশের লোকে যে বাদসার উপমা দেন, উহা কেবল তাঁহাদের শোখন পছন্দের নিমিত্ত। এইরূপে এখানকার তীর্থ সকলের সেবা এবং নগরের নানাপ্রকার শোভা দর্শন করিয়া প্রয়াগ তীর্থ স্থান হইতে আপন আলয়াভিমুখে স্বজনগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য যাত্রা করিলাম। খসরুবাগের মনোমুগ্ধকর চিত্র একখানি প্রথম খণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে, ঐ চিত্রখানি দেখিলেই সমস্ত বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

সমালোচনা

(সারসংগ্রহ)

স্থানাভাববশতঃ কয়েকখানি ভিন্ন সকল অভিমত প্রকাশিত হইল না।

বর্ত্তমান সাহিত্যযুগের অদ্বিতীয় সমালোচক চুঁচুড়া নিবাসী দেশপূজ্য সুপ্রবীণ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহোদয় "সচিত্র তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী সম্বন্ধে বলেন ;—

কতকটা সখের খাতিরে, কতকটা স্বাস্থ্যের জন্য যৌবনে অনেক তীর্থেই ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, আজ আবার বৃদ্ধ বয়সে ঘরে বসিয়া আগ্রহের সহিত "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" পড়িলাম। দেখিলাম, এই নূতন লেখক এক নূতন পন্থায় তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের খাঁটি হিন্দুত্ব সব প্রকাশ হইয়াছে। গ্রন্থের গুণপনা এই যে, ইহাতে সমাজের ছড়াছড়ি, অলঙ্কারের হুড়াহুড়ি নাই, ভাষাটী বেশ সরল, স্নিগ্ধ ও শান্ত—যেন বাঙ্গালীরই ঘরের কথা, আর গ্রন্থকারের গুণপনা এই যে, পরের মুখে ঝাল না খাইয়া ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর পবিত্র চক্ষে তীর্থ সম্বন্ধে মাহাত্ম্য সকল খুঁটিনাটী কথা কহিয়া সাধারণের অজ্ঞেয় বহু তত্ত্বই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন। এই গ্রন্থের এক খণ্ড সঙ্গে থাকিলে বিদেশ গিয়া সহচরের অভাবে কোন অসুবিধাই ভোগ করিতে হয় না ; কেন না, কোন্ তীর্থে কি দর্শনীয় কি করণীয়, কোন্ পূজার কোন্ দ্রব্য প্রয়োজনীয়, কোন্ স্থানের অধিবাসীরা কোন্ জিনিষকে কি নামে অভিহিত করে, এ সকল কথা বেশ নিপুণতার সহিত বিশদভাবে বোঝান হইয়াছে।

বসুধা, ১ম সংখ্যা—১২শ বর্ষ, সন ১৩১৯ সাল।

বিখ্যাত "মেদিনীপুর" হিতৈষী সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত। উত্তম কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১৲ টাকা। তীর্থ সমূহের পনেরখানি উত্তম হাফ্‌টোন ছবি আছে। গ্রন্থকার বহুবার তীর্থপর্য্যটন করিয়া যে সমুদয় জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে তীর্থ-যাত্রীবৃন্দ বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তীর্থে কত প্রকার চোর, জুয়াচোর, বদমাস ও প্রতারক আছে, ইহা পাঠে তাহা জানিতে ও সাবধান হইতে পারিবেন। ইহাতে তীর্থ সমূহের বিশেষ বিবরণ ও কোন্ কোন্ তীর্থে কোন্ কোন্ দ্রব্যের আবশ্যক ও দ্রষ্টব্য স্থান কি, তাহাদেরও বিশেষ উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ-সমূহের বিবরণী সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন প্রাচীন পুরাণ-কাহিনী-তীর্থের উৎপত্তিও বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকারের প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা লোকহিতৈষণাবৃত্তিই সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হইতেছে, এজন্য তিনি অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র।

মেদিনীপুর হিতৈষী, ২৫শে আষাঢ়, সন ১৩১৮ সাল।

বৈশ্যজাতির মুখপত্র প্রসিদ্ধ "সুবর্ণবণিক" সম্পাদক বলেন ;—

"তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকামাত্র। এই পুস্তকখানি বিলাতী বাঁধাই, ছাপানও অতি সুন্দর। অনেক তীর্থ-চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" তীর্থযাত্রীর একমাত্র সম্বলের বস্তু বলিলে অত্যুক্তি হয় না, তীর্থ ভ্রমণকালে তীর্থযাত্রীদিগকে ঠগের হাতে পড়িয়া অনেক সময়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়, তন্নিবারণের জন্য গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়ন

করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। অনেক তীর্থের ইতিহাসও ইহাতে বেশ সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

সুবর্ণবণিক, ৩রা অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৭ সাল।

জগদ্বিখ্যাত বসুমতী সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীগোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, ৩৫৬ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে শ্রীবিপিনবিহারী ধর কর্ত্তৃক প্রকাশিত। উত্তম কাপড়ে বাঁধা, মূল্য ১৲ টাকা। নানা তীর্থের বহু হাফ্‌টোন ছবি ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তীর্থযাত্রীগণ পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ-লাভ করিবেন। ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থ সমূহের বিবরণ প্রভৃতি ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বসুমতী, ২রা অগ্রহায়ণ, সন ১৩১৮ সাল।

জন্মভূমি সম্পাদক বলেন ;—

সচিত্র "তীর্থ ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। কাশী, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি অনেকগুলি পুণ্যতীর্থ ভ্রমণ করিয়া গোষ্ঠবিহারী বাবু এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। যাঁহারা তীর্থ দর্শনে অভিলাষী, এতদ্দ্বারা কেবল তাঁহাদের বিশেষ উপকার হইবে, এমন নহে—যাঁহারা ঘরে বসিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারাও অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন। তীর্থের অনেক স্থানের মাহাত্ম্য অনেকে অবগত নহেন,এই পুস্তকে বিশেষ বিশেষ পুণ্যস্থানের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য সন্নিবেশিত থাকাতে ইহা ভক্তগণের পরম আদরণীয় হইয়াছে।

জন্মভূমি, ১৫ সংখ্যা, মাঘ, সন ১৩১৮ সাল।

একমাত্র দৈনিক সুপ্রসিদ্ধ নায়ক সম্পাদক বলেন, সচিত্র "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ধর-প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা।

এই বইখানি খুলিলে প্রথমেই ইহার চিত্রগুলি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাতে গ্রন্থকারের প্রতিকৃতিসহ ১৫।১৬খানি পূর্ণ আকারের সুদৃশ্য হাফ্‌টোন চিত্র আছে। চিত্রগুলি সুন্দর! গ্রন্থের আকার ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, আড়াই শত পৃষ্ঠার অধিক। উত্তর ভারতের অনেকগুলি তীর্থক্ষেত্রের বৃত্তান্ত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তীর্থক্ষেত্রে গমনের পথে প্রবঞ্চক ও সেতুয়া এবং তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডাগণের অত্যাচার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান প্রধান তীর্থ ক্ষেত্রের উৎপত্তির বিবরণ, পূজা ও দেবদর্শন বিধি, দেবতা ও পাণ্ডাগণের প্রণামী এবং অন্যান্য প্রাপ্য, তীর্থ যাত্রীদিগের যে সকল দ্রব্য, যে পরিমাণ পাথেয় এবং নিজের ব্যহারের জন্য যে সকল জিনিষ আবশ্যক, তাহার তালিকা—এ সকল বিষয় এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তীর্থ ক্ষেত্রের বিবরণের সঙ্গে অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানেরও বিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে, এমন কি নারীজাতির লক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ও এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা মন্দ নয়, মোটের উপর গ্রন্থখানি সুপাঠ্য হইয়াছে।

নায়ক—২৪শে বৈশাখ, ৫ম বর্ষ, সন ১৩১৯ সাল।

চিত্রসূচী

লক্ষিত হইয়া থাকে। এখনও যাত্রীদিগের মধ্যে এমন অনেক মহানুভবকে দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা তীর্থে গমন করতঃ ভক্তিসহকারে যথাবিধি তীর্থ কার্য্য সম্পাদন, ভগবানের লীলাভূমি দর্শন করিয়া প্রেমে পুলকিত হন—অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন, পবিত্র স্থানে বিলুণ্ঠিত হইয়া জীবন সার্থক বোধ করিয়া থাকেন। অধীন আবাল্যকাল হইতে তীর্থ-ভ্রমণ প্রয়াসী, নানা তীর্থস্থান স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছি, সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত সাধ্যমত উহাই এই "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" নামে জনসমাজে প্রকাশ করিতেছি। আশা করি, যাঁহারা তীর্থ-ভ্রমণ অভিলাষী, তাঁহারা একবার আমার বহু আয়াস ও যত্নের এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইলে আমার সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। পরিশেষে নিবেদন এই যে, "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" তীর্থ ভ্রমণ প্রয়াসীদিগের প্রিয় সহচর, যাহাতে ইহা পথ-প্রদর্শকের সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। আবশ্যকবোধে স্থানে স্থানে পুরাণাদি নানাগ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি। ভ্রমণ-কাহিনী দ্বিতীয় ভাগেতে কলিকাতা হইতে রেল-যোগে ওয়ালটেয়ার, প্রহ্লাদপুরী, গোদাবরী, মান্দ্রাজ সহর, কাঞ্চীপুর, বালাজী, জলকান্তীশ্বর, অরুণাচলম্, বৈদ্যেশ্বর, মায়াভরম্, কুম্ভকোণম্, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী সহর, জগদ্বিখ্যাত শ্রীশ্রীরঙ্গমজীউর দেবালয়, কাবেরী নদীর আদি বৃত্তান্ত, কিষ্কিন্ধ্যাপুরী, বিরূপাক্ষ দেব, মহীশূর-রাজের স্বাধীন রাজ্য ও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত চামুণ্ডাদেবী, মাদুরা সহর, সেতুবন্ধে শ্রীশ্রীরামেশ্বরজীউ, আরও হরিদ্বার হইতে কনখল, লক্ষ্মণঝোলা, হৃষিকেশ, প্রসিদ্ধ ধাম শ্রীশ্রীকেদারেশ্বর ও শ্রীশ্রীবদরীকাশ্রম; আরও কোন্ তীর্থে কিরূপ দ্রব্যের আবশ্যক, উপরোক্ত বিষয়গুলি এবং তীর্থের উৎপত্তি সমূহ সরল বাঙ্গালা ভাষায় সুচারুরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আত্মকাহিনী

পূজনীয় আদিত্যদেবের, আদিত্য-হৃদয় নামক মহা স্তোত্র মন্ত্র, জপ করিয়া শুভলগ্নে "তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী" নামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, কেন না নিত্যকাল এই মন্ত্র, জপ করিলে অক্ষয় মঙ্গললাভ হইয়া থাকে। ইহা সকল মঙ্গলের মঙ্গল এবং সর্ব্বপাপ বিনাশক, এমন কি ইহা দ্বারা সকল দুশ্চিন্তা দূরীভূত এবং পরমায়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত, জ্বরাদি রোগগ্রস্ত, চৌরাদি ভয়ে অভিভূত, কান্তারে নিপতিত, সে ব্যক্তি যদি ভক্তিভাবে এই উদয়শীল ও রশ্মিমান্ সূর্য্যদেবের অর্চ্চনাপূর্ব্বক কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে কখনই তাহাকে নিষ্ফল বা অবসন্ন হইতে হয় না। যে দেব সুরাসুরের নমস্য ও ভুবনের অধীশ্বর, যিনি সর্ব্বদেবময় ও তেজস্বী, যিনি নিজ রশ্মি দ্বারা সমস্ত বস্তু উদ্ভাবন ও সুরাসুরকে পালন করিয়া থাকেন, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ ও প্রজাপতি, যিনি মহেন্দ্র, কুবের, কাল, যম, চন্দ্র ও সমুদ্র নামে অভিহিত, যে দেব জন-সমাজে পিতৃ, বসু ও সাধ্যগণ নামে পরিচিত, যিনি মরুত, বায়ু, বহ্নি, প্রজাপ্রাণ ও ঋতুকর্ত্তা, যিনি আদিত্য, সবিতা, সূর্য্য, পূষা ও গভস্তি-মান; যিনি তিমিরারি, বিশ্বকর্ম্মা, মার্ত্তণ্ড ও অংশুমান, যিনি তপন, অহস্কর ও রবি। যে দেব অদিতি পুত্র নামে পরিচিত হইয়া পূজা গ্রহণ করেন, যিনি শঙ্খ ও তিমিরনাশন, যিনি ব্যোমনাথ, বেদ এবং প্রতিপাদ্য, যিনি স্বপথে শীঘ্রগামী, কবি, বিশ্ব, রক্ত ও সর্ব্বকার্য্যের হেতু, যিনি নক্ষত্র, গ্রহ ও তারাগণের অধিপতি ও বিশ্বভাবন, যিনি তেজস্বী ও দ্বাদশাত্মা, যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ ও দিনাধিপতি; যিনি জ্ঞান

ও অজ্ঞানের প্রকাশক, যিনি ভূতগণের নিদ্রাবস্থায়ও জাগরিত আছেন, যিনি কিরণ বিকীর্ণ করিয়া লোকপালন, লোকসন্তাপন ও শোষণ বর্ষণাদি ক্রিয়া করিয়া থাকেন। যে পরম পুরুষ যজ্ঞের দেবতা, সংসারে প্রাণীদিগের যে সমস্ত কার্য্য আছে, যিনি সেই সমুদায়ের যোজনকর্ত্তা, আমি সেই প্রধান পুরুষ সর্ব্বগুণের আধার করুণাময় সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা-সহকারে এই শুভকর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম।

জ্ঞান, অর্থ ও শক্তি।
এই তিনে হয় মুক্তি॥

এই তিন লইয়া মানবের উন্নতি, মানব চিরদিনই ত্রিতত্ত্বের উপাসক। প্রমাণস্বরূপ দেখুন—বিদ্যার অধিশ্বরী নারী, ধনের অধিশ্বরী নারী, শক্তির অধিশ্বরী নারী, সুতরাং এই নারীরত্ন বিরূপ হইলে সকল কর্ম্মই পণ্ড হয়; অর্থাৎ সরস্বতী, লক্ষ্মী ও দুর্গা—এই ত্রিশক্তিরূপিণী জগজ্জননীর কৃপা ব্যতীত কেহ কখন কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন না। এই জন্য এই নারীত্রয় সর্ব্বত্রই পূজিতা—আদি, এই তিন শক্তি হইতে ক্রমে তেত্রিশ কোটিতে পরিণত হইয়াছে।

আমার বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই, যশ নাই, কীর্ত্তি নাই, কৃতিত্ব নাই—আছে কেবল ঐ রাঙ্গা চরণ ভরসামাত্র। দাও মা! হৃদয়ে বল দাও। অধীন কেবল তোমার বলে বলীয়ান হইয়া এই মহতী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ভক্তিভরে তাই বারম্বার তোমায় ডাকি মা! কৃপা করি—হৃদয়ে বল, মনে প্রফুল্লতা, আত্মায় আনন্দ দাও, যেন তোমার কৃপায় ও শীতল পদ-ছায়ার স্নিগ্ধকরী শান্তিতে এই মহতীব্রত উদ্যাপন করিতে সক্ষম হই।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র